গৌড়ীয় নৃত্য
প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা



গৌড়ীয় নৃত্য

প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা

মহুয়া মুখোপাধ্যায়



দি এশিয়াটিক সোসাইটি
১ পার্ক স্ট্রিট্, কলকাতা ৭০০ ০১৬

জানুয়ারী , ২০০০

প্রকাশক :
অধ্যাপক দিলীপকুমার ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
দি এশিয়াটিক সোসাইটি
১ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১৬

চিত্রাঙ্কন : শ্রীমতী ছবি চক্রবর্ত্তী

আলোকচিত্রশিল্পী : শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
মডার্ণ প্রিন্টার্স
১২ উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড
কলকাতা ৭০০ ০৬৭

আমার মা

শ্রীমতী ছবি চক্রবর্তী

ও

জীবন সাথী

শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়কে

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

বাংলার বিস্মৃত হয়ে যাওয়া সুপ্রাচীন শাস্ত্রীয় নৃত্যকলাকে পুনরুজ্জীবিত করে ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় সুনিশ্চিতভাবে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে এক বিরাট অবদান রেখেছেন। প্রাচীন মন্দিরভাস্কর্য, চারুকলা বিষয়ক প্রামাণ্য বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং এখনও প্রবহমান বাংলার বিভিন্ন লৌকিক নৃত্যধারার তন্নিষ্ঠ এবং সমন্বিত গবেষণার সূত্রে তিনি বিলুপ্ত বলে অনুভাবিত আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অংশের পুনরুদ্ধার করেছেন। তাঁর এই অন্বেষণ বহু খ্যাতকীর্তি পণ্ডিত এবং সর্বমান্য নৃত্যগুরুদের দ্বারা সমর্থিত ও পরিশীলিত হয়েছে। সম্প্রতিকালে দেশের এবং রাজ্যের সংস্কৃতিমন্ত্রকগুলি, বহু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগের মতো প্রতিষ্ঠান বাংলার এই প্রাচীন নৃত্যশিল্প, যা গৌড়ীয় নৃত্য নামে সর্বজনীন স্বীকৃতি অর্জন করেছে, তাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। এই দেশজোড়া কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটিরও সম্পর্ক সুনিবিড়। বিগত ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের আয়োজনে গৌড়ীয় নৃত্যশিল্প নিয়ে একটি সর্বভারতীয় আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গ, শ্রদ্ধেয় নৃত্যগুরুরা এবং তরুণ গবেষকরা তাতে অভিনিবেশের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই আলোচনাচক্রে অনুশীলিত গবেষণাপত্রগুলিও সম্পাদিত হয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির দ্বারা শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে। ঐ আলোচনাচক্রের মধ্যেই বারংবার গৌড়ীয় নৃত্য সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বর্তমান বইটি তারই ফলশ্রুতি।

হারিয়ে-যাওয়া প্রাচীনকালের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রায় সওয়া-দুই শতাব্দী ধরে নিরলসভাবে যে-প্রয়াসে নিরত আছে, এই গ্রন্থ তারই সাম্প্রতিকতম অভিব্যক্তি। এই কাজে ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় আমাদের যেভাবে সহায়তা করেছেন, সেজন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দিলীপকুমার ঘোষ
সাধারণ সম্পাদব

পূর্বাভাষ

বহুদিন ধরেই একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে আলোড়িত হত—বাংলার কি কোনও ধ্রুপদীনৃত্য ধারা নেই? প্রশ্নটা জেগেছিল আমার মনে সম্ভবত ১৯৭০ কিংবা ১৯৭১ সালে, তার অবশ্য কারণ আছে। আমি সেইসময় স্কুলের গন্ডী পেরোইনি। বাঁশবেড়িয়াতে হংসেশ্বরী মন্দির দেখতে গিয়ে পাশেই টেরাকোটা অনন্তবাসুদেব মন্দিরে নৃত্যরত ভাস্কর্য মূর্তি দেখতে দেখতে মনের মধ্যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল—বাংলার কি কোনও শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারা ছিল? তা যদি না থাকত তবে এরকম নৃত্যমূর্তি এল কোথা থেকে? তখন আমি নাচ শিখতাম না, আর কলকাতায় শাস্ত্রীয় নৃত্য বলতে মূলত ঃ কিছুটা প্রসার ছিল ভরতনাট্যমের, তারপর মণিপুরী, তাও ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েনি, আর ছিল কত্থক, এটিই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিল কলকাতা ও শহরতলীতে। তখন ওড়িশি, মোহিনী আট্টম, কুচিপুড়ী—এসব নৃত্যের প্রচলনই ছিল না—শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসেবে এগুলির নাম তখন কেউ শোনেইনি। বাংলার মন্দিরের এই নৃত্যমূর্তিগুলি মনের মধ্যে যে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল, পরবর্তীকালে এই প্রশ্নের তাগিদে হাতড়ে বেড়িয়েছি সাহিত্য, ইতিহাস, স্থাপত্য, নৃত্যশাস্ত্র, রাগ-রাগিনী, বাদ্যযন্ত্র। জানতে চেষ্টা করেছি বর্তমান ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির অতীত ইতিহাস, তাদের ক্রমবিবর্তন এবং শাস্ত্রীয় ভিত্তি। তারই ফলে আজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বাংলার একটি নিজস্ব শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি ছিল এবং তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। সুপ্তভাবে গ্রামীণ নৃত্যধারা বিশেষত গ্রামীণ গুরুপরম্পরা সজীব নৃত্যধারাগুলির মধ্যে বিবর্তিতরূপে চলছিল। অভাব ছিল শুধু তাকে দেখে গবেষণা করে, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার (যেমনটি অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তার ফলে অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি পুনর্গঠিত হয়েছে)। বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে, এছাড়া পরবর্তীকালে ভারতীয় অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে পাই। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে এবং স্বাধীনতার পর সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি বিভিন্ন গ্রামীণ নৃত্যধারাগুলি থেকে পুনর্গঠিত হয়ে, রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করে। যে সময়ে অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত হতে শুরু করে সে সময় থেকেই বাংলা এব্যাপারে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হতে থাকে। অথচ বাংলার গীতগোবিন্দ, পরকীয়া রাধাতত্ত্ব দিয়েই অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্য সমৃদ্ধ হয়েছে এবং আজকের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই স্তব্ধতার পেছনে অনেকগুলি কারণ আছে এবং এও এক বিশাল গবেষণার বিষয়। আমি অতি

সংক্ষেপে এই ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করতে চাই। বাংলা প্রথম বৃহৎ ধাক্কা খেয়েছিল দ্বাদশ শতকে তুর্কি আক্রমণের ফলে, যা তৎকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে বিরাট আঘাত হেনেছিল। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব এবং চৈতন্যোত্তরকালে আবার যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নতুন করে শুরু হয় তা আবার বিরাট আঘাত পায় বর্গীদের আক্রমণে। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে এই সত্যটি লুকিয়ে আছে—

খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে?

বর্গীদের আক্রমণ, তারপর আবার বৈদেশিক আক্রমণ, বিশেষত: সর্বগ্রাসী ইংরাজ প্রভুত্ব। তার ফলে এলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত. দুর্ভিক্ষ অর্থাৎ ব্যাপক মন্বন্তর, লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু, বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি। এছাড়া অনেক কুপ্রথা—বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ এগুলিতো ছিলই। কলকাতা মহানগরীর সৃষ্টি এবং ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা সারা ভারতের রাজধানী। কলকাতা মহানগরীর সাংস্কৃতিক উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এলো বাবু সংস্কৃতি, ইংরেজদের নব্যশিক্ষার ফলে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি তাচ্ছিল্য-উদাসীনতা, অবজ্ঞা, বাঈজী নাচ, পায়রা ওড়ানো প্রভৃতি এবং এই কলকাতার নব্যসংস্কৃতিই (ইংরেজ ও নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ প্রবর্তিত বিদেশী এবং উত্তর ভারতীয় অর্থাৎ মিশ্র সংস্কৃতি) অর্থাৎ রাজধানী প্রবর্তিত সংস্কৃতিই সারা বাংলার সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াল। এরকম কারণেই বাংলার যে নিজস্ব শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা ছিল তার পুনর্বিন্যাস বা পুনর্গঠন ও চর্চার অবকাশ বাংলা সেই সময য পায় নি। তাই যখন স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষভাগে অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যধারাগুলি নিজেদের আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করল-- বাংলা ছিল অপেক্ষাকৃত নির্বাক ও নিস্পৃহ এই শাস্ত্রীয় নৃত্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে। কারণ বাংলাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রভূত। বাংলার পন্ডিত সমাজের একাংশ ব্যাপৃত হয়েছিলেন নানারকম সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনে অর্থাৎ নবজাগরণে। যার ফলস্বরূপ আজ আমরা সঠিক পথে এগিয়ে চলেছি। আবার স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং এইসব সমস্যা সমাধানে আমাদের খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ভাবে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এছাড়া শিক্ষায়, বিশেষত নারীশিক্ষার জাগরণ, চিকিৎসা শাস্ত্রে ভারতেপ্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপন (কলকাতা মেডিকেল কলেজ), বিজ্ঞানের গবেষণা এই নব্যশিক্ষা আন্দোলন নবজাগরণের পাশাপাশি জোরদার শুরু হয় কলকাতায়। এসব কারণ ছাড়াও স্বাধীনতার ঠিক আগে থেকে

স্বাধীনতার পর যে সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মিত হয়ে দানা বাঁধছিল, সেইসময় বাংলায় মূলত: তিন ধরনের নৃত্য চর্চিত হতে শুরু হয়। [১] যেহেতু বাংলাকে প্রচন্ড ভাবেই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাই আন্দোলনের গান ও নৃত্যধারার সৃষ্টি হয়েছে বিশেষত 'কলকাতায়' এবং সমগ্রবাংলা সেই ধারায় ব্যাপৃত থেকেছে। [২] পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। যাঁর অবদানের ফলে ভারতীয় নৃত্যকলা সম্মানের আসনে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। তাঁর সময়ে যে কয়টি নৃত্যধারা সবে পুনরুদ্ধার হতে শুরু করেছিলো তিনি সেগুলিকে তুলে এনে সম্মানের আসনে স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিয়ে যান শান্তিনিকেতনে, বিশেষভাবে মণিপুরী (রবীন্দ্রনাথই প্রথম ১৯২৬ সালে সিলেবাস করে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতিতে সংযোগ করেন যার ফলে এই গ্রামীণ সুন্দর নৃত্যধারাকে শাস্ত্রীয় হিসেবে স্বীকৃতি পেতে স্বাধীন ভারতবর্ষে কোনও রকম বেগ পেতে হয়নি।) তার ফলে নতুন ধরনের রবীন্দ্রনৃত্য ধারার প্রবর্তন। [৩] এরপর আবির্ভূত হলেন শ্রদ্ধেয় উদয়শংকর। যিনি আর এক নতুন নৃত্যধারার প্রবর্তক—পশ্চিম ভারতীয়, ছায়ানৃত্য, ভারতীয় ভাস্কর্য, চিত্রকলা, পাশ্চাত্ত্য ব্যালে—সমস্তকিছুর সংমিশ্রণে এক অপূর্ব শৈলী তৈরী করেন। এরকম নানাবিধ নতুন নতুন নৃত্যধারার সঙ্গে পরিচয় ও চর্চায় কলকাতা মহানগরী ব্যস্ত থাকল। কলকাতা যা বলবে সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষ তাই তার সংস্কৃতি বলে মেনে নেবে এই ছিল অবস্থা। যেহেতু সে ছিল এককালীন সর্বভারতীয় রাজধানী এবং পরবর্তী কালে পশ্চিম বাংলার রাজধানী।

ভারতবর্ষে প্রাথমিক ভাবে শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির পুনর্গঠনে স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব থেকে কিছু পর পর্যন্ত আমরা চারটি শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা পাই—ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী। পরবর্তীকালে গবেষণার দ্বারা এক একটি নৃত্যধারা পুনর্গঠিত হয়ে পূর্বোক্ত তালিকায় সংযোজিত হয়। এর সম্বন্ধে Prof. Mohan Khokar-এর বক্তব্যটি স্মরণীয়—"Four major forms of traditional dance speedily came to the fore during the Revival and each built up its own following so rapidly did these dances emerge and so firmly did they established themselves, that for a long time Bharatanatyam, Kathakali, Kathak and Manipuri were the only forms of classical dance in the Indian tradition. For years, almost all writings on Indian dance referred pointedly to "the four classical forms". Only later did it become increasingly evident that a number of other modes rooted in the classical tradition existed."—(Marg, vol. XXXXI No. 2, topic—the Revival is Ushered, pg. 54).

(নৃত্যকলার পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের সময় চারটি নৃত্যধারা অত্যন্ত দ্রুত সামনের

সারিতে এসে পড়লো এবং অত্যন্ত দ্রুত তাদের অনুগামী শিল্পী তৈরী করে ফেললো এবং অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেললো যার ফলে বহুদিন পর্যন্ত লোকের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী এই চারটি মাত্র ভারতের মূল ক্লাসিক্যাল বা শাস্ত্রীয় নৃত্য। বহুদিন বহু প্রবন্ধইত্যাদিও লেখা হয়েছে 'চারটি শাস্ত্রীয় নৃত্য' বলেই। পরবর্তীকালে দেখা গেল আমাদের আরও বহু শাস্ত্রীয় নৃত্য আছে।)

তাই বিভিন্ন কারণে সূর্যালোকের মতোই সত্য প্রশ্নগুলি মনে আলোড়ন তুলত। কারণ, বাঙালি যেরকম কলাপ্রেমী, এত নাচ-গান ভালোবাসে ও শেখে, এত সুন্দর সুন্দর নৃত্যভাস্কর্য বাঙালির হাতে প্রাণ পায় (আজও কুমোরটুলীর শিল্পীদের সারা পৃথিবীতে কদর এবং দুর্গা প্রতিমা গড়তে বিশ্বের বিভিন্নস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়)। বিশেষত: নৃত্যগণেশ, দুষ্প্রাপ্য নৃত্যরত বিষ্ণু, নটরাজ বা নর্তেশ্বর প্রভৃতি—এ থেকে মনে হয় নিশ্চয়ই বাংলার অতীতকাল থেকে শাস্ত্রীয় নৃত্য ঐতিহ্য আছে। অনন্তবাসুদেব মন্দিরের নৃত্যমূর্তিগুলি শৈশবে আমার মনে যে প্রথম প্রশ্নের অবতারণা ঘটায় এবং গৌড়ীয় নৃত্যের উৎস সন্ধানে প্রেরণা জোগায়, আজ তার উত্তর পেয়ে গেছি—যে অতীতকাল থেকেই বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা ছিল এবং তার লিপিবদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থও আছে প্রচুর। বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য ছিলই এরকম সিদ্ধান্তে আসার আগে সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয়টিকে মূলত চারভাগে ভাগ করেছি—

(ক) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংলার ইতিহাস।

(খ) বাংলার নৃত্যশাস্ত্র।

(গ) বাংলার ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প।

(ঘ) বাংলার লোকায়ত গুরুপরম্পরা নৃত্যধারা।

এই কাজটি করবার জন্য পড়াশুনো করতে গিয়ে দেখেছি বিভিন্ন বিষয়ের বিদগ্ধ পন্ডিতেরাও বারেবারে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের সম্ভার সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। যেমন—বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পন্ডিত—ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য; ইতিহাসবিদ্—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সরসীকুমার সরস্বতী; লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্য বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধন প্রমুখ। এঁদের রচনা আলোচনা আমাকে উৎসাহিত করেছে, সাহায্য করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে।

যেহেতু বাংলা ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য, এই সুমহান ভারতবর্ষের ছত্রাকৃতি সংস্কৃতির অংশীদার এই বাংলা। নাট্যশাস্ত্রেও তাই বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের উল্লেখ পাই। পাই বেশভূষা নৃত্যবৃত্তি তথা পদ্ধতির বিবরণ। নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত দাক্ষিণাত্যা পদ্ধতি থেকে যেমন আধুনিক ভাবতে পেয়েছি—ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ী, মোহিনী আট্টম ও

কথাকলি নৃত্যধারা, তেমনি ওড্রমাগধী থেকে পেয়েছি গৌড়ীয়, ওড়িশি ও সত্রীয় অর্থাৎ পূর্বভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যধারাসমূহ। মূল গবেষণার গভীরে যাবার আগে এই কথাগুলি মনে রাখা একান্তই জরুরি।

।। ২ ।।

গৌড়ীয় নৃত্যধারার উৎস ও বিকাশ সম্পর্কে গবেষণার সূত্রে যে-পণ্ডিতজনেরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে পথনির্দেশ করেছেন এবং যে-শিল্পগুরুরা নানাবিধ উপদেশ দিয়ে কাজটিকে সম্পন্ন করিয়েছেন, তাঁদের বিনম্র প্রণতি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গৌড়ীয় নৃত্যের গবেষণায় পূর্বাপর যাঁরা আমাকে প্রশিক্ষিত করেছেন অকৃপণভাবে, তাঁদের কথা প্রথমেই উল্লেখ করব সশ্রদ্ধচিত্তে : অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পুনরাবিষ্কৃত এই নৃত্যধারার 'গৌড়ীয়' নামকরণটি তাঁরই যে, প্রাসঙ্গিকভাবে সেটি বলতেই হবে), অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই সূত্রে সবার আগেই বলব। এঁরা প্রত্যেকেই আমার শিক্ষক, তাই ধন্যবাদ জানানোর ধৃষ্টতা আমার নেই। ঠিক একই কথা বলব আমার প্রণম্য নৃত্যগুরুদের প্রসঙ্গেও, যাঁরা হলেন (প্রয়াত) গুরু বিপিন সিং, (প্রয়াত) গম্ভীর সিং মুড়া, শ্রীমতী কলানিধি নারায়ণন, সর্বশ্রী শশী মাহাতো, নরোত্তম সান্যাল, ললিত কুশানী এবং মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য।

অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কপিলা বাৎস্যায়ন, অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত, অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস, সর্বশ্রী আর. নাগস্বামী, গৌতম সেনগুপ্ত, জীবন পানি, পুষ্পজিৎ রায়, সুদীপ শ্রীমল—এঁরা সকলেই বিভিন্ন সময়ে আলোচনার সূত্রে অনেক এবং অন্যবিধ তাত্ত্বিক জটিলতার নিরসন করেছেন। অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী, (প্রয়াতা) মঞ্জুশ্রী চাকী-সরকার, গুরু গোবিন্দন কুট্টি, গুরু থাংকমণি কুট্টি, সর্বশ্রী এ. সম্বন্ধম, সি.পি. রাজাগোপালন, এস. রাজারাম. গুরু মুরলীধর মাঝি শ্রদ্ধেয় এই কলা-বিদগ্ধজনেরাও, যখনই কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, তার নিরসন করেছেন। শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত, শ্রী ডেরেক বোস এবং শ্রী পঙ্কজ সাহাও বিভিন্ন সময়ে সহায়তা করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সমস্ত বিভাগীয় সহকর্মীদের কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে বলব। বহু প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও অবিরল সহায়তা পেয়েছি, যা উল্লেখ না করলেও অপরাধ হবে ! গৌড়ীয় নৃত্যধারাকে শিল্পী ও বিদগ্ধ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁদের অবদানও বড় কম নয়। এই সংস্থাগত তালিকায় যে নামগুলি উল্লেখ করতেই হয়, সেগুলি হল :

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ; সংস্কৃতিমন্ত্রক, কেন্দ্রীয় সরকার; সংস্কৃতি দপ্তর, প:বঙ্গ

রাজ্য সরকার; প: বঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়; বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়; আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়; কলাক্ষেত্র ফাউণ্ডেশ্যন, চেন্নাই; ফিল্মস্ ডিভিসন অব ইণ্ডিয়া; কেরল কলামণ্ডলম; ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন; ইস্টার্ন জোন'ল কালচার সেন্টার; ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মানবসম্পদ সংগ্রহালয়, ভোপাল; ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, কলকাতা; স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ম, কলকাতা; আশুতোষ মিউজিয়ম, কলকাতা; ঢাকা মিউজিয়ম; রাজশাহী মিউজিয়ম; মালদহ মিউজিয়ম; বর্ধমান ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ম; ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টস; শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র, গুয়াহাটি; ইণ্ডিয়া হ্যাবিটাট সেন্টার, নয়া দিল্লি; ইণ্ডিয়া ইন্টার ন্যাশনাল সেন্টার, নয়াদিল্লি; ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট, কলকাতা; ন্যাশনাল মিউজিয়ম, নয়াদিল্লি; জহর শিশু ভবন, কলকাতা প্রভৃতি।

ব্যক্তিগতভাবে আরও অসংখ্য মানুষের কাছে আমি ঋণী। গৌড়ীয় নৃত্যধারা সম্পর্কে প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে তাঁদের প্রত্যেকেরই নাম সকৃতজ্ঞভাবে উল্লেখ করা, ইচ্ছা থাকলেও, স্থান অকুলান হওয়ায় সম্ভবপর হল না। এজন্যে আমি তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হবে এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষের কথা—সভাপতি অধ্যাপক অমলেন্দু দে এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপকুমার ঘোষের নাম এই সূত্রে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলব। প্রকাশন বিভাগের সকল কর্মীদের এবং গণসংযোগ বিভাগের দিলীপ রায়ের কথাও বলতেই হবে ধন্যবাদের সঙ্গে, যেটা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারের দুই প্রবরাধিকারিক ড. মিতালী চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী সুজাতা মিশ্রের ক্ষেত্রেও অন্যথা হবার উপায় নেই। আমার আপনজনদের মধ্যেও কয়েকজনের দেওয়া প্রেরণার কথাও এই উপলক্ষে বলা অনিবার্য : আমার বাবা শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চক্রবর্তী এবং শ্বশ্রূমাতা শান্তি মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে বলব। শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বনানী চক্রবর্তী এবং সুদীপ চক্রবর্তীর সাহায্যের কথাই বা ভুলি কী করে! এই সঙ্গে আমার ছাত্রছাত্রীদের কথাও উল্লেখযোগ্য—বিশেষভাবে বর্ণালি দেবনাথ, শুক্লা বণিক, দেবযানী দত্ত, পায়েল রায়, দেবাশিস সরকার, তারক সাহা, সুমিত প্রামাণিক, শুভদীপ চক্রবর্তী ও পুত্র অয়ন মুখার্জি।

মহুয়া মুখোপাধ্যায়

শব্দ সংক্ষেপ সূচী

না. শা.	=	নাট্যশাস্ত্র।
অ. দ.	=	অভিনয় দর্পণ।
স. সা. স.	=	সংগীত সার সংগ্রহ
স. দা.	=	সংগীত দামোদর।
শ্রী. হ. মু.	=	শ্রী হস্ত মুক্তাবলী।
ভ. র.	=	শ্রীভক্তি রত্নাকর।
স. র.	=	সংগীত রত্নাকর।
গো. লী.	=	গোবিন্দলীলামৃত।
গী. গো.	=	গীতগোবিন্দ।
উ. নী. ম.	=	উজ্জ্বল নীলমণি।
ভ. র. সি.	=	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

গৌড়ীয় নৃত্য : নামকরণের প্রেক্ষাপট

'গৌড়ীয় নৃত্য' নামটি গৃহীত হয় প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে। নামকরণের কারণগুলি ঃ

[১] গৌড় সীমানার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় হারাহা লেখমালাতে (৫৫৪ খৃষ্টাব্দে)। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদের—সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের নৃপতি গৌড়রাজ শশাঙ্ক 'গৌড়াধিপ' বলে অত্যন্ত পরিচিত। বাঙলার নরপতি শশাঙ্কের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলেই গৌড় কথাটির ভৌগোলিক পরিসীমার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে। পরবর্তীকালে পালসম্রাটগণের রাজ্যবিস্তারের ফলে গৌড় বৃহত্তর ভূখন্ডের সংজ্ঞারূপে নির্দেশিত হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব নবদ্বীপে। তিনিও গৌড় নিবাসী, অর্থাৎ নবদ্বীপ—যা সেকালে গঙ্গা বা ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল—গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীচৈতন্যের আমলে বাংলার সুলতানগণ গৌড়েশ্বর নামেই অভিহিত হতেন। তাঁদের রাজধানী ছিল গৌড়। এই গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে মালদহ শহরের নিকটবর্তী স্থানে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে, অর্থাৎ রাজ্য বিস্তারের ফলেই গৌড়-বঙ্গ ইত্যাদি নামগুলির ভৌগোলিক সীমার সংকোচন এবং পরিবর্দ্ধন ঘটে। সুতরাং গৌড় কথাটি তখন তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হত। একটি ব্যাপক বা বৃহত্তর অর্থে বাংলার রাজ্যসীমা বোঝাতে, অপরটি সংকীর্ণতর অর্থে আঞ্চলিক অভিধারূপে, তৃতীয়টি নগর অর্থে। (চৈতন্যদেবঃ ইতিহাস ও অবদান, পৃঃ ৪১-৪২)।

[২] ষষ্ঠ শতকের লেখক দন্ডিনের 'কাব্যাদর্শে' (১, ৪০, ৪২) গৌড়ী নামে সাহিত্য রচনা রীতির উল্লেখ আছে। বাণভট্টের রচনা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সাহিত্যদর্পণে গৌড়ী রীতির উল্লেখ পাই। অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙলার যে অবদান তাকে তৎকালীন ভারতবর্ষের সারস্বত সমাজ স্বীকৃতি দিয়েছেন, বরণ করেছেন গৌড়ী রীতি বলে। প্রাকৃত ব্যাকরণে পাই গৌড়ী ভাষার উল্লেখ। স্থাপত্য রীতিতেও গৌড়ীয় রীতি অর্থাৎ

চারচালা বা আটচালা গঠনকে অভিহিত করা হয়। (বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ২২)

[৩] চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' হিসেবে বিশ্বজনীন সমাদর লাভ করে। রামমোহন রায়ের লেখা বাংলা ব্যাকরণ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে পরিচিত অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার যা কিছু তা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে—গৌড়ী বা গৌড়ীয় নামে প্রসিদ্ধ।

[৪] এর পাশাপাশি সর্বভারতীয় তথা আঞ্চলিক সংগীতশাস্ত্রেও প্রাচীনকাল থেকেই গৌড়ী বা গৌড়ীয় পদ্ধতির উল্লেখ আছে। যেমন 'নাট্যশাস্ত্রে' গৌড়বঙ্গের নর্তক-নর্তকীর তথা গৌড়ী নর্তক-নর্তকীর বেশভূষা রূপসজ্জার ব্যাখ্যা পাই। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে (৫ম-৮ম শতক) পাই মার্গসংগীতের অন্তর্ভুক্ত সপ্তগীতি—শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়ী বা গৌড়িকা, সাধারণী, ভাষা, বিভাষা ও অন্তর ভাষিকা। এছাড়া আছে গৌড়, গৌড়কৈশিকী, গৌড়পঞ্চমা ইত্যাদি রাগের সঙ্গে নবরস যুক্ত নাট্যাভিনয় তথা নৃত্যাভিনয়ের কথা। 'সংগীত রত্নাকরে' (আনু: ১২২৭ খৃ:) সংগীতের স্বরূপভিত্তিক ভারতভূমিকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে—লাট, কর্ণাট, দ্রাবিড়, অন্ধ্র ও গৌড়।

[৫] পঞ্চদশ শতকে উড়িষ্যার সংগীত শাস্ত্রকার মহেশ্বর মহাপাত্র রচিত 'অভিনয় চন্দ্রিকা'তে সাতরকম নৃত্যশৈলীর উল্লেখ পাই। "তার মধ্যে স্পষ্টভাষায় গৌড়বাসীদের নৃত্যশৈলীর এক বৈশিষ্ট্যের কথাও আছে (শ্লোক ১৯৩-১৯৪)। এই সময় গৌড়ের বিস্তৃতি বৃহত্তর হলেও মধ্যযুগে একটি নৃত্যশৈলী যে গৌড়ের নামে পরিচিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই"। (দেশ, ২রা অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃ: ৯)। এই তথ্যগুলির ভিত্তি স্পষ্টতই প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের নামকরণে 'গৌড়ীয় নৃত্য' নামটির যথার্থতাই নির্দেশ করে।

ভৌগোলিক সীমা

'গৌড়' ও 'বঙ্গ' শব্দ দুটি সুপ্রাচীন। পাণিনিও উচ্চারণ করেছেন এই দুটি শব্দ। 'বঙ্গ-মগধ'-এরও উল্লেখ আছে 'ঐতরেয়-আরণ্যকে'।[১] খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বাৎস্যায়নের কামসূত্রে গৌড়দেশবাসিনী মেয়েদের বর্ণনা এই রকম— "মৃদুভাষিণ্যো'নুরাগবত্যো মৃদঙ্গশ্চ গৌড্যঃ।।"[২]

অনেকের অনুমান প্রাচীনকাল থেকেই উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ গৌড় বলে পরিগণিত হতো। যদিও অনেক পরবর্তী যুগে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী ও তার পরে) গৌড় বলতে সমগ্র বঙ্গভূমিকেই (বৃহত্তরবঙ্গ—বর্তমান বিহারের পূর্বাংশ সহ এবং বর্তমান আসামের কিছু অংশ) বোঝাত।[৩] পালরাজত্বে (খৃঃ ৭৪০-খৃঃ ১১০০) গৌড়ভূমি হয়ে ওঠে সংস্কৃতির প্রধান ক্ষেত্র। কি 'গৌড়ীরীতি'তে সংস্কৃত রচনায়, কি ভাস্কর্য কলায়, কি বিদ্যাচর্চায়—গৌড় তখন উত্তর-পূর্ব ভারতে অগ্রগণ্য।[৪] সংস্কৃত সাহিত্যে যাকে "গৌড়ীরীতি" বলে, তা গৌড়দেশের কবিদেরই দান।[৫]

হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান যুগে বাংলার ভৌগোলিক সীমা বারবার পরিবর্তিত হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সীমাস্বরূপ এই বিশাল ভূখণ্ডটি অনায়াসে এইভাবে বর্ণিত হতে পারে—"উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভূটান রাজ্য। উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা; উত্তর পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি, পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি,

---

১। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)—গোপাল হালদার, মুক্তধারা প্রকাশন, ১৯৮৬, পৃঃ ৪।

২। বাৎস্যায়নের সমগ্র কামসূত্র, মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত; ৬।৫।৩৩, ওরিয়েন্টাল এজেন্সি।

৩। গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি—ডঃ প্রভাত কুমার ঘোষ, জে.এম.প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃঃ ৬৯।

৪। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)—গোপাল হালদার, মুক্তধারা প্রকাশন, ১৯৮৬, পৃঃ ৫।

৫। ঐ, পৃঃ ১১।

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই সীমার মধ্যে বাংলাভাষার ক্রমবিকাশ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য—এই ভূখন্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙ্গালির কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।"[১] বাঙ্গালির এই নর্মভূমির সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত আছে যে বাঙলার কোন শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা ছিল না, নেই। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাঙ্গালি জাতির একটি অনবচ্ছিন্ন সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান রয়েছে, এটা সকলেই মানেন। তার সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য—সব কিছুরই লৌকিক এবং পরিশীলিত দু'টি সমান্তরাল অথচ পরস্পর-সাপেক্ষ ধারা সুদীর্ঘ সময় ধরে পাশাপাশি বয়ে চলেছে, সেটাও স্বীকৃত সবার কাছে। অভাব ছিল কেবল একটি মাত্র প্রকরণ—অভাবটি তথ্যের নয়, তথ্য বিচারের। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাঙ্গালি যে আত্মবিস্মৃত জাতি সেটি স্পষ্টতঃ বোঝা যায় তার নৃত্য সংক্রান্ত তথ্যবিচারে অতীতকালের অনীহায়। তবে আজ সেই বহু পরিচিত আপ্ত বাক্যটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বাংলার নিজস্ব নৃত্যশৈলীতে ঋদ্ধ একটি সুপ্রাচীন শাস্ত্রীয় নৃত্য শিল্পধারা (গৌড়ীয় নৃত্য)। সে তার তথ্যে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, সজীব ধারায় ও সুগঠিত শাস্ত্রে সমৃদ্ধ।[২]

১। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১৩৯৬, পৃঃ ২।

২। নৃত্যকল্প, গৌড়ীয় নৃত্য ঃ বাঙালির সাংস্কৃতিক রেনেসাঁস, পল্লব সেনগুপ্ত, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃঃ ৪৩-৪৬।

সাহিত্যে নৃত্যের উপাদান

পাল পূর্বযুগ :

বাংলা সাহিত্যে নৃত্যের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের শরণাপন্ন হতে আমরা বাধ্য। বর্তমান ভারতবর্ষে প্রচলিত শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে নাট্যশাস্ত্র স্বীকৃত। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত চারপ্রকার নৃত্যের উল্লেখ আছে—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ঔড্রমাগধী। চতুর্থটি, অর্থাৎ ঔড্রমাগধী নৃত্যই গৌড়বঙ্গে প্রচলিত ছিল—

অঙ্গা বঙ্গা উৎকলিঙ্গা
বৎসাশ্চৈবৌড্রমাগধাঃ।[১]

নাট্যশাস্ত্রের যুগ যখন শেষ হয়ে গেল, নাট্যশাস্ত্রের নির্যাসের ভিত্তিতে আঞ্চলিক অভিজাত নৃত্য-গীতের ধারা গড়ে উঠল। এল "মতঙ্গের বৃহদ্দেশী", এর সময়কাল কারও মতে খৃষ্টীয় পঞ্চম, কারও মতে আবার খৃ. সপ্তম-অষ্টম শতক। এই মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে পাই গৌড়রাগ, গৌড়কৈশিকী, গৌড়পঞ্চমা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের রাগ এবং তার সঙ্গে নবরস-সহ নৃত্যাভিনয়ের বর্ণনা। যেমন—গৌড়পঞ্চমা রাগ বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার, বীভৎস ও ভয়ানক-রসে প্রযোজ্য—

উদ্ঘটনাট্যে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে চাস্য বিনিয়োগঃ
বীভৎস ভয়ানকরসৌ[২]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-দশম শতকে বাংলার মন্দিরে শাস্ত্রানুসারী নৃত্যানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, এর উল্লেখ আমরা পাই কাশ্মীরের কবি কল্হণ রচিত 'রাজতরঙ্গিণীতে'। সেখানে এরকম বিবরণ পাওয়া যায়—কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় যখন ছদ্মবেশে গৌড়বঙ্গের পৌণ্ড্রবর্ধন শহরে প্রবেশ করেন, তখন দেখতে পান শাস্ত্রীয় সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেই নৃত্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রানুসারী। কার্তিকের মন্দিরে কমলা নামে দেবদাসী নৃত্য করছে।

১। নাট্যশাস্ত্র, ড: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী সম্পাদিত। চতুর্দশ অধ্যায়, পৃ:-১১৮, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

২। **BṚHADDEŚĪ OF ŚRĪ MATAṄGA MUNI—Vol. II. ed. by Prem Lata Sharma, IGNCA & Motilal Banarasidass Publishers, 1994, Pg. 105.**

মন্ডলেষু নরেন্দ্রানাং পয়োদানামিবার্যমা।
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভূজা।।
প্রবিবেশ ক্রমেনাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্ধনম্।
যস্মিন্গৌরাজ্য রম্যাভি: প্রীত: পৌরবিভূতিভি:।।
লাস্যংস দৃষ্টম্ বিশৎ কার্তিকেয় নিকেতনম্।
ভরতানুগমালক্ষ্যনৃত্যগীতাদিশাস্ত্রবিৎ।।
ততো দেবগৃহদ্বারশিলামধ্যাস্ত স ক্ষণম্।
তেজো বিশেষ চকিতৈ জনৈ: পরিহৃতান্তিকম্।।
নর্তকী কমলা নাম কান্তিমন্তং দদর্শতম্।[১]

যুগ যুগ ধরে ভারতের সংস্কৃতির ভান্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে সাহায্য করেছে বাংলার সংগীত (গীত-বাদ্য-নৃত্য) শাস্ত্রজ্ঞরা। সাহিত্যের ইতিহাসে এর যথেষ্ট নজির আছে। চান্দ্রব্যাকরণ প্রণেতা চন্দ্রগোমিন খ্রিস্টিয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকে জীবিত ছিলেন। তিনি 'তারা ও মঞ্জুশ্রীস্তোত্র' এবং 'লোকানন্দ নাটক' রচনা করেন।[২] আরও একটি উল্লেখ পাই সুবন্ধু রচিত 'বাসবদত্তা'য়, যেখানে বাসবদত্তা নৃত্যগীতে পটীয়সী।[৩]

পালযুগ—চর্যাপদ ও নাথসাহিত্য :

বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধসাধকদের (সাবেরী-পা, কানু-পা, হাঁড়ী-পা, লুই-পা প্রভৃতিদের দ্বারা রচিত) সাধনাসংগীত চর্যাপদে প্রথম তৎকালীন বাঙ্গালীর নাট্যাভিনয়ের সঙ্কেত পাওয়া যায়। বজ্রাচার্য ও দেবী দুজনে মিলিত হয়ে বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনী নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে অভিনয় করেছেন—

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।। চর্যাপদ সং ১৭।[৪]

লাউ ও তন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি সুন্দর বীণাযন্ত্র রূপায়িত হয়েছে। এই বীণাযন্ত্র বাজিয়ে বজ্রগুরু নাচছেন এবং দেবী গান করছেন।

১। Kalhana's Rājataraṅgiṇī, 4th Taranga, Vol. III. M.A.Stain, Motilal Banarsidass, শ্লোক ৪২০-৪২৪।

২। বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ১২২, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৪।

৩। History of Bengal, R.C.Majumdar, Pg. 354, G.Bharadwaj & Co. 1971.

৪। বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি—ডঃ আশা দাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৯, পৃঃ ৫৩১।

রাগঃ—পটমঞ্জরী-বীণাপাদানাম্—

"সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দান্ডী একি কি অত অবধুতি।।
বাজই অলো সহি হেরুঅ-বীণা।
সুন-তান্তিধনি বিলসই রুণা।।[১]

অর্থাৎ বীণাপাদের নামে যে চর্যাটি (১৭ নং) তাতে নৃত্য, নাট্য, গীতের উল্লেখ পাচ্ছি। এ নৃত্য হচ্ছে 'বুদ্ধ নাটকের নৃত্য'। এ থেকে অন্তত জানতে পারছি সেকালের বীণা কেমন হতো আর নাটক কী ছিল।[২]

সে যুগের সিদ্ধাচার্যদের সাধনসঙ্গিনী ডোম রমণীগণ সমাজে অস্পৃশ্যা হলেও নৃত্য ও সঙ্গীতকলায় পটীয়সী ছিলেন। চর্যাপদে আছে ডোম রমণী একটি চৌষট্টি দল যুক্ত পদ্মের উপর অতি লঘু পদক্ষেপে নৃত্য করছেন—

একসো পদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী
তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।। চর্যাপদ সং (১০)।।

আবার ডোম্বীর আসঙ্গলিপ্সায় বিভোর হয়ে নটশিরোমণি সিদ্ধাচার্য কখনও কখনও তার নটপেটিকা ছেড়ে গেছেন। এই নটপেটিকায় নটনটীদের নাট্যাভিনয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ-সরঞ্জাম ইত্যাদি থাকত। প্রাচীন বাংলায় সুসজ্জিত রথে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, তারা প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধ দেবদেবীদের স্থাপিত করে রাজপথে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হত। নৃত্যগীত এবং দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক যাত্রা, অভিনয় ও ক্রীড়াকৌতুকাদিও অনুষ্ঠিত হত।[৩] নাথ-গীতিকায় দেখা যায়, গোরক্ষনাথ তাঁর গুরু মীননাথকে উদ্ধার করতে এসে নেচেছিলেন এবং তাঁর বেশভূষা অর্থাৎ আহার্য অভিনয়েরও বর্ণনা আছে—

অলঙ্কার পাইয়া নাথ করিল ভূষণ,
একে একে পরিলেক যথ আভরণ।
গলাতে দিলেন নাথ সাতছড়ি হার,
করেতে কঙ্কণ দিল অতি শোভাকর।
কপালে তিলক দিল নয়ানে কাজল,
করণেতে দিল নাথ সুবর্ণ কুণ্ডল।

১। চর্যাপদ—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, কমলা বুক ডিপো, পৃঃ ৮৭।

২। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার, পৃঃ ২৩-২৪, মুক্তধারা ১৯৮৬।

৩। বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি—ডঃ আশা দাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৯, পৃঃ ৫৩১।

পায়েতে নুপুর দিল কনক উঝটি।
গায়েতে কাঞ্চলি দিল কোমর কাছটি
এমত করিল সাজ ভুবনমোহন,
আছৌক আনের সাজ—টলে মুনির মন।
সুবর্ণের সাজ করি পরিধান ধোপ,
আছৌক মনুষ্যে মন দিবে করি লোপ।।" [১]

...অর্থাৎ বেশভুষার বর্ণনা হল; এরপর নাচ-গানের আয়োজন হল। তার বর্ণনা—

"নাচন্তি যে গোরখনাথ মাদলে করি ভর।
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর।
নাচন্তি যে গোরখনাথ ঘাগরের রোলে,
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।"[১]

চর্যাগীতির রাগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ড: নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—

"চর্যাগীতির পদগুলি যে সুরে তালে গাওয়া হইত তাহা গীতারম্ভে রাগের নামেই প্রমাণ। ২-৩ এবং ১৮ নং। গবড়া বা গউড়া। গবড়া ও গউড়া একই রাগ সন্দেহ নাই এবং খুব সম্ভব কাব্যে যেমন গৌড়ীয় রীতি রাগের মধ্যেও তেমনি একটি ছিল গৌড়ী রাগ। সঙ্গীত ইতিহাসের দিক হইতে চর্যাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গাল রাগ। বঙ্গাল রাগটি যে কি ধরণের ছিল তাহা আজ বুঝিবার উপায় নাই। অথচ ভারতীয় মার্গ সংগীতে বঙ্গাল রাগ একসময়ে সুপরিচিত রাগ ছিল এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী চিত্র নির্দেশে বঙ্গাল রাগের চিত্রও দুর্লভ নয়। পরে কখন যে কিভাবে এই রাগ লুপ্ত হইয়া গেল তাহা জানা যাইতেছে না।"[২] দক্ষিণ ভারতে শুদ্ধ বঙ্গাল রাগটি পাওয়া যায় বিশেষত ত্যাগরাজার কৃতীতে[৩]। চর্যাগীতির পুঁথিতে সতেরটি রাগের নাম পাওয়া যায়।[৪] 'সঙ্গীত রত্নাকর' প্রণেতা শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতক) চর্যাগীতিকে 'প্রকীর্ণক' প্রবন্ধ গীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫]

১। বাংলা সাহিত্যের কথা—শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, পৃ: ৫১-৫৬; লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী প্রকাশন, মাঘ ১৩৪৯।

২। বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায় (আদিপর্ব)—দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ: ৬৩৭-৬৩৮।

৩। New items in Kuchipudi by Dr. Pappu Venu Gopal Rao—Kalanubhava Manjari journal. Published by Abhinayasudha, Sangeet Natak Akademi — Kalamandir Trust, Madras, 1993.

৪। চর্যাগীতি—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পৃ: ২৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৭২।

৫। চর্যাগীতির ছন্দপরিচয়—নীলরতন সেন, পৃ: ৫৫, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪।

পালযুগ—সংস্কৃত সাহিত্য ঃ

বাংলাদেশের সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাসে ধারাবাহিকতার সূত্রপাত পাল রাজাদের সময় থেকে। সাহিত্যে তার সাক্ষ্য রয়েছে বহু প্রকীর্ণ শ্লোকে এবং 'রাধা', 'সত্যভামা', 'উৎকণ্ঠিতমাধব' প্রভৃতি অধুনালুপ্ত নাট্যরচনার নামাবলীতে।[১]

পালযুগে রচিত কাব্যগ্রন্থ সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত **'রামচরিত কাব্য'**-টিতে নৃত্যকালীন বেশভূষা, অলঙ্কার, মণিমুক্তাখচিত আভরণ, চন্দন, কুমকুম, নানা যন্ত্রোত্থিত মন্দ্রমধুর ধ্বনি সহযোগে তান-লয় বিশুদ্ধ সংগীত ইত্যাদির বিবরণ আছে। সে যুগের কবির বর্ণনায় নৃত্য, গীত ও দেবদাসীদের কথা জানা যায়। সে যুগের কবি রাজ-প্রশস্তিতে রাজার কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ গর্বভরে বলেছেন, রাজপ্রাসাদে (অথবা রাজধানীতে) প্রতি সন্ধ্যায় 'বেশ বিলাসিনীজনের মঞ্জরী মঞ্জুস্বনে আকাশ প্রতিধ্বনিত হয়'। সে যুগের কবি মন্দিরের একশত দেবদাসীর রূপ যৌবনের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন, 'ইহারা কামিজনের কারাগার ও সংগীত কেলি-শ্রীর সঙ্গমগৃহ এবং ইহাদের দৃষ্টিমাত্রে ভস্মীভূত কাম পুনরুজ্জীবিত হয়," সে যুগের কবি বিষ্ণু মন্দিরে লীলাকমল হস্তে দেবদাসীগণকে লক্ষ্মীর সাথে তুলনা করতে দ্বিধা করেন নি।[২]

"রামচরিতকাব্য"-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা পাই—

বিবিধৈর্মহাধনৈরপি দিব্যাঙ্গৈরংশুকৈরতিবিচিত্রৈঃ।
কস্তূরীকালাগুরুমলয়জ কাশ্মীর কর্পূরৈর।। ৩৫।।
উন্মুদ্রমন্দ্র মধুরাতোদ্যব্যতিভেদ মেদুরোদগারৈঃ।
গীতিলয়লব্ধি সুভরৈরধরীকৃত তুম্বুরু ধ্বনিতৈঃ।।৩৬।।

এখানে কস্তুরী. কালাগুরু, চন্দন, কুঙ্কুম, ও কর্পূর এবং চতুর্বিধ বাদ্যযন্ত্র, গানের বিভিন্ন লয়ের উপস্থিতি এবং তুম্বরুর বর্ণনা আছে।।[৩]

পরমার বিকারাবির্যুবতিভিরপি দেববারবণিতাভিঃ।
ক্বণিতমণি কিঙ্কিণী কং কৃত নেপথ্যোদ্ভটং নটন্তীভিঃ।।

যুবতী দেবদাসীগণ মণিময় কিঙ্কিনীসহ উদ্ধতভাবে নৃত্য করছিল।[৪]

১। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ—শ্রীসুকুমার সেন, পৃঃ ১২, রূপা, ১৯৭০।

২। বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ১৯৩, ১৯৫, জেনারেল প্রিন্টার্স ও পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৪।

৩। গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক প্রণীত, পৃঃ ৯৭, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৫৩।

৪। ঐ, পৃঃ ৯৭।

সেনযুগ ঃ

সংস্কৃতকাব্যের সুবর্ণযুগ। সেনরাজারা প্রায় সকলেই কাব্যচর্চা করতেন। সেই যুগে নৃত্যগীত চর্চায় কবি পন্ডিতরা বিমুখ ছিলেন না। যাঁরা 'নট'-বৃত্তি অবলম্বন করতেন সমাজে তাঁদের সম্মানীয় আসন ছিল, বাংলায় 'নট' উপাধিতে তাঁরা ভূষিত হতেন। 'নট' গঙ্গোক রচিত কয়েকটি শ্লোক শ্রীধর দাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-তে রক্ষিত আছে।[১] দক্ষিণ ভারতে এখনও নৃত্যসম্প্রদায়ের গুরুকে নাট্টুবান বলা হয়।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব—এই পাঁচজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন—

গোবর্দ্ধনশ্চশরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ।।

এই শ্লোকে ধোয়ী কবিরাজ হিসেবে খ্যাত।[২] এই পঞ্চকবির খ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়ে যে ১৫১০ খৃঃ গুজরাটের চিত্র শিল্পে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই ছবি দিল্লীর জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে (১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। গোবর্ধন আচার্য রচিত আর্যা সপ্তশতীতে সংগীত ও নৃত্যের সংবাদ আছে। যেমন একটি শ্লোকে আছে "সকলকলাঃ কল্পয়িতুং প্রভোঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ। সেনকুল তিলকভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্চ।"

প্রবন্ধের (নৃত্যগীতাদি) এবং কুমুদবন্ধুর (ছন্দের ষোলকলা) সকল কলার সম্পূর্ণতা সাধনে সেন কুলতিলক ভূপতি ও পূর্ণিমার সন্ধ্যাই সমর্থ।[৩]

নৃত্যগীতের সঙ্গে হস্ততাল দ্বারা সঙ্গত করা হয়—

কৃত হসিত হস্ততালং মন্মথতরলৈ বিলোকিতাং যুবভিঃ।
ক্ষিপ্তঃ ক্ষিপ্তো নিপতন্নঙ্গে নর্তয়তি ভৃঙ্গস্তাম্।। ১৫৫।।

হাতে তাল দিয়ে তালরক্ষা করা হত, খুব সম্ভবত নানারকম কঠিন তালের গানের সঙ্গে নৃত্য করা হত, সহকারী-বাদক সেই তালকে আধার করে অলংকৃত করে বাজাত। তার ফলে সংগীত ও নৃত্যশিল্পীর যাতে বর্ণকাল (মাত্রা) ঠিক থাকে

১। প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী—শ্রী সুকুমার সেন, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩।

২। কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৬২।

৩। আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ (গোবর্ধন আচার্য রচিত), শ্রী জাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, পৃঃ ৯৫-৯৮, সান্যাল এন্ড কোং, ১৩৭৮।

সেই জন্য হাতে তাল ধরে রাখার রেওয়াজ ছিল। যে পদ্ধতি এখনও বাংলার কীর্তনে দেখতে পাই।

আর্যায় অনেক বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। যেমন, ঢাক, শঙ্খ, বাঁশী, বীণা ইত্যাদি। মহিলারা বীণা বাজাতেন, তাতে হৃদয় বিকম্পিত হত—

বীণাতন্ত্রকাণৈ: কেষাং ন বিকম্পতে চেত:" ।।৪৫৩।। এবং
গায়ন্তি গীতে শংসতি বংশে বাদয়তিসা বিপঞ্চীষু।

দ্বাদশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গে শুধু উচ্চাঙ্গের গীত ও বাদ্যের প্রচলন ছিল তাই নয়, উচ্চাঙ্গের নৃত্য এবং অভিনয়েরও প্রচলন ছিল। সাধারণত মহিলারাই নৃত্য করতেন—

বৈগুণ্যেহপি হি মহতা বিনির্মিতং ভবতি কর্মশোভায়ৈ।
দুর্বহ নিতম্বমন্থরমপি হরতি নিতম্বিনীনৃত্যম্।।৫৫৪।।[১]

দ্বাদশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গে রসভাবপুষ্ট উচ্চাঙ্গ নৃত্যাভিনয় প্রচলিত ছিল। আবরণ পটযুক্ত ('যবনিকা') মঞ্চে এই নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হতো। একটা আর্যার উপমানবাক্যে এই নৃত্যাভিনয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। নায়ক বলছেন, যবনিকা অপসারিত হলে নটী যেমন প্রথমে লজ্জা প্রকাশপূর্বক ক্রমে রসভাব পুষ্ট অভিনয় দ্বারা হৃদয় হরণ করে, দয়িতাও তেমনি আমার হৃদয় হরণ করেছে ঃ

ব্রীড়া প্রসর:প্রথমং তদনু চ রসভাব-পুষ্ট চেষ্টেয়ম।
জবনী বিনির্গমনাদনু নটীব দয়িতা মনো হরতি।।৫৩৮।।[১]

আর্যাসপ্তশতীতে তৎকালে প্রচলিত বেশভূষাদি অঙ্গসজ্জার বিস্তৃত পরিচয় আছে।

স্বয়ং জয়দেব সংগীত বিশারদ ছিলেন। **গীতগোবিন্দ** গাইবার ও নাচবার জন্য জয়দেবের দল ছিল। শোনা যায় পদ্মাবতী সেই দলে নাচতেন এবং জয়দেব মৃদঙ্গ বাজাতেন। গীতগোবিন্দের পদগুলিতে সেকালের নৃত্যগীত বা নাটযাত্রা পালার নিদর্শন পাওয়া যায়।[২] অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে জয়দেবের পদাবলী নৃত্যগীত সহযোগে পরিবেশিত হতো। জয়দেব গাইতেন ও পদ্মাবতী নাচতেন। কোচবিহারের ছোটরাজা শুক্লধ্বজ তাঁর 'গীতগোবিন্দ'-এর টীকায় এই কথা বলেছেন এবং তাঁর সভাকবি রাম সরস্বতীও সে কথার পুনরুক্তি করেছেন 'জয়দেব কাব্য'তে—

কৃষ্ণের গীতক জয়দেব নিগদতি
রূপক তালে চেবে নাচে পদ্মাবতী।

১। আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ (গৌবর্ধন আচার্য রচিত), শ্রীজাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, পৃ: ৯৫-৯৮, সান্যাল এন্ড কোং, ১৩৭৮।

২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, শ্রী সুকুমার সেন, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩।

জয়দেব-পদ্মাবতীর সঙ্গীতাভিজ্ঞতার চমকপ্রদ গল্প আছে সেকশুভোদয়ায়। 'পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্ত্তী' শুধু এই সাক্ষ্যই দেয় না অধিকন্তু জানিয়ে দেয় যে, জয়দেবের গানের দল ছিল এবং তিনি ছিলেন দলের অধিকারী। তাঁর এক দোঁহায় পরাশরের নাম তো গীতগোবিন্দের শেষে পরিচয়-শ্লোকে আছে—

শ্রী ভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুত-শ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদি-প্রিয়-বন্ধু কণ্ঠে শ্রী গীতগোবিন্দ-কবিত্বমস্তু।

পরাশর ছিলেন বন্ধু,—শ্বশুরবাড়ি বা মামার বাড়ির লোক, সুতরাং গানের দল ছিল ঘরোয়া।[১] তাঞ্জোরের সরস্বতীমহল লাইব্রেরী থেকে যে 'গীতগোবিন্দ' সম্পাদিত হয়েছে, তার ভূমিকাতে উল্লেখ আছে—it is noteworthy features of the Ashtapadies that they have all been composed for the express purpose of being used for NRITYA (Dance with Abhinaya). This is indicated by the reference, in the text of the Ashtapadi, to the fact that Sri Jayadeva sang these Ashtapadies to the accompaniment of Nritya by his devoted wife Padmavati. He calls himself in introductory verse No. 2 'an expert in directing the feet of Padmavati in her dance ("পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্ত্তী") and again he refers to the collaboration of Padmavati in his recital in Ashtapadi[2] (বিহিত পদ্মাবতী সুখে সমাজে—ভণতি-জয়দেব কবিরাজ-রাজে)। এই অষ্টপদীগুলি নৃত্যের অর্থাৎ নৃত্যাভিনয়ের জন্য রচিত। জয়দেব তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর নৃত্যের জন্য অষ্টপদীগুলি গাইতেন। তিনি ২ নম্বর শ্লোকসংখ্যায় এটি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

The gesture that are found in this work are simple, highly expressive and graceful. It is extremely probable that the work was composed by the direct disciple of Sri Jayadeva himself or those just after them.[2] অঙ্গাভিনয় অত্যন্ত সরল, লাবণ্যমন্ডিত, অভিব্যক্তিপূর্ণ সম্ভবত এই কাজটি জয়দেবের নিজস্ব শিষ্য বা প্রশিষ্য দ্বারা কৃত।

১। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, শ্রী সুকুমার সেন, পৃ: ৮২-৮৩, রূপা, ১৯৭০।

২। Geeta Gobinda with Abhinaya—Thanjavur Maharaja Sarfoji's Saraswati Mahal Library Society, Thanjavur. ed. by K. Vasudeva Sastri. 1989, Preface, Page X.

গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের একটি শ্লোকে রাসনৃত্যের উল্লেখ পাই—

করতাল তাল তরল বলয়া বলিকালিত কলস্বন বংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে।। ৪৫।।

—অর্থাৎ কোন যুবতী মুরলীধ্বনির সঙ্গে করতালি দিয়া তাল রক্ষা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার বলয়গুলি মৃদুভাবে শিঞ্জিত হইতেছে। হরিরাসরসে নৃত্যপরা সেই সহচারিণীর প্রশংসা করিতেছেন।

চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগ

বাংলা সাহিত্যে নৃত্যের উপাদানের সন্ধান করতে হলে দুটি প্রধান উৎসের দিকে হাত বাড়াতে হয় — মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবসাহিত্য। এই দুটি উৎস নিয়ে আলোচনার আগে গৌড়ীয় যুগ বা চৈতন্য-পূর্ব যুগের সাহিত্যের দিকে তাকাতেই হবে। তুর্কী বিজয়ের আগে পর্যন্ত বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরবর্তী ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিমস্থিত বৃহৎ ভূ-ভাগ সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল। এই পঞ্চবিভাগের সাধারণ নাম 'পঞ্চগৌড়'। এ নাম গৌড় দেশেরই প্রভাব-ব্যঞ্জক, বস্তুত: গৌড়দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য। এখানকার রাজারা 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউ-এন-সাঙ মহারাজা শিলাদিত্যকে ('পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি বিশিষ্ট) দর্শন করে যান। গৌড়দেশীয় রাজারা অনেকবারই এই উপাধি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলার তুর্কী সম্রাটগণ গৌড়েশ্বর উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন এরকম প্রমাণও পাওয়া গেছে।[১]

খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দ শেষ হতে না হতেই বাংলায় তুর্কী আক্রমণের ঝড় বয়ে গিয়েছে। মগধ জয় ও বিধ্বস্ত করে পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করতে তুর্কীদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। রাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন, বহু রাজপুরুষ ও বিদ্বজ্জনও তাঁর সহগামী হন। আরও অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ পন্ডিত নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে Dr. Moti Chandra-এর অভিমত The Times of India-এর ১৯৬৬ সালের Annual Journal-এ পাই—"Early copper and bronze images from Nepal are rare. Some Napalese bronzes of the 15th-16th centuries have come to light recently. It is possible that the art of metal casting was introduced in Nepal by the migrant artists who fled from Bengal and Bihar at the end of twelfth century

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, সম্পাদনা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬, পৃঃ ১২৮-২৯১।

in the wake of Muslim invasion and consequent destruction of Buddhist centres of worship and learning. By judging from some dated images, the Pala tradition seems to have survived in Nepal, though in a decadent form, till the 15th century."[১] নেপালের প্রাচীন তামা বা ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য দুর্লভ। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে নেপালে ধাতব ভাস্কর্য দেখা যায়। সম্ভবত তুর্কী আক্রমণের পর (দ্বাদশ শতক) থেকে যেসব পাল-শৈলীর শিল্পীরা নেপালে বাংলা বিহার থেকে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার ফলেই নেপালে ধাতব ভাস্কর্য শিল্পের পত্তন ঘটে।

উত্তরবঙ্গ থেকেও অনেকে চলে যান উদ্বাস্তু হয়ে কামতা-কামরূপ অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে তাই বাংলার শিল্প সংস্কৃতির ধারা কতকাংশে রক্ষা পেয়েছিল। এমন কী নেপাল থেকে বাংলার সেই ধারা হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে এবং চীনেও পৌঁছেছিল।[২] লক্ষ্মণ সেন অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে রাজধানী নবদ্বীপ ত্যাগ করেন এবং তাঁর শূন্য স্থান দখল করে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কী জাতি, যাদের নেতা ইফতিকার-উদ্দিন-বিন্ বখতিয়ার খিলজী।[৩] তুর্কী বিজয়ের প্রথম দিকটি ছিল ধ্বংসের পর্ব। মোটামুটি খৃঃ ১২০০-১৩৫০—এই দেড়শ বছরের বাংলাদেশের কোনও সাংস্কৃতিক বা সামাজিক চিত্র আমরা পাই না, সার্ধ-শতাব্দী জোড়া এই নিস্তব্ধতাই তুর্কী বিজয়ের ভয়াবহতার প্রমাণ।[৩] দেড়শতাব্দী কাল যাবৎ বাংলার সুখ-শান্তি বিপর্যস্ত হবার পর চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুর্কীশাসনের প্রবল বেগ অনেকটা মন্দীভূত হয়ে আসে এবং পরবর্তীকালে দেখি তাঁরা ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান থেকেই আসুন না কেন, এদেশে এসে সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হয়ে পড়লেন। মহরম, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পাশাপাশি দুর্গোৎসব, রাস, দোল ইত্যাদিও চলতে লাগল। গৌড় সম্রাটগণের প্রেরণায় হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হল। গৌড়ীয় যুগে বাংলা সাহিত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে অনুবাদ শাখা, লৌকিক শাখা এবং পদাবলী শাখা প্রধান।[৪] বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায় যে, সেই যুগে রাত জেগে লোকে মনসার গান শুনত, যোগীপাল-মহীপাল-ভোগীপালের গীত শুনত, চণ্ডীবাশুলী গাইত, শিবের গান গাইত, কৃষ্ণলীলা খুব জনপ্রিয় ছিল অর্থাৎ প্রধানরূপ

১। The Times of India Annual Journal, 1996, topic—The Art of Nepal—Dr. Moti Chandra, p. 2

২। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার, মুক্তধারা, ১৯৮৬, পৃঃ ৩১।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১৩৯৫, পৃঃ ২১।

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, সম্পাদনা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬, পৃঃ ১২৮-২৯১।

ছিল গীত ও পাঁচালী। পাঁচালী ছিল এক ধরণের গান—মৃদঙ্গ, মন্দিরা, চামর হাতে নৃত্য সহযোগে গীত হত। মূল গায়েন গাইত এবং নাচত। অন্যরা দোঁহার হিসেবে তার সহযোগী হত। উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণলীলা অভিনীত হত—তাকে বলা হত নাট্যগীত বা নাটগীত। অভিজাত সমাজে নাটগীত এবং অনভিজাত সমাজে লোকনাট্য প্রচলিত ছিল। 'নাট' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নৃত্য, [নট্‌ + অ (ভাবে ঘঞ)] এবং বিস্তারিত অর্থ নৃত্যাভিনয়। নৃত্যগীত বা নৃত্যাভিনয়যুক্ত গীতকেই নাটগীত বলা যায়। নাটগীতের অনুষ্ঠানস্থল ছিল দুটি। 'স্থাবর আসর' বসত দেবমন্দিরের সম্মুখে অথবা নাটমন্দিরে, আর 'জঙ্গম আসর' অনুষ্ঠিত হত শোভাযাত্রার গতিপথে, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে। গীতগোবিন্দের পর চৈতন্যপূর্ব দুটি নাটগীতই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। এই নাটগীতের রচয়িতারা অভিজাত সমাজের মানুষ। তাঁদের রচনা অভিজাত সমাজের মানুষদের রসবোধের উৎসাহ জোগাত। সেইজন্যই মধ্যযুগে আর এক জাতীয় নাটগীত দেখা দিয়েছিল। সেগুলিকে লোকনাট্য রূপে চিহ্নিত করা যায়। রচয়িতারা সহজ ভাষায় এবং জনরুচির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই লোকনাট্যগুলি তৈরী করেন। ঝুমুর, ধামালী, কথকতা, পাঁচালী, জাগ-গান, গম্ভীরা, ছৌ ইত্যাদির ভিতর বাংলা লোকনাট্যের বিকাশ হয়েছে এবং এগুলিই সাধারণ বাঙ্গালীর নাট্য পিপাসাকে তৃপ্ত করেছে। এই লোকনাট্যগুলি পল্লীবাংলার মানুষের হৃদয় সহজেই জয় করে। এতটাই জয় করে, যে, আজ এই একুশ শতকেও গ্রামবাংলার মানুষের মন থেকে তাদের আবেদন মুছে যায় নি।[১] প্রাক্‌ চৈতন্যযুগে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।[২] কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান কাব্য।[৩] কৃত্তিবাসী রামায়ণেও নাচের বর্ণনা পাই, নর্তক ও নর্তকীর বেশভূষার বর্ণনা পাই। সীতার স্বয়ম্বর সভায় চন্দ্রের নৃত্য দেখে সবাই লগ্ন ভুলে গিয়েছিল তাই ভ্রষ্টলগ্নে বিয়ে হয়েছিল এরকম উদাহরণ পাই। নৃত্যোপযোগী বাদ্য যন্ত্রের উল্লেখ পাই—বীণা, ঢাক, ঢোল, ডম্ফ, কাঁসী, বাঁশী। এছাড়া চামর এবং হস্তাভিনয়ের উল্লেখ পাই।[৪]

১। বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক, ড: রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (২৫শে বৈশাখ), পৃ: ২১-২৯।

২। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার, মুক্তধারা, ১৯৮৬, পৃ: ৪২-৪৩।

৩। মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে লোক-উপাদান, মুহম্মদ আবদুল খালেক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ: ৫৭।

৪। কৃত্তিবাস রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ, শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা গেজেট, ১৯৬১, পৃ: ৮৫-৮৬।

বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিরহিণী রাধার মর্ম যন্ত্রণার বর্ণনা সহ সমাপ্ত হয়েছে। ড: মনোমোহন ঘোষের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি নাটকের গীতিকাংশ এবং নটনটীগণের উপস্থিত (extempore) উক্তি-প্রত্যুক্তি, নৃত্য ও অভিনয় দ্বারাই কাব্যের রসকে ব্যঞ্জনা দেওয়া হত।[১] অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতি নাট্যকাব্য। নাট্যকাব্যটি তেরটি পালায় বিভক্ত। এই কাব্যের পালাগুলি যে নাট্যগীতির ঠাটে নাচা-গাওয়া হত তার প্রমাণ রয়েছে গানগুলির শীর্ষকে। নাট্যকাব্যটির গানে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। সেই সঙ্গে আছে আরও বেশ কিছু অপ্রাপ্তপূর্ব পারিভাষিক শব্দ ঃ দন্ডক, লগনী, চিত্রক লগনী, দন্ডক লগনী, প্রকীর্ণক লগনী, বিচিত্র লগনী দন্ডক, প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী, প্রকীর্ণক চিত্তক লগনী দন্ডক। 'লগনী' দ্বিসংলাপময় (dialogue) নাট্যরসাশ্রিত গীত পদ্ধতি। জ্যোতিশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর'-এ উল্লিখিত 'লগনী নাচ' এই ধরণের পদ্ধতির প্রাচীনত্বের সূচক। মধ্যবাংলা পাঁচালী কাব্যগীতিতে দোঁহারের নাম ছিল 'পালি'। এ নাম বড়ু চন্ডীদাসের নাট্যকাব্যেও পাই—

"বাঁশী বাজায়িল যবে কাহ্নে
কোকিল কৈল পালি গানে।।"

পরে পালির বদলে সমার্থক 'জুড়ি' ও 'দোঁহার' প্রচলিত হয়েছে। পরবর্তী কালের পদাবলী কীর্তনে, মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী গানে এই রীতিই চলে এসেছে।[২]

মালাধর বসুর '**শ্রীকৃষ্ণবিজয়**' (১৪৭৩ খৃ:) কৃষ্ণলীলার প্রথম কাব্য। এখানেও বাদ্যযন্ত্র, গান, ছোট ছোট নাচের কথা পাই।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড: রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই যুগে নৃত্যগীতের ব্যাপক প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে রচিত চৈতন্য ভাগবতে তার ব্যাখ্যা পাই। চৈতন্য-ভাগবতে রামায়ণের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা আছে। সীতাহরণ পালা দেখতে দেখতে দর্শকরাও কাঁদত। অনেক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাই— শঙ্খ, ঘন্টা, মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডম্বরু, বিষাণ প্রভৃতি। সে সময় সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গান। প্রধান গায়ক (মূল গায়েন) এক হাতে চামর ও আর এক হাতে মন্দিরা এবং পায়ে নূপুর পরে নাচের ভঙ্গিতে গাইতেন, সঙ্গে মৃদঙ্গবাদক তাল দিত।[৩]

সেই সময়কার বেশভূষা, অঙ্গরাগ, অলঙ্কারের বর্ণনা পাওয়া যায়। রেশম শাড়ি, কাঁচুলি, ওড়না। নটীরা ইজার তথা কাঞ্চী বস্ত্র পরত। নানাধরণের কবরীর রীতি

১। বাংলা সাহিত্য, ড: মনোমোহন ঘোষ, ইন্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, পৃ: ৪৯-৫০।
২। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, সুকুমার সেন, রূপা, ১৯৭০, পৃ: ৮২-৮৩।
৩। বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, জেনারেল, ১৩৮০ (বাং), পৃ: ৩০৮-৩০৯।

ছিল—বাঙ্গালী বেহার, নববেহার, পশ্চিমাবেহার, খোপ্যক, দেবমহল, ঘোড়াচূড়া ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খোঁপা। অঙ্গরাগ হিসেবে হলুদ, কুঙ্কুম, চন্দন, কস্তুরী, পত্রাবলী ব্যবহৃত হত। অলঙ্কার—সিঁথি, বেশর (নথ), কুন্ডল (কাবালা), হার, চক্রাবলী অনন্ত, কেয়ূর, বাজু, জসম, রতনচূড়। আরও কয়েকটি নতুন অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়—১। হীরামঙ্গল কড়ি—অথবা মদন কড়ি সম্ভবত কড়ির আকৃতির কর্ণভূষণ। ২। গ্রীবাপত্র—সম্ভবত চিক্ বা হাঁসুলীর মত। ৩। হাতপদ্ম—হাতের পাতার উপর দিকে পরবার কঙ্কনের সঙ্গে যুক্ত পদ্মাকৃতি অলঙ্কার। ৪। উজ্মাটিকা বা উঞ্ছট—সম্ভবত চুটকীর মত পায়ের আঙ্গুলে পরা হত।

মঙ্গলকাব্যের যুগ

বাংলা সাহিত্যের লৌকিক শাখা হল মঙ্গলকাব্যের শাখা। মঙ্গলকাব্য মূলত মধ্যযুগের সাহিত্য। কারও কারও মতে প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবকাল একাদশ শতক। মূলতঃ পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন কবি রচনা করেন। বাংলার জনসাধারণের নিজস্ব কাহিনী ও জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে এবং এই মঙ্গল কাব্যগুলি নৃত্যগীতের বর্ণনায় সমৃদ্ধ। মঙ্গল কাব্যগুলি দু'টি ধারার মিশ্রিতরূপ—লৌকিক ধারা ও পৌরাণিক ধারা।

অনেক রকম মঙ্গলকাব্য আছে—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অভয়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চন্ডিকামঙ্গল প্রভৃতি।

এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে নাচের, বাদ্যযন্ত্রের, রাগরাগিনীর বিশদ বিবরণ পাই। একথা সবাই জানেন, মনসামঙ্গল কাব্যের নায়িকা বেহুলা দেবতাদের সামনে নৃত্যপ্রদর্শন করে নিজের জীবনের অভীষ্ট পূর্ণ করেছিলেন—এই কথাটির তাৎপর্য গভীর। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য—"যে সমাজ জীবন হইতে এই কাহিনী জন্মলাভ করিয়াছিল এবং যে সমাজ এই কাহিনীকে দীর্ঘকাল যাবৎ পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়া আসিয়াছে, সেই সমাজেরই জাতীয় কাব্যের নায়িকা চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ নৃত্যকুশলতা। ইহা হইতেই নৃত্যশিল্পের প্রতি সমাজের কি মনোভাব, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই কাব্য যাহারা গভীরভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন প্রাচীন নৃত্যশিল্পীকে ইহার মধ্যে পূর্বাপরই একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে।[১]

১। বাংলার লোকনৃত্য : বিবিধ, ২য় খণ্ড, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী প্রা: লি:, ১৯৮২, পৃ: ১৫-২৩।

মঙ্গলকাব্যের নায়িকা বেহুলা নৃত্যগীতে পারঙ্গম—বেহুলা এই বাংলারই মেয়ে। বাঙ্গলার বধূ। আর একজন বাঙ্গালী বধূর সংগীতের উল্লেখ পাই সেকশুভোদয়ায়। নায়িকার নাম পাই গঙ্গোনটের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা এবং রাগের নাম পাই 'সুহই'।[১] অর্থাৎ সাহিত্যে আমরা বাংলার তিন জন 'বধূ'র নাম পাই যাঁরা সংগীতে (গীত-বাদ্য-নৃত্য) পারদর্শী ছিলেন এবং লোক সমক্ষে সম্মানের সঙ্গে নৃত্য ও গীত প্রদর্শন করতেন—

১। মনসা মঙ্গল কাব্যের নায়িকা চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ 'বেহুলা'।

২। কবি জয়দেবের পত্নী 'পদ্মাবতী'।

৩। গঙ্গোনটের পুত্রবধূ 'বিদ্যুৎপ্রভা'।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম অংশেই পরপর কয়েকটি শিব নৃত্যের বর্ণনা আছে। মনসার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন আনন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপ শিব একবার নৃত্য করছেন, কবি এই সম্পর্কে লিখেছেন—

"পদ্মারে লয়ে কাঁখে নাচে শিব ঘন পাকে।"

চক্রাকারে নৃত্য করবার মধ্য দিয়ে প্রাচীন শিব নৃত্যের একটি বিশেষ রীতিরই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে শিবনৃত্যের বর্ণনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনসা চন্ডীকে দংশন করার ফলে চন্ডীর মৃত্যু হয়েছিল, শিবের অনুরোধে মনসা চন্ডীর দেহে প্রাণসঞ্চার করলেন, চন্ডী যখন চোখ মেলে তাকালেন, তখন শিব পার্বতীকে পাশে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। এর বর্ণনা চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি বিজয় গুপ্ত দিয়েছেন—

জগৎমোহন শিবের নাচ।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূতপিশাচ।।
রঙ্গে নেহালী গৌরীর মুখ।
নাচে গঙ্গাধর মনের কৌতুক।।
হাসিতে খেলিতে চলিতে রঙ্গ।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গ।।
শিবাই নাচেরে মুখেতে গীত গাহে।
হাতে তালি দিয়া কিংকরে গীত গাহে।।
বিকট দশনে ভ্রুকুটি ভাল সাজে।
ডুমু ডুমু বলি ডমরু বাজে।।
মরিয়াছিল চন্ডিকা জীল আর বার।

১। প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী—শ্রী সুকুমার সেন, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩, পৃ: ৫৩।

ডাকিনী যোগিনী দিল জয়-জোকার।।
কার্তিক গণপতি দাঁড়াইয়া কাছে।
গৌরী মুখ নেহালিয়া ত্রিলোচন নাচে।।
দেখিয়া কৌতুক দেব সমাজে।
পুষ্প বরিষণ করি ধুমধুমি বাজে।।
ডাহিনেতে গৌরী বামে পদ্মাবতী।
হাসিয়া চলিল দেব পশুপতি।।[১]

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী (classical) হর-পার্বতী নৃত্যের এটি একটি সার্থক বর্ণনা। ভরতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের নাচের উল্লেখ পাই—

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবেতে ঢলিয়া।।
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে।।

মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ ও লখীন্দরের পত্নী বেহুলার শৈশবকালীন শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে ঃ

"মা বাপের বাড়ীতে বেহুলা নাচে গায়।"[১]

নৃত্যগীতে অনুরাগ পদ্মিনী রমণীর লক্ষণ বলে বর্ণিত আছে। ছোটবেলায় বেহুলা নাচতে গাইতে শিখেছিল। তার নৃত্য দেখে তার মা অমলা মুগ্ধ হতেন। পুনরায় দুঃখের সময় হাস্যমুখে বেহুলা দেবসভায় নেচে গেয়ে পুরস্কার স্বরূপ স্বামী ও তার ভাইদের জীবন নিয়ে ফিরে আসে।[২]

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে বেহুলার নাচের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পাই মৃদঙ্গের নাম (যা আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রীয় নৃত্যের মূল তালরক্ষক যন্ত্র) এবং রাগের নাম পাই বসন্ত-বাহার।

"যতেক নৃত্যের সজ্জ আনি দেহ মোরে।
নৃত্য করিবারে যাইমু শিবের গোচরে।।" [৩]

১। বাংলার লোকনৃত্য : বিবিধ, ২য় খন্ড, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রা. লি., ১৯৮২, পৃ: ১৫-২৩

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম খন্ড, দীনেশ চন্দ্র সেন, সম্পাদনা অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬, পৃ: ১৮১-১৯৭।

৩। পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস, শ্রী রামনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, ১৩১৮, পৃ: ৫৯।

অর্থাৎ নৃত্যের দেবতার সামনে নৃত্য প্রদর্শন করবে বেহুলা। প্রয়োজনীয় আহার্য অভিনয় সমেত।

"চিত্ররেখা নামেতে উষার প্রিয় সখী।
নৃত্যের যে সাজ গেছে তার কাছে রাখি।।
সেই সজ্জ দিয়া বেউলা করিলেক সাজ।
বিশ্বাবসু চিত্রসেন দুই বাইন রাজ।

....

তাল টংকারিয়া কৈল মৃদঙ্গে আঘাত।
ধ্যান ভাঙ্গি ফিরিয়া বসিলা ভোলানাথ।।

....

আলাপেয়ে পঞ্চমেতে বসন্ত-বাহার।
তার শেষে নৃত্য করে তালে করি ভর।।"[১]

অর্থাৎ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে বাদ্যযন্ত্র, রাগের নাম বসন্ত বাহার, আলাপ পদ্ধতি এবং নর্তকী নিজে গান গেয়ে নাচছে ইত্যাদি বর্ণিত আছে। নাচের আরও একটি বর্ণনাও খুব সুন্দর—

লাচারি—পাঠমঞ্জরী

"নৃত্য করে বিপুলা সুন্দরী।
যত দেব হরষেতে বসি দেখে চারি ভিতে,
কটাক্ষে মোহিল সুরপুরী।।
খঞ্জন গমনে যায় তালবাট হাতে পায়
অলক্ষিতে সূতার সঞ্চারে।
বায়ু ভরে উভা হয় শূন্যে ভঞরি লয়,
উলছে সঙ্কেত তাল ভরে।।
অদ্ভুত নাচন দেখি দেবগণ হইল সুখী
মানে কন্যা করে অনুমান।।"

শৃঙ্গার রসদৃষ্টিযুক্ত নৃত্য, খঞ্জন গতি, তালে দক্ষা, শূন্যে ভ্রমরী অর্থাৎ আকাশ ভ্রমরীর বর্ণনা পাই—

১। পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস, শ্রী রামনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, ১৩১৮, পৃ: ৫৯।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলেও বেহুলা নর্তকী নৃত্যগীতে সুদক্ষা ছিলেন—

"বসিয়াছেন মহাদেব সঙ্গে ভূতগণ।
মৃদঙ্গতে ঘা দিয়া আরম্ভ কীর্তন।।
শোকে উপবাসে বেহুলার রাগ নহে ঢিল।
উচ্চৈস্বরে গাহে গীত যেমন কোকিল।।
মুখে গীত গায় বেহুলা পায়ে ধরে তাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল।।[১]

এখানে বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ। কীর্তনের সঙ্গে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় গানের সঙ্গে তাল সংপৃক্ত নৃত্য করছেন।

দেবসভায় বেহুলার নৃত্য বর্ণনায় খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের রচনাটি সার্থক। এতে রয়েছে সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুসারী নৃত্যের বিশদ বর্ণনা।

"দেবতা সভায় গিয়া খোল করতাল লয়্যা
নাচে কন্যা বেহুলা নাচনী।
যতেক দেবতা দেখি ফিরে যেন নৃত্যশিখী
গায় যেন কুকিলের ধ্বনি।।
ঘন ঘন তাল রাখে আঁচলে বয়ান ঢাকে
হাসি হাসি দশন দেখায়।
মুখে গায় মিষ্ট বোল খয়ের কাষ্ঠের খোল
তাথৈ তাথৈ দ্রিমিকি বাজায়।।
আগু পাছুয়ান গিয়া নাচে কন্যা পাক দিয়া
পায়ে বাজে রতন নূপুর।
নবীন কুকিল যেন রহি রহি ঘন ঘন
মুখে গায় বচন মধুর।।

....

নাচে কন্যা বেহুলা নাচনী
মুখে মন্দমন্দ হাসি ক্ষেণে রহি উঠি বসি
যেন নাচে ইন্দ্রের নটিনী।।
করে কাংস্য করতাল বলে ধনি ভাল ভাল
কটিতে কিঙ্কিনী ঘন বাজে।

১। পদ্মাপুরাণ মনসামঙ্গল-বিজয়গুপ্ত, শ্রীপ্যারীমোহন দাস কর্তৃক সংগৃহীত ও সুরেশ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩৭, পৃ: ২১১।

আসিয়া হরের কাছে বেহুলা সন্ধানে নাচে
প্রাণপতি জীয়াবার কাজে।।
রহি রহি পাক মেলে মরাল গমনে চলে
মুখ যেন পূর্ণিমার শশী।
খদির কাষ্ঠের খোল বেহুলার মিষ্ট বোল
মোহ গেল যত স্বর্গবাসী।।

বেহুলা নাচিছে সুরপুরে।
নাহি হয় তাল ভঙ্গ মনে বড় বাঢ়ে রঙ্গ
মত্ত ময়ূর যেন ফিরে।।
রঙ্গে ভঙ্গে হস্ত নাড়ে ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়ে
অই রীতে গায় মিষ্ট বাণী।
নৃত্যগীতে মন মোহে যতেক দেবতা কহে
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।।

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে কবি জগজ্জীবন রচিত মনসামঙ্গলে নৃত্যের বর্ণনা পাই[১]—

অঙ্গভঙ্গ করি নাচে বিদ্যাধরী
থমকে থমকে চলি।
দেবগণের সমাজে চান্দোর বধূ সাজে
বালী নৃত্য করে কুতূহলী।।
আকাশের ঘনঘটা যেন বিজলীর ছটা
বালী মন্দ মন্দ মুখে হাসে।
শূন্যেতে ধরে পাক যেন কুম্ভোরের চাক
সমুখে সঞ্চরে আকাশে।।
কোকিল জিনিয়া ধ্বনি নৃত্য করে বানিয়ানী
গজের গমন শীঘ্র অতি।
নৃত্য করে নির্মল ক্ষেনে চলে চঞ্চল
খঞ্জন জিনিয়া শীঘ্রগতি।।
চাহে কটাক্ষ নয়ানে যেন মদনের বাণে
হাসিয়া হাসিয়া বাক্য বোলে।

১। কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ: ৭৯।

দেখিয়া দেবতাগণ মুর্চ্ছিত সর্বজন
শংকর পড়িয়া গেল ভোলে।।

দ্বিজরাম দাস রচিত 'অভয়মঙ্গল কাব্যে' নৃত্যের বর্ণনা পাই। তাতে রাগ ব্যবহৃত হয়েছে 'সারঙ্গ রাগ'। এটি কালিকা তান্ডব নৃত্যের বর্ণনা—

সংহারিয়া বৈরীঘটা রুধিরে রঞ্জিয়া ছটা
অবগাহ রুধিরে তরঙ্গে।

মোসানে নাচতি কালী কেলির তরঙ্গ।
তা তা তা ধৃমকি ধৃমি ধৃমিকি ধৃমিকি ধৃমি
গরজে মুরজ পাখোয়াজ।
রুধির জলধিজলে আন্দোলে ভুজবলে
তালে নাচে চরণ সরোজ।।[১]

রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে নটী বা রাজদাসীর নৃত্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে ঃ

সনকা নটিনী নাম গৌড়-নিবাসী
দেবকন্যা সমতুল্য সাক্ষাৎ উর্বশী।
চিন্তামণি পরিপাটী বেউশ্যার ঠাট
রাজদরবারে গিয়া উসারিল নাট।
আগু হয়ে বায়েন মাদলে দিল ঘা
মেয়েদের ধাওয়াধাই নটী নাচে বা।
আচম্বিতে আরম্ভিল অনঙ্গজরপ
সভামধ্যে নৃত্য করে বয়স অল্প।
সনকা বেউশ্যা নাচে নৃপতির মাঝে
ঘন ঘন সঘনে ঘুঙ্ঘুর বাদ্য বাজে।
তাধিনিতা ধিনি ধিনি বাজয়ে মাদল
মৃদঙ্গ মন্দিরা শব্দ উঠে সুসরল।
রুনুঝুনু চরণে নূপুর ঘন চলে
ঝনঝন করতাল মকরন্দ বোলে।
ডাকে পাকে চলন বলন সাবধান
শূন্য ভরে উঠে বৈসে রাখে পঞ্চতান।

১। দ্বিজরাম দাস বিরচিত, অভয়মঙ্গল, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃঃ৩৮১।

কোকিল মধুর ভাষে মনোহর গীত
রাধার মহিম গায় রাধার চরিত।
নাটগীতে মোহিত করিল সভাজন
রূপ দেখি মরমে ভুলিল ভুঞাগণ।
দেবতা-সমাজে যেন নাচে বিদ্যাধরী
আনন্দমোহিত সভে বলে হরি হরি।
বেউশ্যার রূপে সভা মোহিত হইল
অঙ্গের কাবাই রাজা বক্সিস করিল।
পানের বাটায় ছিল পঞ্চাশ মোহর
বেউশ্যার হাথে হাথ দিল গৌড়েশ্বর।
রাজা দিল বক্সিস দেখিল ভুঞাগণ
লালবান্ধা জরি দিল হাসন হুসন।
বারভুঞা চৌদিকে অনেক ধন দিল
সনকার রূপ দেখ্যা নৃপতি ভুলিল।[১]

নৃত্যগীত দ্বারা মঙ্গল অর্চনার জন্য যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হত তার প্রমাণ পাই কবি জগজ্জীবন রচিত 'মনসামঙ্গল'-এ 'কেদার'-রাগে—

মদালসা আদি সহচরী হইয়া কুতুহল।
নৃত্যগীত হরষিতে করিল মঙ্গল।।[২]

উপরোক্ত বিভিন্ন কবিদের রচনা থেকে মঙ্গলকাব্যে নৃত্যভঙ্গিমা যেমন, ত্রিভঙ্গি, গতিভেদ—গজগতি, মরালগতি ইত্যাদি, দৃষ্টিভেদ, ভ্রমরী-আকাশ ভ্রমরী, জানুভ্রমরী, একপদভ্রমরী বিষয়ে জানতে পারি। জানতে পারি মূলত বাংলার নর্তন বৈশিষ্ট্য—পাক বা ভ্রমরী, চারী, রাগরাগিনীর নাম—বসন্ত বাহার, লাচারী, পঠমঞ্জরী, সুহই ইত্যাদি, বাদ্যযন্ত্র—মৃদঙ্গ ও পাখোয়াজ যা আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত নৃত্যগুলিতেও তাল রক্ষক আনদ্ধযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত হত ঘনবাদ্য—কাঁসার করতাল, কোমরে কিঙ্কিনী, পায়ে নূপুর। শাস্ত্রানুসারে শিল্পী যে নৃত্য-গীত, তালে-লয়ে পারদর্শী তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নৃত্য ও সঙ্গীত এদেশে নারীদের সাধনার বিষয়বস্তু ছিল। অর্থাৎ গভীরভাবে

১। প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী, সুকুমার সেন, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৭২, পৃঃ ৫৬-৫৭।
২। দ্বিজরাম দাস বিরচিত, অভয়মঙ্গল...... ......পৃঃ ১৪২।

অনুশীলন করে শিখতে হত। নৃত্যকালীন তালভঙ্গ সে যুগের সমাজে এক কঠিন পাপ বলে গণ্য ছিল। এই পাপে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে নৃত্যশিল্পীরা স্বর্গভ্রষ্টও হয়েছে।

মনসামঙ্গলে উষা-অনিরুদ্ধ-এর তালভঙ্গের বর্ণনা পাই—

জয় জয় পরে উষা কাচের বসন।
গঙ্গা যমুনা বন্দে মাথে মোহনবাঁশী নিল হাথে
দাঁড়াইল ইন্দ্রের সভায়।।
কোঙ্গর মৃদঙ্গ নিলা উষা মোহন বাঁশী।
নৃত্য করিতে নামিলা রামা পরম রূপসী।।
তাথিনি তাথিনি তাল নাচে কন্যা সন্নিধান
ধন্য ধন্য বলে ইন্দ্ররায়।
মনসাকে বলে ধোবিনী শোনগো ব্রহ্মাণি,
কেন নৃত্য দেখ বিষহরি।
মা বিষ-নঞানে চাও তালখানি ভেঙ্গে দাও
পাউক দেখিবারে ইন্দ্রায়।।
মা বিষ-নঞানে চায় তালখানি ভেঙ্গে যায়
দেখিবারে পাইল ইন্দ্ররায়।
উষা হও লো নাটুয়ার জাতি গরবে না চিন মতি
কি দেখিয়া তোর ভঙ্গ তালে।
নাটুয়া আমার স্থান ছাড়রে জন্ম লও গা চন্ডালের ঘরে
এ বার বছরের তরে।

এই অভিশাপের ফলে উষা-অনিরুদ্ধ মনসামঙ্গলের নায়ক-নায়িকা লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার মর্তে জন্মগ্রহণ।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামদেবের 'অভয়মঙ্গল কাব্য'-এর স্বর্গনর্তক মালাধরের ইন্দ্রসভায় নৃত্যকালীন তাল ভঙ্গের একটি কারণ নির্দেশ করা হয়েছে—

হরের কণ্ঠেতে নাগ দোলে শতেক ফণা।
তাহা দেখি মালাধর পাসরে আপনা।।
তা তা তা তালে তথি নাচেরে মালাধর।
তাথৈয়া তাথৈয়া তালে নাচে পদভর।।
ঝাঝা তালে নাচেরে করিয়া রঙ্গসার।
তাথিয়া তাথিয়া তালে গতি হৈল ভার।

তালভঙ্গ হৈল নর্তক মালাধর।
এই দেখি হর-জায়া জ্বলিল বিস্তর।।

বর্ণনাটির মধ্যে বিশুদ্ধ নৃত্তের ব্যাখ্যা আছে।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যেও স্বর্গ নর্তকী রত্নমালার এই প্রকার তালভঙ্গ ও তারজন্য স্বর্গসভা থেকে অভিশপ্ত হবার বর্ণনা পাওয়া যায়—

ধনির নোহর লীলা নাচে কন্যারত্নমালা
নৃত্য দেখেন দেবগণ।
তাতিনি তাতিনি তিনি মন্দিরা মৃদঙ্গ ধ্বনি
ঘনবাজে রতন কঙ্কন।।
হয়ে অতি সাবহিত নারদ গায়েন গীত
বীণা গুণে তরল অঙ্গুলি।
দুঁহে ত মধুর গায় ঠমক থমক বায়,
দেবগণ হৈল কৌতুহলী।।
ভুবনমোহন কাচে রঙ্গিনী তান্ডব নাচে
গান মুনি গান্ধার-নিষাদ।
মুখর নূপুরশালী দেয় ঘন পদতালি
দেবগণ দেয় সাধুবাদ।।
সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র করবী বাঁধে
মালতী মল্লিকা চাঁপা গাভা।
কপালে সিঁন্দুর ফোটা প্রভাতে ভানুর ছটা,
চৌদিকে চন্দন বিন্দু শোভা।।
পরি দিব্য পাট শাড়ী কনক রচিত চুড়ি,
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মোতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবর মলয়জ পঙ্ক।।
পীত তড়িত বর্ণে হেম মুকুলিকা কর্ণে
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলী।
রতন পাসলি ছটি পরে দিব্য তুলাকোটি
বাহু বিভূষণ ঝলমলি।।
দেবীর আদেশ স্মর হাথে লয়ে ধনু:শর
হানে বীর সম্মোহন বাণ।

অবশ হৈল অঙ্গ হৈল তার তালভঙ্গ
শ্রীকবিকঙ্কন রস গান।

দেবী ভবানী এই তাল ভঙ্গের দোষে তৎক্ষণাৎ তাকে অভিশাপ দিলেন।

তালভঙ্গ হৈল রামা লাজে হেঁটমুখী।
যতেক দেবতা সভে হইলা বিমুখী।।
তালভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী।
যৌবন গরবে নাচ হয়ে অভিমানী।।
সুধর্ম সভায় নাচ হয়ে খলমতি।
মানব হইয়া ঝাট চল বসুমতী।।

অর্থাৎ উপরোক্ত বিবরণ সমূহ থেকে বোঝা যায় নৃত্যকালীন তালভঙ্গ দোষটি সেইযুগে কত গুরুতর বলে বিবেচিত হত। সুতরাং এইসব ত্রুটিবর্জিত নৃত্য আয়ত্ত করতে কতটা কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ নৃত্য এক অতি কঠোর সাধনার ফসল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও একটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনাটি এত বিস্তৃত এবং নিখুঁত যে তা পড়লেই বোঝা যায়—এর রচয়িতা এমনই একটি নৃত্য নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট দক্ষ ও বোদ্ধা ছিলেন।

নিম্নোক্ত নৃত্যটি স্বর্গ নর্তকী অম্বুবতীর নৃত্য এবং ধর্মপূজা মর্ত্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তাকে তাল ভঙ্গের দোষে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করাবার ষড়যন্ত্র অবলম্বনে রচিত—

অশেষ বিশেষ করি লাসবেশ
নাচিতে চলিলা নটী।
মুনি মনোহরা অপর অপ্সরা
সঙ্গে সহচরী ছ'টি।।
সঙ্গে বাদ্যকর অতি মনোহর
গরবে না চলে পা।
ঘুরায়ে নিতম্ব কুচ করি কুম্ভ
বামে হেলায়ে মধ্য গা।।
হেরিলে বদন মোহিত মদন
রতন রঞ্জিত অঙ্গে।

গজেন্দ্র গামিনী প্রবেশে কামিনী
দেব-সভা নানা রঙ্গে।।
দেবতা সকলে বন্দি কুতূহলে
মৃদঙ্গে দিলেক ঘা।
দেবকন্যা ধাই চলে রম্ভা বাই
ঐ নটী নাচে বা।।
তাল মান তান আরম্ভিল গান
মূর্তিমান ছয়রাগ।
রাগিনীর গতি বুঝি অম্বুবতী
নাটে বাড়ে অনুরাগ।।
ধিনি ধিনি ধাউ তা নাউ তা নাউ
তাথেনে তাথেনে থা।
বাজিছে সরল নর্তকী সকল
চঞ্চল ফেলিছে পা।।
হেলায় কাঁকলি কাঁপায়ে অঙ্গুলি
অঙ্গ রঙ্গ কত ঠাট।।
হাঁকে ঝাঁকে পাকে দেবতা সবাকে
নর্তকী তুলিছে নাট
আড় আধ আধ চলি পদ পদ
মুখে গদগদ বাণী।
নাচিছে গাইছে নাপানে[১] বলিছে
তানানা তেথিনির্ধোনে।।
নাচে নটী মন তুষি নানা ধন
পেয়ে অহংকার বাড়ে।
হেন কালে তাপ দেবী অভিশাপ
পাপ আসি ধরে ঘাড়ে।।
থেই থেই বলি দেয় করতালি
চলিতে চঞ্চল অঙ্গ।
চাক ভাঁওরিতে[২] ফিরিয়া নাচিতে
হৈল তার তাল ভঙ্গ।।

১। নাপানে-করুণ সুরে
২। চাক ভাঁওরিতে—চক্র ভ্রমরিতে

দেবতা সম্মুখ হইল হেঁট মুখ
বিধাতা বিমুখ তায়।
গুরুপদ দ্বন্দ্ব ভাবি সদানন্দ
দ্বিজ ঘনরাম গায়।।

মঙ্গলকাব্যে আহার্য অভিনয়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত এই নৃত্য প্রাচীনযুগের শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরই সৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে নৃত্যকলা মধ্যযুগে তুর্কী আক্রমণের পর থেকেই সমগ্র ভারতে অত্যন্ত নিন্দনীয় হয়ে পড়েছিল কারণ নৃত্যকলা ভোগসর্বস্ব-কাম কলা যুক্ত সস্তা আনন্দের প্রকরণে পর্যবসিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের সময় থেকে নৃত্যকলা আবার গৌরবময় ভূমিকায় বা নতুন করে নিজের স্থান করে নেয়। আসলে চৈতন্যদেবই বাংলা তথা সারা ভারতের নৃত্যকলাকে ভোগসর্বস্ব সস্তা চটুলতা থেকে 'ভক্তিরসাশ্রিত' নৃত্যে উন্নীত করেন। নৃত্যকলায় চৈতন্যদেবের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু তাও মূলত বৈদেশিক বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভ পর্যন্তই। অর্থাৎ বঙ্গ দেশের যে গৌরবময় নৃত্য ঐতিহ্য ছিল তার প্রায় শেষ দশা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। এই দীর্ঘ সময়ের বিভিন্ন প্রকার নৃত্যের বর্ণনা আমরা সাহিত্যে পাচ্ছি। এরপরই নৃত্যকলার অন্ধকারময় যুগ শুরু হয়। মঙ্গলকাব্যে নৃত্যের নায়িকার বেশভূষা অর্থাৎ আহার্য অভিনয়ের বর্ণনা পাই। পূর্বে উল্লিখিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রত্নমালার নৃত্যের বেশভূষার বর্ণনা রয়েছে। পায়ে নূপুর, কবরী অর্থাৎ খোঁপা, খোঁপায় মালতী, মল্লিকা, চাঁপা, গাঁদা ফুল। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা চারিদিকে চন্দনবিন্দু, পট্টবস্ত্র অর্থাৎ সিল্কের শাড়ী, সোনার চুড়ি ও শাঁখা, নানারকম পাথর খচিত অলঙ্কার, কানে সোনার অলঙ্কার, রতন-পাশলি ইত্যাদি।

নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলে বেহুলার সাজসজ্জার বর্ণনা পাই—

"নির্ত্ত করিতে সিবের আহে চলহ সত্বরে।।
তাহা সুনি বিপুলা লাগে বুলিবারে।
নির্ত্তের সর্জ্য সঙ্গে নাহিক আমার।।
এত সুনি বোলে নেতা ধনার গোচর।
ভান্ডার হইতে নির্ত্ত-সর্জ্য বাহির কর।।
ধনা আনি দিল সর্জ্য বেউলার গোচর।
হেনকালে বিপুলা লাগি বুলিবার
বিনা মৃদঙ্গ ধনি নির্ত্ত নাহি চলে।

....

কালভূত করিয়া দর্পণে এড়িল পুতিয়া।
অলঙ্কার পরে বেউলা তাহার দিকে চাইয়া।।
বেহারিয়া ছন্দে পরে সোনার চাকীরালি।
দস আঙ্গুলে পরে মাণিক্য অঙ্গুলি।।
প্রভায় পরে বেউলা সতেস্বরি হার।
বাহুতে পরে বেউলা সোনার চারি তাড়।।
আভের কাকৈদিয়া পাইট-কৈল সিথি।
নাসিকা দুয়ারে দিল রক্ত গজমতি।।
সুরঙ্গ সুরুমা দুই পরিল নএগ্রানে।
মুনির মোন মোহ জায় কটাক্ষ চাহনে।।
ইজার পরিয়া ধরা কমরে কাছিল।
পঞ্চবর্ণে কাছলি গোটা তাহার ওপর দিল।।
রুনুঝুনু বাদ্য করে নূপুর চরণে।
সংসার মহিত করে বেউলার সাজনে।।
আভর কাকৈ দিয়া আগুলাইল চুল।
ভাল খোপা বান্দে দিয়া পারিজাত ফুল।[১]

কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার নৃত্যসজ্জার বর্ণনাটি খুবই সুন্দর। অর্থাৎ ১৩শ শতাব্দীতে নারায়ণদেব, সপ্তদশ শতাব্দীতে জগজ্জীবন সকলেই বেহুলার নৃত্যকালীন বেশভূষার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন—

"বেনানীর কাছে তবে বিদ্যাধরী যায়।
কথায় কথায় তবে পরিচয় পায়।।
গলাগলি করি কান্দে যত বিদ্যাধরী।
বালী বোলে আন সখী নাচের পেটারী।।
পেটারী আনিয়া বালী ঘুচাইল ঢাকুনি।

হস্তেতে ধরিল বালী করে নানা বেশ।
নাচিবে দেবের আগে শিবের আদেশ।

১। পদ্মাপুরাণ, নারায়ণদেব, তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৪২, পৃঃ ১২২।

চাকি কোড়ি মকর কুন্তল কর্ণমূলে।
নাসিকায় বেসরফুল করে ঝলমলে।।
হিয়ায় কাচুলি পহ্রে কি কহিব আর।
গলায় প্রবাল মালা ঝিলিমিলি হার।।
চাকিবোলি মকর কুন্ডল শ্রুতিমূলে।
নাসিকায় বেসর মুকুতা-ফুল দোলে।।
কণক কঙ্কণ হার বাহুতে কেজুর।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পহ্রে চরণে নূপুর।।
গুজরাটি ঘুঙ্গুর করিল পরিধান।
উপরে উড়ানি দিল দুর্ল্লভ বসন।।
মেঘ ডম্বুর শাড়ী তবে পরে বানিয়ানী।
উপর অঙ্গেতে দিল কুসুম উড়ানি।।
শিবের সাক্ষাতে যাঞা নমস্কার করে।
গোসাঞির আদেশ হল নৃত্য করিবারে।।
গীত গায় বিদ্যাধরী মৃদঙ্গ বাজায়।
বিহুলা সুন্দরী নাচে শিবের সভায়।।

দ্বিজরাম দাস রচিত 'অভয়মঙ্গল কাব্য'-এ নৃত্যের বর্ণনা পাই তাতেও বেশভূষা অলঙ্কার অর্থাৎ আহার্য অভিনয়ের বর্ণনা আছে।

ভালি ভালি নাচে গৌররাএ
কনক নূপুর পা এ ৬ বেশ বনাইছে মাএ
ডগমগ কে গোরার গা এ
কপালে কনকচূড়া মাণিক্য মালতী বেড়া
ঝলমল করে গোরার গাএ।

মঙ্গলকাব্যের বিভাগ ঃ

সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতকেই মঙ্গল কাব্যের পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল এবং এতে ব্যাপক নৃত্য-গীতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে মঙ্গল নামে তিন শ্রেণীর কাব্য পাওয়া যায়—

১। **লৌকিক**—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, শীতলামঙ্গল, বাসুলিমঙ্গল, রায়মঙ্গল ইত্যাদি।

২। **বৈষ্ণব**—চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, জগৎমঙ্গল, গোকুলমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল ইত্যাদি।

৩। **পৌরাণিক**—সূর্যমঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, শিবমঙ্গল, বা শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল ইত্যাদি।[১]

বাংলাদেশে মনসামঙ্গলের এবং পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডী ও ধর্মমঙ্গলের ব্যাপক প্রচার ছিল। বঙ্গদেশের সব জায়গায় মনসামঙ্গলের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেলেও উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গেই (বাংলাদেশ)-এর ব্যাপক প্রচার ছিল। এই মঙ্গলকাব্যগুলি চামর ও মন্দিরা সহযোগে পরিবেশিত হত তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং এখনও উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে বিষহরি পালা, পদ্মাপুরাণ পালাতে নৃত্যে মূলের হাতে থাকে চামর। বিষহরি পালা বেহুলা ও লখীন্দরের করুণ কাহিনীর ওপর আধারিত। গানের সুর খুব টানাটানা ঢিমা গতি অর্থাৎ ধীর লয়ে এবং তালও বেশ কঠিন—একতাল, তেওটা, দোঠুকি, তেওড়া এবং লাস্যযুক্ত নৃত্য ইত্যাদি। চামর হাতে নৃত্য চলে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি সম্পর্কে কবি রূপরাম যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও চামরের উল্লেখ পাই—

চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে
আমি খুঁজি বুলি।।[১]

অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে তৎকালীন বঙ্গসমাজে নৃত্যগীত চর্চা ও পরিবেশনার সুন্দর ব্যাখ্যা পাই এবং স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাংলায় ব্যাপকভাবে শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুশীলন, প্রচার ও প্রসার ছিল। যা পরবর্তীকালেও একেবারে শুকিয়ে যায়নি। যদি বাংলার সমৃদ্ধশালী গ্রামীণ গুরু পরম্পরা নৃত্যগুলি অনুধাবন করি তাহলে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা শাস্ত্রীয় আঙ্গিক উপকরণগুলি অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এ সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে—মনসামঙ্গলের নায়িকা বেহুলা শাপভ্রষ্ট স্বর্গনর্তকী বাণরাজার কন্যা উষা, যার সঙ্গে দ্বারকা অধিপতি কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধর বিবাহ হয়েছিল—গল্পটি সবারই জানা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল উত্তরবঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের কাছে বাণগড়ে শিবভক্ত বাণরাজার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। অর্থাৎ স্বর্গনর্তকী বলে চিহ্নিত উষা যে উত্তরবঙ্গেরই কন্যা লাস্য-নৃত্যে পটু এটি পুরাণ, ইতিহাস এবং সাহিত্য থেকে সহজেই

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কাজী দীন মুহম্মদ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৭৫ (বাংলা), পৃ: ৪ ও পৃ: ৬।

বোঝা যায়। পূর্বেই উল্লিখিত যে উত্তরবঙ্গের বিষহরি-মনসাকীর্তন লাস্যাঙ্গ নাট্য প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন। উত্তরবঙ্গ যে নাট্যশাস্ত্রানুসারী লাস্যাঙ্গ নৃত্যের জন্য প্রসিদ্ধ সেটি রাজতরঙ্গিনীর নর্তকী কমলার নৃত্যের বর্ণনা থেকে জানা যায় এবং এই লাস্যাঙ্গ নৃত্য কমলা দ্বারাই সুদুর কাশ্মীরে পৌঁছে যায় তা পরিস্ফুট। অভিনয় দর্পণ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় বাণরাজার কন্যা 'উষা' পার্বতীর কাছ থেকে লাস্য নৃত্য শিখে দ্বারকাবাসীদের শিখিয়েছিলেন এবং তাঁদের দ্বারা লাস্য নৃত্য ভারতে ছড়িয়ে পড়ে—বাংলার মেয়ে উষাকেঅনিরুদ্ধ বিয়ে করে দ্বারকা নিয়ে যান, অর্থাৎ বাংলা যে লাস্য নৃত্যের প্রাণ কেন্দ্র বিভিন্ন উদাহরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়।

'পার্ব্বতী ত্বনুশাস্তি স্ম লাস্যং বাণাত্মজামুষাম্।।৫।।
তয়া দ্বারবতী গোপ্যস্তাভিঃ সৌরাষ্ট্রযোষিতঃ।
তাভিস্তু শিক্ষিতা নার্যো নানাজনপদাস্পদাঃ।।৬।।'[১]

নাট্যশাস্ত্র অনুসারেও আমরা জানি গৌড়বঙ্গে লাবণ্যমণ্ডিত কৈশিকী বৃত্তির নৃত্য প্রচলিত ছিল। তথ্যগুলি থেকে এটি সহজেই বোঝা যায় যে গৌড়বঙ্গ থেকেই নাট্যশাস্ত্রানুসারী লাস্যনৃত্য সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

বৈষ্ণব সাহিত্য— চৈতন্যদেব ও চৈতন্যোত্তর যুগ ঃ

পঞ্চদশ শতকে (১৪৮৬ খ্রী. ১৮ই ফেব্রুয়ারী) চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে সংগীত জগতে সৃষ্ট হয় এক বিরাট আলোড়ন। শ্রীচৈতন্যের সময়কালীন এবং পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে নৃত্য ও গীতের সার্থক উপস্থিতি তারই এক সাক্ষাৎ প্রমাণ।

চৈতন্যদেব নিজে স্বয়ং নাচতেন তার প্রচুর উল্লেখ পাই:—স্বয়ং চৈতন্যদেব 'রুক্মিনীহরণ' পালায় রুক্মিনীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করেছিলেন।[২] হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গলে' চৈতন্যদেবের নৃত্যের কথা পাই। সেখানে উল্লেখ আছে শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্য রাধারূপে, অদ্বৈত কৃষ্ণরূপে এবং নিত্যানন্দ বড়ায়ি বুড়ি রূপে দানলীলাযুক্ত নৌকাবিলাসে নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য চৈতন্য জীবনী থেকে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য ও অন্য দুই প্রভু দানলীলার নৃত্যাভিনয় করেছিলেন, কিন্তু সে শান্তিপুরে নয়, নবদ্বীপে, চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে, ভাবাবেশে চৈতন্যদেব সে অভিনয় শেষ করতে পারেন নি।[৩] সে সময় নৃত্যগীতের খুবই প্রচলন ছিল। চৈতন্য ভাগবতে রামায়নের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা আছে। স্বয়ং

১। অভিনয়দর্পণ, অশোকনাথ শাস্ত্রী, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯১, পৃঃ ৩-৪।
২ ও ৩। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার (১ম খন্ড), মুক্তধারা, ১৯৮৬, পৃ: ৪৩, পৃ: ৮১।

চৈতন্যদেবও কৃষ্ণলীলায় অভিনয় করতেন। লাঠি নৃত্যে বা লগুড় নৃত্যে চৈতন্যদেব দক্ষ ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে এর উল্লেখ পাই। যথা—শংখ, ঘন্টা, ডম্ফ, মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডম্বরু, বিষাণ।[১]

কীর্তন ঃ

সেই সময় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গান ও তার সঙ্গে নৃত্য। প্রধান গায়ক (মূল গায়েন) একহাতে চামর ও অন্য হাতে মন্দিরা এবং পায়ে নূপুর পরে নাচের সঙ্গে সঙ্গে গাইতেন. সঙ্গে মৃদঙ্গবাদক তাল দিত। দুজন দোঁহার ধুয়া ধরত।[২] সনাতন গোস্বামীর বর্ণনায় চৈতন্যদেবের নৃত্যরূপের বর্ণনা পাই—

"কীর্ত্তয়ন্তং মুহুঃ কৃষ্ণং জপ ধ্যানরতং ক্বচিৎ।
নৃত্যন্তং ক্বাপি গায়ন্তং ক্বাপি হাসপরং ক্বচিৎ।[৩]

'কৃ' ধাতু থেকে 'কীর্তন' কথাটি এসেছে। 'কীর্তন' শব্দটির অভিধানিক অর্থ হল 'প্রশংসা'। দেবদেবীর লীলাগুণ গানকে কীর্তন বলা হলেও, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক বর্ণনা ও শ্রী মন্মথ প্রভুর বর্ণনামূলক পদাবলী এক বিশেষ সুরে ও তালে আখর যোজনা পূর্বক গাইবার রীতিকে 'কীর্তন' গান বলা হয়[৪] সুরে, তালে করতাল এবং মৃদঙ্গ সহযোগে ভগবানের নাম অর্থাৎ কীর্তি-গান আবৃত্তি অর্থে 'কীর্তন' শব্দের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে চৈতন্যদেবের সময় থেকে। তবে শব্দটির উল্লেখ পাই ভাগবতে—'স্মরণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ।[৫] 'কীর্তন' কথাটির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন সম্ভবত পূর্ব ভারতে অষ্টম শতকের মূর্তির তলায় লেখা 'শংকর কীর্তন'।[৬] কীর্তন গান বাঙ্গালীর অমূল্য সম্পদ। এই গান বাংলার ঘরে ঘরে চিরকালই সমাদৃত হয়ে এসেছে। মধ্যযুগে বাদশাহ আকবরের শ্রেষ্ঠ দরবার গায়ক তানসেন (শোনা যায় পূর্বে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন) যে সময় তাঁর অপূর্ব সংগীত সৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এক নবজীবনের সূচনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় বৈষ্ণব পদকর্তারা একের পর এক তাঁদের অভিনব সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার সংগীত ভান্ডারকে সমৃদ্ধ

১। বাংলা দেশের ইতিহাস (২য় খন্ড), মধ্যযুগ, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, জেনারেল, ১৩৮০ (বাংলা), পৃঃ ৩০৯।
২। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার (১ম খন্ড), মুক্তধারা, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৩, পৃঃ ৮১।
৩। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, সত্যবতী গিরি, রত্নাবলী, ১৯৮৮, পৃঃ ১৭৫।
৪। শ্রেষ্ঠকীর্তন স্বরলিপি, সম্পাদনা অধ্যাপক বুদ্ধদেব রায়, নাথ ব্রাদার্স, মুখবন্ধ।
৫। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, সুকুমার সেন, রূপা, ১৯৭০, পৃঃ ১৩১-১৩২।
৬। East India Art style : A Study in Parallel Trends, B.N. Mukherjee, K.P. Bagchi & Co. fig. 63.

করতে শুরু করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত কীর্তন সংগীতের অমৃতধারা বাংলার কাব্য ও সংগীতের প্রবহমান ধারার ওপর তার প্রভাব অব্যাহত রেখেছে। এই কথায় বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই।[১]

গৃহাশ্রমেও শ্রীচৈতন্য কীর্তন করতেন। চৈতন্যদেব যে সংকীর্তন করতেন তাকে বলা যায় 'নৃত্য-সংকীর্তন'। বাংলার ঘরে ঘরে কীর্তনের যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়েছিল আজও তার জনপ্রিয়তা মন্দিরগুলিতে, বৈষ্ণব আখড়ায়, কীর্তনের আসরে দেখা যায়। কীর্তন, বিশেষত: পদাবলী কীর্তনের মহাজন পদগুলি কথোপকথনের সঙ্গে উচ্চন্ড ও মধুর নৃত্য সহযোগে দুইভাবেই পরিবেশিত হয়। কীর্তন সংগীতে থাকে নবরস, নায়ক-নায়িকা ভেদ, পালা ইত্যাদির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় ও কথোপকথন সহযোগে পরিবেশিত লাবণ্যমন্ডিত নৃত্য।

যদি দু'হাজার বছর পিছিয়ে ফিরে যাই নাট্যশাস্ত্রের যুগে (খৃ. পূঃ ২০০-২০০ খৃ.) দেখা যাবে বাংলায় নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসারে ধ্রুপদী নৃত্যের চর্চা হত—''অঙ্গ বঙ্গ উৎ-কলিঙ্গ বৎসাশ্চৈবৌড্রমাগধা:'' অর্থাৎ বাংলায় ঔড্র-মাগধী নৃত্য ধারা প্রবর্তিত ছিল এবং ঐ নৃত্যের বৃত্তি ছিল ভারতী ও কৈশিকী। ভারতী অর্থাৎ কথোপকথনের সঙ্গে উচ্চন্ড এবং কৈশিকী অর্থাৎ লাবণ্যমন্ডিত নৃত্য।[২] নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতির মতো এখনও কথোপকথন সহ উচ্চন্ড ও মধুর নৃত্য সহযোগে কীর্তন পরিবেশিত হয়। অষ্টম শতকে কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণীতে এরকম স্পষ্ট নজির আছে— নাট্যশাস্ত্রপদ্ধতি অনুসারে বাংলার মন্দিরে দেবদাসীরা নাচত। দেবমন্দিরে দেবতার যশোমহিমা অর্থাৎ কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করতেন। যা আজও দেখা যায় বৈষ্ণব মন্দির ও আখড়াগুলিতে—কীর্তনের সঙ্গে খোল করতালসহ সেবাদাসীরা নাট্য পরিবেশন করে থাকেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর কাল থেকে এই কীর্তন নব কলেবর ধারণ করে। নাট্যশাস্ত্রের কালে এই কথোপকথন সংস্কৃতে হত, আজকাল বাংলায় হয়। মহাপ্রভু সংকীর্তনে নাচতেন এবং কোনও কোনও সময়ে 'ধুয়াপদ' গাইতেন। নাচের প্রকার ছিল দু'রকম— উচ্চন্ড ও মধুর। 'ধুয়াগান' গাইতেন—মূল গায়েন হিসেবে নয়— পালিগায়েন বা দোহার হিসেবে মধুর নৃত্যের সঙ্গে।

নাট্যশাস্ত্রে যে বৃন্দগানের উল্লেখ আছে, সাংগঠনিক বিশ্লেষণে কীর্তনের দলও ঠিক তাই। বৃন্দগানে মুখ্যগায়ন, সমগায়ন, মার্দ্দঙ্গিক ইত্যাদি যে ভাষা প্রয়োগ দেখি

১। শ্রেষ্ঠকীর্তন স্বরলিপি, সম্পাদনা অধ্যাপক বুদ্ধদেব রায়, নাথ ব্রাদার্স, মুখবন্ধ।

২। ভরত নাট্যশাস্ত্র, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২, চতুর্দশ অধ্যায়।

ঠিক তার বাংলা পরিভাষা মূলগায়েন, দোহার এবং বায়ান কীর্তনে প্রচলিত। অধমবৃন্দে একজন মুখ্য গায়ন, চারজন সমগায়ন এবং দুজন মার্দ্দঙ্গিক থাকে। কীর্তনে সাধারণ দলও ঠিক তাই। আকারগত বিশ্লেষণে বৃন্দগানের ধারাই কীর্তনে বিদ্যমান। এলা প্রবন্ধের যে রূপটির উল্লেখ শার্ঙ্গদেব করেছেন তার সঙ্গে কীর্তনের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'সঙ্গীত রত্নাকরে' সঙ্গীতের স্বরূপ ভিত্তিক ভারতভূমিকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে গৌড় অর্থাৎ বাংলাদেশ তথা ভারতের পূর্বাংশে প্রচলিত এলাকে গৌড়েলা বলা হয়েছে।[১]

চৈতন্যদেবের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'নৃত্যসংকীর্তন' হয়েছিল সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে—দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে রথযাত্রায়। বঙ্গদেশ থেকে ভক্তরা মিলিত হয়ে এই 'মহানৃত্যসংকীর্তন' করেছিলেন। মুখ্য অর্থাৎ চৈতন্যদেবের নিজস্ব চার সম্প্রদায় আর বঙ্গদেশের স্থানীয় তিন সম্প্রদায় এই সাত সম্প্রদায়ের কীর্তনে চৌদ্দ-মৃদঙ্গ আর ছাপান্ন জোড়া করতাল বেজেছিল। মুখ্য সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিতে নির্দিষ্ট ছিল একজন প্রধান গায়েন, পাঁচজন পালিগায়েন (অর্থাৎ দোহার), একজন নর্তক, দুজন মার্দঙ্গিক। চারদল প্রধান গায়েন ছিলেন স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ। নর্তক ছিলেন যথাক্রমে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস ও বক্রেশ্বর। বঙ্গদেশের তিন সম্প্রদায় ছিলেন কুলীন গ্রামের—শান্তিপুরের ও শ্রীখন্ডের। এখানে নেচেছিলেন যথাক্রমে সত্যরাজ, রামানন্দ, অচ্যুতানন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন। সাত সম্প্রদায়ের এই কীর্তন ও মহাপ্রভুর 'উচ্চন্ড নৃত্য' লোকের মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগিয়েছিল। শেষে তিনি 'মধুর নৃত্য' করেছিলেন স্বরূপের গাওয়া এই ধুয়া গান ধরে—

"সেই তো পরাণনাথ পাইনু
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।।"[২]

রথাগ্রে প্রযোজ্য চৈতন্যদেবের এই কীর্তন 'পরিমুন্ডা কীর্তন ও নৃত্য' হিসেবে বিখ্যাত। এই নৃত্য রূপ গোস্বামী প্রমুখ সকল বৈষ্ণব কবি উল্লেখ করে গেছেন। এই নৃত্যের প্রারম্ভে মহাপ্রভু কীর্তনায়াগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে, এক এক সম্প্রদায়ের এক একজন মহাজনকে নৃত্য করতে আদেশ দিয়েছিলেন—

"নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে।

১। তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, ফার্মা কে. এল. এম. প্রা. লি. ১৯৮৬, পৃ: ১১৮-১২৩।
২। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, সুকুমার সেন, রূপা, ১৯৭০, পৃ: ১৩১-১৩২।

প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান
আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান।
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ
রাঘব পন্ডিত আর গোবিন্দানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল।
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান শুভানন্দ
শ্রীরাম পন্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ।
বাসুদেব রঘুনাথ মুরারি যাঁহা গায়
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুইজন
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্তন।
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়।
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর
নৃত্য করে তাঁহা পন্ডিত বক্রেশ্বর।
কুলীন গ্রামের এক কীর্তনীয়া সমাজ
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ, সত্যরাজ।
সত্যরাজ আচার্যের এক সম্প্রদায়
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়।
খন্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।"

অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন করে মহাজন নৃত্য করেছিলেন। জগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণ করে শ্রীচৈতন্য অনেকবার সংকীর্তন করেছিলেন। তা 'বেড়া কীর্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এক প্রভাতী বেড়া কীর্তনে শ্রীচৈতন্য সাত সম্প্রদায় নিয়ে নৃত্যসংকীর্তন করেছিলেন। 'উচ্চন্ড' নৃত্যের শেষে তিনি নিজেই এই চমৎকার উড়িয়া পদটি গেয়ে মধুর নৃত্য করেছিলেন—

"জগমোহন পরিমুন্ডা যাই
মনমাতিলা রে চকা চন্দ্রকু গাঞি।"[১]

১। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, সুকুমার সেন, রূপা, ১৯৭০, পৃ: ১৩১-১৩২।

অদ্বৈত ছাড়া আরও দুজন পদাবলী গানে দক্ষ ছিলেন—মুকুন্দ ও স্বরূপ। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবকে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জয়দেবের পদাবলী শুনিয়ে তাঁর 'কৃষ্ণবিরহ' দাহে শান্তির প্রলেপ দিতেন। বৈষ্ণব সমাজে এইভাবেই বৈঠকী পদাবলী কীর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল। কীর্তনে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যযন্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। সারা ভারতেই পদাবলী কীর্তন সংগীতের প্রচলন ও প্রসার ঘটে। বিশেষত—দক্ষিণভারত, আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা ইত্যাদি অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে।

দ্বাদশ শতকের পন্ডিত গোবর্ধন আচার্য রচিত 'আর্যা সপ্তশতী'তে নৃত্যগীতের সঙ্গে হস্ত তালের দ্বারা সংগত করা হত—'কৃতহসিত হস্ততালং'।[১] এই তালির মাধ্যমে তালের প্রকৃতি বোঝাবার রীতি সুপ্রাচীন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজেও কীর্তনবিধি প্রচার নিমিত্তে 'দিশা দেখান প্রভু হাতে তালি দিয়া'—চৈতন্য ভাগবত উক্ত আছে।

বৈষ্ণবসাহিত্য মোটামুটি তিন জাতীয় ঃ জীবনী কাব্য, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও পদাবলী। বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহ সংগীতের অর্থাৎ গীত-বাদ্য-নৃত্যের তথ্যে শাস্ত্রে সম্পূর্ণ। বিশেষত বৈষ্ণবরসশাস্ত্র, নায়ক-নায়িকা ভেদ, কাব্য-নাট্য ইত্যাদি তথ্যসকল অত্যন্ত বিস্তৃত ও সমৃদ্ধশালী।

বৈঠকী কীর্তনকে সংকীর্তনের আসরে উন্নীত করেছিলেন চৈতন্য অনুগামী নরোত্তম দাস। তিনি মহোৎসব করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশকে। এই মহোৎসবটি খেত্‌রী মহোৎসব নামে প্রসিদ্ধ। এই উৎসবে প্রথম পদাবলী গানের রীতি ও মৃদঙ্গের তাল পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই খেত্‌রী মহোৎসব কীর্তন গানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর কৃতিত্ব দুজনের প্রাপ্য—নরোত্তম দাস ও দেবী দাস। নরোত্তম দাস গানের পদ্ধতি দেখিয়েছিলেন, দেবীদাস মৃদঙ্গ বোলের।

বৈষ্ণবপদাবলী গ্রন্থগুলি নৃত্য সম্বন্ধীয় বর্ণনায় উজ্জ্বল। যেমন, 'পদকল্পতরু'র একটি পদ গোষ্ঠলীলার—

"নাচরে নাচরে মোর দামোদর।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর।।
আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার।
গলায় গাঁথিয়া দিব মণিময় হার।"[২]

১। আর্যা সপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, সান্ন্যাল এন্ড কোং, ১৩৭৮, পৃ: ৯৪-৯৫।

২। মণিপুরী নর্তনের গীতমালিকা, সংগ্রহ ও রচনা—গুরু বিপিন সিং, মণিপুরী নর্তনালয়, ১৯৯৩, পৃ: ৮।

চামর ব্যঞ্জন সহ নৃত্যের একটি বর্ণনা—

"চারিদিকে সুচাতরী ধরল চামর রে।
দোলাইয়া রাধার অঙ্গে সেবন করে।।
নানা ছন্দবদ্ধ নাচে চামর লইয়া।
তারা মাঝে চাঁদ যৈছে রাধারে ঘিরিয়া।।"[১]

— মণিপুরী নৃত্যে গানটি হয়ে থাকে।

অষ্টাদশ শতকে নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকরে বলরাম নর্তনের বর্ণনা পাই—

"নৃত্যতি বলদেব বিপুল পুলকিত প্রতি অঙ্গ
দাঁ দাঁ দৃমি দৃমি দৃমি কট, ধা দৃগু দৃগু ধা ধিথুক্কট
তক তক ধিকি তক থোতি কুকু বাজত মৃদু মৃদঙ্গ।

আর একটি পদাবলীর মধ্যে সমভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, আভঙ্গ, তাল, নৃত্ত, নাট্য রাগরাগিনীর সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"মন্ডলী রচিয়া সবে কর সমভঙ্গ।
মন্ডলীর মধ্যে আমি হইব ত্রিভঙ্গ।।
ললিতা বিশাখাদি শুন রাধারাণী।
নানাভেদে গতিভঙ্গী আরম্ভ এখনি।।
হস্তকটি গ্রীবা শির করহ চালন।
যেদিকেতে হস্তদ্বয় সেদিকে নয়ন।।
চঞ্চৎপুট তালে কর পদ সঞ্চরণ।।
কাল-অঙ্গ-জাতি আদি তালের প্রকরণ।।
নৃত্য-নৃত্ত-নাট্য ইহা নটনের প্রকার
চারী-করণ-পিন্ডীবদ্ধ স্থান-অঙ্গহার।।
ছালিক্য দন্ডরাস হল্লীসক নটন।
লাস্য তান্ডব ভঙ্গাবলী বন্ধাদি বলন।।
গাও সবে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী।
সপ্তস্বর তিন গ্রাম সারে গামা পাধা নি।।
স্বরমালা তান গমক আলাপ মূর্চ্ছনা।

১। মণিপুরী নর্তনের গীতমালিকা, সংগ্রহ ও রচনা—গুরু বিপিন সিং, মণিপুরী নর্তনালয়, ১৯৯৩।

মুরজ মন্দিরাদি বাজাও শঙ্খবীণা।।
অষ্টসখী তোরা সবে হও যন্ত্রধারী।
মন্ডলীর মাঝে আমি হইব রাসধারী।।
অঙ্গহার করি রাই করত আভঙ্গ।
গতিভঙ্গী করি চন্দ্রা হইবে বিভঙ্গ।।[১]

হিন্দু পদকর্তা ছাড়াও বহু মুসলমান পদকর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। বাঙ্গালি মুসলমান কবিদের অনেকেই সুফীভাব পুষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর সমগ্র বাংলা সাহিত্যে পদাবলী রচনার একটা অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য জাগে। মুসলমান কবিরাও খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতক থেকে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক নানাপদ রচনা করেন তাতেও নাচের রসভেদের নায়িকাভেদের বর্ণনা পাই। 'গৌরপদ তরঙ্গিণীতে' আকবর সাহার একটি ভণিতা যুক্ত পদ পাওয়া গেছে। সেখানে সংকীর্তন নৃত্যের বর্ণনা আছে—

"জিউ জিউ মন চোর গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা।।
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া।।
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোলিয়া।।
ঐছন পহুকে যাহু বলিহারি।
সাহা আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী।।

চৈতন্যদেবের সংকীর্তন নৃত্যরূপ দেখে পদকর্তা আকবর সাহা কতখানি বিমল আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য এই পদটি বহন করছে।[২]

অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এইটিই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশে নৃত্যশাস্ত্রের ব্যাপক ও গভীর অনুশীলন ছিল। ফলে সেই নৃত্যের বর্ণনা সাহিত্যে জীবন্তভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং এই নৃত্য ছিল শাস্ত্রানুসারী। এই কারণেই বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের দুটো দিক—মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য—এই দুটো দিকই নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আলোচনায় ও তথ্যে সমৃদ্ধ।

১। মণিপুরী নর্তনের গীতমালিকা, ...পৃঃ ১২১।
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খন্ড), কাজী দীন মুহম্মদ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৭৫, পৃঃ ৯৬।

নৃত্যশাস্ত্র

ভূমিকা ঃ

গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রীয় আলোচনা করতে গিয়ে Curt Sachs-এর নৃত্য সম্বন্ধে উক্তিটি মনে পড়ছে—"Dance is the mother of the arts. Music and poetry exist in time : Painting and architecture in space. But the dance lives at once in time and space." (Mr. Curt Sachs in his "World History of Dance"), এই ঐতিহ্যবাহী গৌড়ীয় নৃত্য বিষয়ে যুগ যুগ ধরে নৃত্যশিল্পী-শাস্ত্রকারেরা চিন্তা করেছেন, time and space ব্যবহার করে তার রূপ দিয়েছেন এবং শাস্ত্রও রচনা করে গেছেন। যেহেতু এই বাংলা সুবিশাল ভারতবর্ষেরই একটি অঙ্গরাজ্য তাই শিল্প-সংস্কৃতি অর্থাৎ ভারতবর্ষের শিল্পধারার মূল স্রোতের সঙ্গে সে একাত্মভাবে চলমান তার স্বকীয় আঞ্চলিক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে।

বাংলার ভৌগোলিক রূপটি হল উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে রুক্ষ শৈলময় মালভূমি, পূর্বে পার্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণ বঙ্গ জুড়ে ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় জঙ্গল সুন্দরবন ও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ এবং মধ্যভাগে পুরো বাংলা জুড়ে বিস্তৃত বাতাসের ঢেউ খেলানো সবুজ ধানক্ষেত পূর্ণ সমভূমি ও সারাদেশ জুড়ে মেখলার মত জড়িয়ে নদী। তাই নৃত্য, গীত ও বাদ্য সমস্ত কিছুর মধ্যেই ছড়িয়ে আছে গাম্ভীর্য-দৃঢ়তা-গভীরতা ও তার সঙ্গে লালিত্য-কমনীয়তা-আন্দোলিত হিল্লোল এবং চক্রাকৃতি আবর্তন (Circular movement) অর্থাৎ গৌড়ীয় নৃত্য ভঙ্গিমা একদিকে বলিষ্ঠ দৃপ্তময় অন্যদিকে লাবণ্যমন্ডিত সুষমাময় আবর্তনের সংমিশ্রণে এক মাধুর্যপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রামাণ্য গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রে (রচনাকাল খৃ. পূ. ৩০০-২০০ খৃ.) গৌড়বঙ্গে নৃত্যের উল্লেখ পাই এবং এখানে কিভাবে নৃত্য করা হত অর্থাৎ বৃত্তি (Style) বেশভূষার বর্ণনা পাই। নাট্যশাস্ত্রে চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত ঔড্রমাগধী নৃত্য এই গৌড়বঙ্গে প্রচলিত ছিল। এটি ভারতী কৈশিকী বৃত্তি আশ্রিত করে পরিবেশিত হত। ভারতী বৃত্তি নাট্যশাস্ত্র অনুসারে বাক্যপ্রধান দৃঢ় পাঠযুক্ত অভিনয়প্রধান ধারা। কৈশিকী বৃত্তি শৃঙ্গাররসযুক্ত লাস্যপ্রধান স্ত্রীলোক দ্বারা পরিবেশিত নৃত্যধারা অর্থাৎ ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত নৃত্যপদ্ধতি প্রাচীন কাল থেকেই গৌড়বঙ্গে

চলে আসছে কোমল এবং দৃঢ় ভঙ্গিমা যুক্ত নৃত্য। নাট্যশাস্ত্রে গৌড়দেশের রমণীদের আহার্য অভিনয়েরও সুন্দর বর্ণনা আছে।

নাট্যশাস্ত্রের কাল শেষ হল এল, মতঙ্গের বৃহদ্দেশীর (রচনাকাল আনুঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক) সময়। নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তী শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ মতঙ্গমুনি প্রণীত বৃহদ্দেশী গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার গৌড় রাগের উল্লেখ আছে। যথা—গৌড় পঞ্চমা, গৌড় কৈশিকী, গৌড়-কৈশিক মধ্যমা। রাগগুলি গেয় গীতের সঙ্গে কিভাবে নৃত্যাভিনয় ও নাট্যাভিনয় হত তার বর্ণনা আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে গৌড়বঙ্গে অভিনয় সহযোগে প্রবন্ধগীতের সঙ্গে সুন্দর নৃত্যাভিনয়ের বর্ণনা আছে। এছাড়া আরও অন্যান্য গ্রন্থেও সুন্দর বর্ণনা আছে যা সাহিত্য আলোচনার সময় করেছি।

সর্বভারতীয় সমাদৃত নৃত্যশাস্ত্রগ্রন্থ—নাট্যশাস্ত্র, বৃহদ্দেশী, সংগীত রত্নাকর (ত্রয়োদশ শতক) ছাড়া বাংলার শাস্ত্রকারদের বিশেষত বৈষ্ণব শাস্ত্রকারদের দ্বারা রচিত প্রচুর সংগীত বিষয়ক বিশেষত নৃত্য শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই গৌড়ীয় নৃত্যধারার নর্তন তিন প্রকার—নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য।

'নর্তনং ত্রিবিধং নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ক্রমাৎ।'

নৃত্ত—গাত্রবিক্ষেপমাত্রন্ত সর্বাভিনয়বর্জিতম্।
আঙ্গিকোক্ত প্রকারেণ নৃত্তং নৃত্যবিদো বিদুঃ।। স. সা. স.

—অঙ্গাভিনয়ে কথিত প্রকারানুসারে সর্বপ্রকার অভিনয় রহিত কেবল গাত্র বিক্ষেপকে নৃত্যবিদ্‌গণ 'নৃত্ত' বলে থাকেন।

নৃত্য—দেশরীত্যা প্রতীতো যস্তাল মানলয়াশ্রিতঃ।
সবিলাসাঙ্গ বিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।। স. সা. স.

—দেশ প্রচলিত রীতি অনুসারে তাল-মান অনুসারে সবিলাস (অর্থাৎ ভাবাশ্রিত) অঙ্গবিক্ষেপ, পণ্ডিতগণ তাকে নৃত্য বলেন।

নাট্য—যোহয়ং স্বভাবো লোকস্য নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।
সোহঙ্গভিনয় নৈর্যুক্তো নাট্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।। স. সা. স.

—নানা অবস্থাভেদে আঙ্গিক অনুকরণ করে বাক্যার্থাভিনয়াত্মক ব্যঞ্জনাকে নাট্য বলে পণ্ডিতগণ অভিহিত করে থাকেন।

গৌড়ীয় নৃত্য দুই ভাগে বিভক্ত—তান্ডব এবং লাস্য। পুংনৃত্য তান্ডব প্রকৃতির ও স্ত্রীনৃত্য লাস্য প্রকৃতির।

"তান্ডবঞ্চ তথা লাস্যং দ্বিবিধং নৃত্য মুচ্যতে।
পুংনৃত্য তান্ডবং নাম স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে।। স. দা.

তান্ডব দুই প্রকার—প্রেরণী ও বহুরূপ।

প্রেরণী—যে তান্ডব নৃত্যে অঙ্গ বিক্ষেপের আধিক্য, তদ্রূপ অভিনয় বর্জিত তান্ডবের নাম 'প্রেরণী'।

বহুরূপ—যে তান্ডব নৃত্য ছেদন, ভেদন, নানাপ্রকার মুখভঙ্গি যুক্ত ও বাণীগত উদ্ধত তা 'বহুরূপ' তান্ডব।

লাস্য—লাস্যনৃত্য সুকোমলাঙ্গ ও কামবর্ধক। এটি 'স্ফুরিত' বা 'ছুরিত' ও 'যৌবত' এই দুই প্রকার।

স্ফুরিত—যে শৃঙ্গার রসপ্রধান অভিনয়ে নায়ক-নায়িকা সম্ভোগ রসভরে নৃত্য করে তাকে স্ফুরিত বা ছুরিত বলে।

যৌবত—যেখানে নটীরা মধুর ভাবে নানা লীলা ভঙ্গিতে নৃত্য করে, সেই বশীকরণ বিদ্যা সম্পন্ন নৃত্যকে যৌবত লাস্য বলে।

অভিনয়

'অভিনয়' শব্দটি সংস্কৃত। 'অভি' শব্দের অর্থ দিকে বা প্রতি, 'নী' শব্দের অর্থ বহন করা। অর্থাৎ শিল্পের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা এবং সঞ্চারিত করা। অভিনয় চারটি ভাগে বিভক্ত—আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য।

আঙ্গিকাভিনয়—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গতিভঙ্গীর যে চলন তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে।

বাচিক অভিনয়—কাব্য, নাটকের ভাষা, গান ও বাদ্য, (বিশেষত বোল-বাণী) সাহিত্যের ভাষা দিয়ে যে অভিনয় তাকে বাচিক অভিনয় বলে।

সাত্ত্বিক অভিনয়—মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে ভাবের সাহায্যে প্রকাশের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়।

আহার্য অভিনয়—চরিত্র অনুযায়ী অঙ্গসজ্জা, বসন ভূষণ, মঞ্চসজ্জা, অলঙ্কার ইত্যাদি।

আঙ্গিকাভিনয়

'অঙ্গ বিক্ষেপ ইতি সর্ব মুনের্মতম্'। (স. দা.)

—অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ সমূহের মাধ্যমে অঙ্গাভিনয় নিষ্পন্ন হয়।

অঙ্গানি

শিরঃ করোঅথ হৃদয়ং জঠরং পার্শ্বযুগ্মকম্।
কটিশ্চেতি ষড়ঙ্গানি কথিতানি শরীরিনাম্।। (স.দা.)

—শির, কর, বক্ষ, জঠর, পার্শ্বদ্বয়, কটি—এই ছয়টি অঙ্গ।

প্রত্যঙ্গানি

স্কন্ধো বাহু: কূর্পরশ্চ মণিবন্ধ: করাঙ্গুলী।
উরু জানু চ জঙঘা চ চরণশ্চ তদাঙ্গুলী।
প্রত্যঙ্গানি দশৈতানি কথিতানি মনিষিভি:। (স.দা.)

—স্কন্ধ, বাহু, কূর্পর বা কণুই, মণিবন্ধ, করাঙ্গুলী, উরু, জানু, জঙঘা, চরণ বা পদ, পদ-অঙ্গুলী, এই দশটি প্রত্যঙ্গ।

উপাঙ্গানি

ভ্রুকুটি কেশ: স্তনশ্চ ধম্মিল্লো ললাটং ভ্রূযুগংতথা।
চক্ষু: কোণস্তথা নেত্রং তারা দৃষ্টিশ্চ দর্শনম্।।
কণ্ঠ কর্ণো হনুর্নাসা কপোলৌষ্ঠৌ মূর্ধা অপি।
জিহ্বা নি:শ্বাস চিবুকং মুখং তদ্রাগ এবচ।।
গ্রীবা চেতি ত্রয়োবিংশত্যুপাঙ্গানি বিদুর্বুধা: (স.দা.)

— তেইশটি উপাঙ্গ যথা—ভ্রূকুটি, কেশ, স্তন, ধমিল্ল, ললাট ইত্যাদি।

শিরভেদ

ধুতং বিধুতমাধূতন্নবধূতঞ্চ কম্পিতম্।
আকম্পিতোদ্বাহিতে চ পরিবাহিতমাঞ্চিতম।।
নিকুঞ্চিতং পরাবৃত্তমুৎক্ষিপ্তাধোমুখে তথা।
লোলিতঞ্চেতি বিজ্ঞেয়াং চতুর্দশবিধং শির:।। (ভ. র.)

—ধুত, বিধুত, অবধুত, আধুত, কম্পিত, আকম্পিত, উদ্বাহিত, পরিবাহিত, আঞ্চিত, নিকুঞ্চিত বা নিহঞ্চিত, পরাবৃত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ, লোলিত—মোট চৌদ্দ প্রকার শির।

ধুত শির—বাম ও দক্ষিণে শিরচালনা করলে ধুত শির। বিস্ময়, শীতার্ত, ভীত, নিষেধ ইত্যাদি ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

বিধুত শির—বাম ও দক্ষিণে দ্রুতগতিতে চালনা করলে বিধুত শির হয়। শীতগ্রস্ত, ভীত, মদাসক্ত, জ্বর, ত্রস্তভাব প্রকাশ করে।

আধুত—যখন মস্তক তির্যক ভাবে উপরদিকে উন্নত হয়। নিজস্ব অঙ্গ গর্বের সঙ্গে দেখা, ওপরে এক দিকে কেউ দাঁড়িয়ে আছে দেখা, অহংকার প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

অবধুত—যখন মস্তক নিচের দিকে নামিয়ে আনা হয়। জায়গা, আমন্ত্রণ বা আবাহন, একজন দাঁড়িয়ে আছে নির্দেশ করা অর্থ প্রকাশে ব্যবহার হয়।

কম্পিত—উপরে ও নীচে দ্রুতভাবে মস্তক সঞ্চালনে কম্পিত শির হয়। ক্রোধে, স্তব্ধ হওয়ায়, প্রশ্নে, গণনায়, তর্জনে, আবাহনে ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

আকম্পিত—উপরে ও নীচে ধীরগতিতে দুবার মস্তক সঞ্চালন করলে আকম্পিত মস্তক হয়। প্রশ্ন করা, উপদেশ দেওয়া, আমন্ত্রণ জানানো প্রকাশ করে।

উদ্বাহিত—উর্দ্ধদিকে মস্তক উন্নত করলে উদ্বাহিত শির হয়। অহংকার ইত্যাদি ভাব প্রকাশ ব্যবহার হয়।

পরিবাহিত—বৃত্তাকারে চামরের মত দুইদিকে মস্তক সঞ্চালন দ্বারা পরিবাহিত মস্তক হয়। সন্তোষ, স্মিতহাসি, ক্রোধ, সম্মতি ভাব প্রকাশে ব্যবহার হয়।

আঞ্চিত—পাশে একদিকে মস্তক-গ্রীবাসহ নীচুকরা অবস্থায় আঞ্চিত মস্তক হয়। অসুস্থ, উদ্বেগ, বিভ্রান্তি ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

নিকুঞ্চিত—স্কন্ধ উর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত ও গ্রীবা পার্শ্বদেশে আনত অবস্থায় নিকুঞ্চিত বা নিহঞ্চিত শির হয়। গর্ব, মান, বিলাস, কৃত্রিম কোপ ইত্যাদি ভাব প্রকাশে ব্যবহার হয়।

পরাবৃত্ত—মস্তক পিছন দিকে ফেরালে পরাবৃত্ত শির হয়। ক্রোধে অথবা লজ্জায় মুখ ফেরানো, অনাদরে, পেছন দেখার জন্য অর্থ প্রকাশে ব্যবহার হয়।

উৎক্ষিপ্ত—মুখসহ উর্দ্ধদিকে মস্তক সঞ্চালন করলে উৎক্ষিপ্ত শির হয়। উঁচু বস্তু দর্শন, চন্দ্র ও অন্যান্য আকাশচারী বস্তু দর্শন, গ্রহ ইত্যাদি দর্শন অর্থে উৎক্ষিপ্ত শির ব্যবহৃত হয়।

অধোমুখ—নিম্নমুখে স্থিত অবস্থায় অধোমুখ শির হয়। লজ্জা, দুঃখ, প্রণাম প্রকাশ করে।

লোলিত—চোখ সহ সমস্ত মস্তক অস্থির অবস্থায় চতুর্দিকে ভ্রামিত করলে লোলিত শির হয়। নিদ্রাবেশ, অসুস্থ, ভূতগ্রস্থ, মদ্যপ, অজ্ঞান অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার হয়।

হস্ত ঃ

সামান্যতো হস্তকাঃ সুস্ত্রিবিধাঃ সর্বসম্মতাঃ।।
অসংযুতাঃ কিয়ন্তোৎপি কিয়ন্তঃ সংযুতাঃ পরে।
নৃত্ত হস্ত কিয়ন্তঃ সুৎরিত্থং হস্তা স্ত্রিধা মতাঃ।। স.দা.

হস্ত তিন প্রকার—সংযুত, অসংযুত ও নৃত্তহস্ত। এর মধ্যে অসংযুত ও সংযুত নৃত্য হস্ত।

অসংযুত—যে সকল হস্তাভিনয়ে এক হস্ত ব্যবহৃত হয় তাকে অসংযুত হস্ত বলে।

সংযুত—যে সকল হস্তাভিনয়ে দুইটি হস্তই ব্যবহৃত হয় তাকে সংযুত হস্ত বলে।

নৃত্ত হস্ত—যে সকল হস্ত নৃত্যকালে ব্যবহৃত হয়, কোনও বস্তু নির্দেশ করে না, বা অর্থ প্রকাশ করে না, শুদ্ধ অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত, অভিনয় সূচক নয়, সেই সকল হস্তকে নৃত্ত হস্ত বলে। এছাড়া আছে মিশ্র হস্ত বা বিপ্রযুক্ত হস্ত।

পন্ডিত শুভঙ্করের শ্রীহস্ত মুক্তাবলী অনুযায়ী **অসংযুত হস্ত** ৩০ প্রকার।

"অসংযুতানাং হস্তানামুদ্দেশঃ ক্রিয়তে অধুনা।
শুভঙ্করেণ কবিনা নানাভিনয় শালিনা।।
পতাকঃ পদ্মকোশশ্চ হংসাস্য কর্তরীমুখঃ।
অলপদ্ম-স্ত্রিপতাকো মুষ্টিকঃ শিখরস্তথা।।
অর্ধচন্দ্র সর্পশিরঃ সূচাস্যঃ খটকা মুখঃ।
অরালঃ শুকতুন্ডশ্চ সংন্দশঃ কাঙ্গুলস্তথা।।
উর্ণনাভোঅপি কথিতাঃ কপিত্থ মৃগশীর্ষকঃ।
হংসপক্ষ স্তাম্রচূড়শ্চতুরো মুকুলস্তথা।।
ভ্রমরশ্চ কদম্বশ্চ কৃষ্ণসার মুখহ্বয়ঃ।
ঘ্রোণিকোঅপ্যথ সিংহাস্যো অঙ্কুশস্তন্ত্রী মুখ স্তথা।। শ্রী হ.মু.

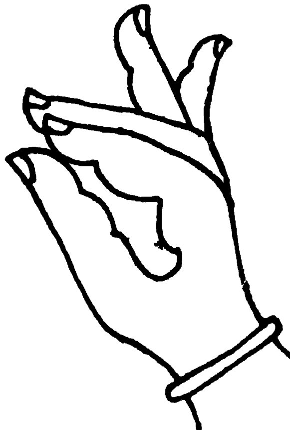


পতাক—যখন সমস্ত অঙ্গুলিগুলি পরস্পর একত্রিত হয়ে প্রসারিত থাকে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কুঞ্চিত হয়ে সঙ্গে যুক্ত থাকে, পতাক হস্ত হয়।

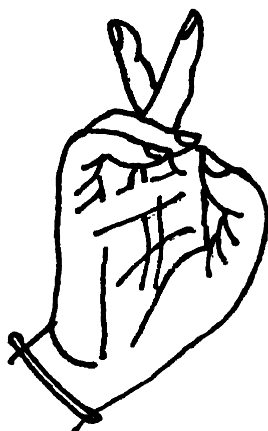
বিনিয়োগ—জল, জগত, লজ্জা, সংখ্যা, আকার, বন, নূপুর, চরণ, কপাল, ধ্যান, অলঙ্কার, রাত্রি, দিক, আনন্দিত, বর, উপহার, লালরঙ, পতাকা, আসন, বস্ত্র বা বসন, অন্তিম, নিষেধ, প্রার্থনা, ভয়, সম্মান ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। পতাক হস্তের ব্যবহার মোট ২২৬টি-এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল।



পদ্মকোশ—উন্নত অঙ্গুলিগুলি ফাঁক ফাঁক অবস্থায় সামান্য বক্রভাবে নিম্নমুখী অবস্থায় থাকলে পদ্মকোশ হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—তরুণীর স্তন, পদ্মকোরক, লিলি কোরক, পদ্মের বৃতি, গম্ভার, ছাতা, কমন্ডলু, পূজা, চৌরাস্তার মোড়।

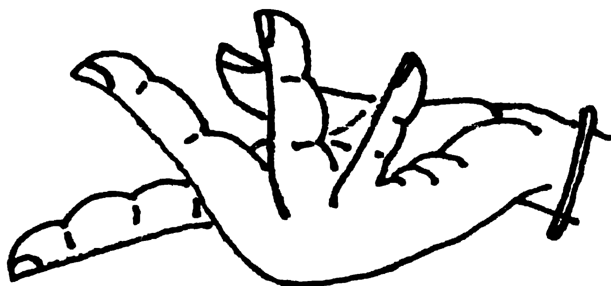


হংসাস্য—তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পরস্পর মিলিত হয়ে হাঁসের ঠোঁটের মত আকৃতি হলে ও অন্য দুটো আঙ্গুল প্রসারিত থাকলে হংসাস্য হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—নিচের ওষ্ঠ, চুম্বন, পান, অমৃত, চন্দন, কস্তুরী, দুধ, মাখন, তেল, লালরঙ, চম্পক, মালতী, মল্লিকা ফুল, অল্প পরিমাণ, উৎসব, ভাবপ্রবণ, নরমবস্তু, ধূলিময় বস্তু।



কর্তরীমুখ— ১। যখন অনামিকা বক্র এবং তর্জনী মধ্যমার পিছনে থাকে। ২। যখন কনিষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দৃঢ় ভাবে ধরা থাকে মধ্যমা ও তর্জনী প্রসারিত থাকে।

বিনিয়োগ—চোখ, দর্শন, শিং, পায়ের পাতা, রাস্তা, বিতর্কের বিষয়, রং করা, মৃত্যু, স্বর্গীয়, গঙ্গা, ছুরি, পাপ, ক্রোধ, কুৎসিত, চুলের বেণী, শৃংখল বা শেকল, তারা, বাগান, ধনসম্পত্তি, জ্বর, ঘোড়া, রোগ, ঝগড়া, করাত, বিশ্রাম, কানের দুল।



অলপদ্ম হস্ত—যখন সবকয়টি অঙ্গুলি পরপর ফাঁক ফাঁক অবস্থায় ভেতরের দিকে ঘুরে থাকে।

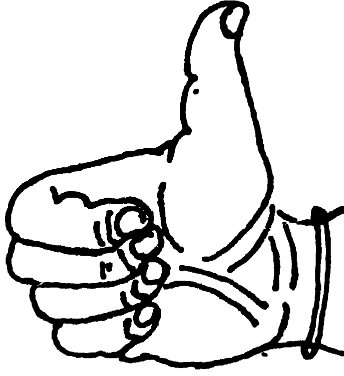
বিনিয়োগ—রাধিকা, ঘৃতাচী, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা, উর্বশী, অপ্সরা, লক্ষ্মী, পার্বতী, সরস্বতী, গন্ধর্বী, স্তন, সত্যভামা, টকফল, পদ্ম, লিলি, নারকেল, ছাতা, সাহস।



ত্রিপতাক—পতাক হস্ত অবস্থায় অনামিকা বক্র হলে ত্রিপতাক হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—সাদর অভ্যর্থনা, প্রণাম, প্রবেশ, জলের অল্প স্রোত, ভোম্‌রা, হাতীর দাঁত, উড়ন্ত পতঙ্গ, মশা, কপালে তিলক পরা, অশ্রু মোছা, একটি দরজা, একটি বাড়ী, একজন রাজা, একটি কুমীর, একটি বাঁদর, হত্যা, মৃদুমন্দ মলয় পবন, একজন নারী, সূর্য বা চন্দ্র কিরণ।

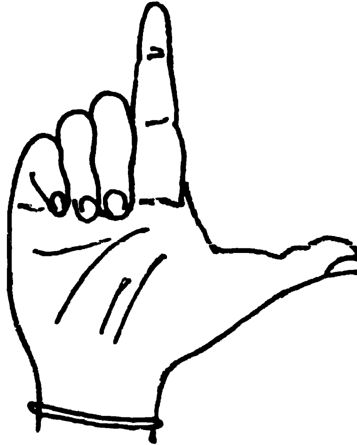


মুষ্টি—যখন চারটে আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় করতলে ধৃত হয় এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি তার ওপর স্থাপিত হয়।
বিনিয়োগ—ঘুষি মারা, স্তন স্পর্শ, সতী নারী, চন্ডাল, হাঁড়ি, ডোম, যোগী, মুষ্টিযোদ্ধা, কমন্ডলু, একটি তরবারী, একটি কুঠার, ছুরি ধরা, চাষ করা, কিরাত, হেমন্ত, স্তন, আঁধার, তিক্ত স্বাদ, অম্ল স্বাদ, গোদোহন।



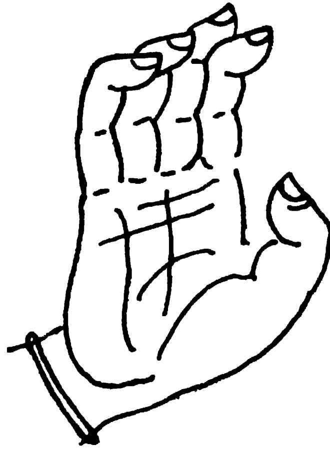
শিখর—যখন মুষ্টি হস্ত অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠ পৃথক হয়ে খাড়া থাকে।

বিনিয়োগ—একটি পর্বত, একটি বাঁশ, বজ্র, রংকরা, রাজহাঁস, হত্যা, দেওয়া, দেখা, বীজ, অন্যর পা চিত্রিত করা।



অর্ধচন্দ্র—১। যখন চারটি আঙ্গুল একত্রিত, অঙ্গুষ্ঠ পৃথক ভাবে নত। ২। যখন মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা, মুষ্টিবদ্ধ অবস্থা তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ পৃথক ভাবে প্রসারিত।

বিনিয়োগ—পূর্ণচন্দ্র, শংখ, সূর্য, কলম, সুন্দরী নারী, ছোট বৃক্ষ, নিদ্রা, উরু, জ্বালানী, কানের দুল, শিশু, অর্থ, নদী, ঢাকনা।



সর্পশির—পতাক হস্ত অবস্থায় সমস্ত অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ নমিত করলে সর্পশির হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—সাপ, ছোট নৌকো, জলপূর্ণকলস, ক্ষত্রিয়, নিষ্ঠুর ব্যক্তি, পুজো করা, জলদান।



সূচীমুখ—তর্জ্জনী সোজাভাবে দন্ডায়মান, অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমার অগ্রভাগকে স্পর্শ করে, অন্য অঙ্গুলিগুলি পৃথক অবস্থায় থাকে।

বিনিয়োগ—তারা, মেঘ, কলসী, চাকা, ছোটগাছ, ময়ূরের পালক, প্রদীপ, স্বর্গ, বর্শা, একদিন, একটি পর্ব্বত, কলা, গর্ত, চুলের বেণী, কর্ণাভরণ, ব্রেসলেট, গ্লাস, লবঙ্গ, বকুলফুল, কেতকীপুষ্প, চাঁপা ফুল, খোঁড়া, একটি চোখ, একটি শব্দ, ঈশ্বর দর্শন।



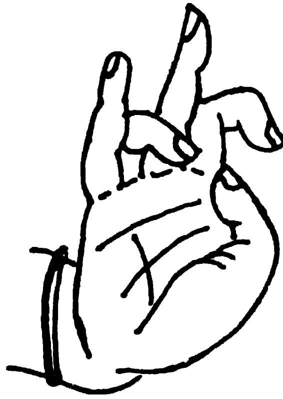
খটকামুখ- -তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠর অগ্রভাগ মিলিত হবে, অনামিকা অল্প কুঞ্চিত ও কনিষ্ঠ সোজা থাকবে।

বিনিয়োগ—হার, ভালবাসা, ধনুর্ধর, গাল, একটি বাঁশী, ডমরুর শব্দ, একটি তলোয়ার, একটি ময়ূর, ঘি, একটি যুদ্ধ, মিল বা সাদৃশ্য, নারী, শিবের চক্ষু, রামের অভিষেক, ওজন।



অরাল—যখন অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনী এমনভাবে বক্র থাকে যে ধনুকের দুই প্রান্তের মত দেখায় এবং অন্য অঙ্গুলি তিনটি একত্রিত ভাবে প্রসারিত থাকে।

বিনিয়োগ—একটি বিবাহ, লক্ষ্মী, লেখা, চিত্রাঙ্কন, স্বর্গীয় সৌন্দর্য, কেশ পরিচর্চা, সুগন্ধ দ্রব্য, স্বেদ মোছা, একটি বিছানা, একটি দোলনা, একটি ঘোড়া, একটি গাছ, একটি পর্বত, একটি রাক্ষস, ভূত প্রেত অসুর, যক্ষ. লাল, হলুদ, সাদা, কালো. অন্যান্য রঙ, একটি দরজা।



শুকতুন্ড—যখন অরাল হস্ত অবস্থায় অনামিকা বক্র হয় তখন শুকতুন্ডহস্ত হয়।
বিনিয়োগ—পর্বত চূড়া, একটি বাচ্চা, রামধনু, রাজদন্ড, হাতির অঙ্কুশ, বৃক্ষশাখা, একটি পশু, একটি লতা বা বল্লী, শিবের ত্রিশূল, পশুর ল্যাজ, কান, ইন্দ্রধ্বজ, ঢাল।



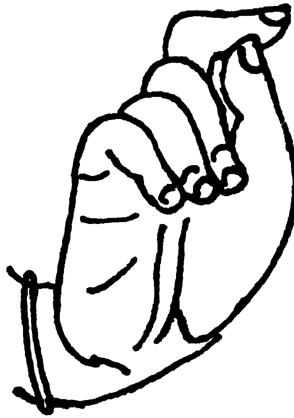
সংন্দশ—যখন অরাল হস্ত অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ তর্জনীকে স্পর্শ করে তখন সংন্দশ হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—পুষ্প চয়ন, দূর্বা ধারণ বা কেশধারণ, কচি পাতা বা কিশলয়, আকর্ষণ। প্রদীপের সল্‌তে, হীরে, নিন্দা, তিরস্কার, রোষ, প্রচন্ড ক্রোধ—মুখজ সংন্দশ। ঘৃণ্য বা জঘন্য বস্তু, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা—পার্শ্বজ সংন্দশ। কাজল, চোখ, সত্য, বিস্তৃত, সোনা, লেখন।



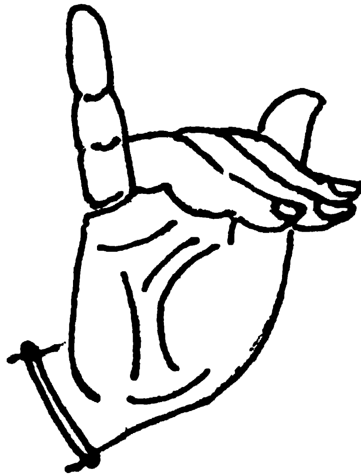
কাঙ্গুল—যখন তর্জনী, মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠ খুব কাছাকাছি একত্রে থাকে, অনামিকা সম্পূর্ণরূপে বক্র এবং কনিষ্ঠা একটু দূরে ওঠানো অবস্থায় বক্র থাকে তখন কাঙ্গুল হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—মন্মথ দেব, মুক্তো, মণিরত্ন, চুণী, নানা ধরণের পাথর, আংটি, হীরে, অম্লফল, লেবু জাতীয় ফল, খাওয়া, বকুল ফুল, নাগকেশর ফুল, একটি চোখ, একটি নাক, তারা, নখ, অঙ্গুষ্ঠ, ফুল।



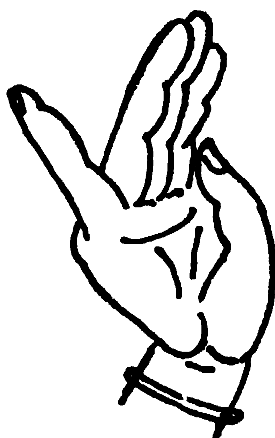
উর্ণনাভ—পদ্মকোশ হস্ত অবস্থায় সমস্ত অঙ্গুলিগুলি যদি আরও বক্র হয় তাহলে উর্ণনাভ হস্ত হবে।
বিনিয়োগ—মাথা চুল্কানো, সিংহ, বাঘ, বাঁদর, বাঘের থাবা, ভালুক, পাথর, ইঁট, কেশ গ্রহণ, নৃসিংহ রূপ।



কপিত্থ—শিখর হস্ত অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠের উপর যদি তর্জনী স্থাপিত হয় তবে কপিত্থ হস্ত হবে।
বিনিয়োগ—হাতীর অঙ্কুশ, বঁড়শির হুক, নায়ক, বৃহৎ যুদ্ধ, সত্য, দড়ি, শেকল বা শৃংখল, ঘাস, তরবারি, বজ্র অস্ত্র, শক্তি অস্ত্র, ধনুক, ধনুকের ছিলা, হাত।

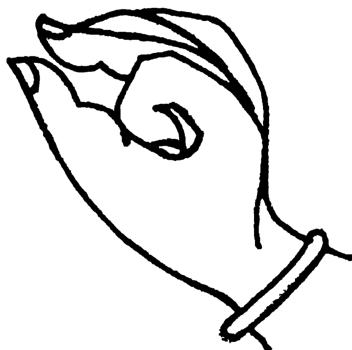


মৃগশীর্ষ—যখন অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা খাড়া অবস্থায় ও অন্য তিনটে আঙ্গুল একত্রে বক্র অবস্থায় থাকে তখন মৃগশীর্ষ হয়।
বিনিয়োগ—দীর্ঘজীবি, আশীর্বাদ প্রদান, আশীর্বাদ, প্যাঁচা, দাঁত, পবিত্র, মুখ, রাস্তা, দধি, পানকরা, ঘুমানো, বক্ষ, বেদপাঠ, বেদ, শিশু, পাতা, রক্ষা, প্রার্থনা, বৈশাখ, বস্ত্র।



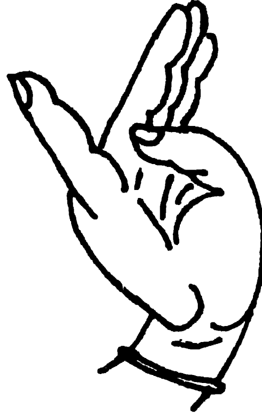
হংসপক্ষ—যখন কনিষ্ঠা খাড়াভাবে থাকে, তিনটে আঙ্গুল একত্রে সমুখ দিকে প্রসারিত থাকে এবং অঙ্গুষ্ঠ বক্রভাবে তর্জনীর সঙ্গে লেগে থাকে।

বিনিয়োগ—জল খাওয়া, আলিঙ্গন, অভিষেক, বর্ম, আকাশ, গ্রাম বা দেশ, অমৃত, আম, দুঃখিত, বিবৃতি, ঢাকনা, গলা, জিহ্বা, হৃদয়, পা।



তাম্রচূড়—যখন তর্জনী খাড়া অবস্থায় সামান্য বক্র থাকে, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ মিলিত থাকে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা করতল স্পর্শ করে থাকে তখন তাম্রচূড় হস্ত হয়। এছাড়াও তর্জনী বক্র এবং মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ মিলিত হলে তাম্রচূড় হস্ত হয়।

***বিনিয়োগ**—অঙ্গদ্বারা সংকেত, হাইতোলা, গণনা. লৌহ, টিন, ঘন্টার ধাতু. অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, সীসা, লালখড়ি।*



চতুর—কনিষ্ঠা খাড়া অবস্থায় থাকে, তিনটে আঙ্গুল একত্রে থাকে এবং অঙ্গুষ্ঠ মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

বিনিয়োগ—প্রভূত আনন্দ, সত্য, অসাধ, মেকী, খ্যাতি, অভিবাদন. অলংকার, ছুতো, বিচার, ওপরের ঠোঁট, কর্ণ, নীচের ঠোঁট, দারুণ, সম্পত্তি, সুখ, ভদ্রতা সৌজন্যতা, খেলা করা।

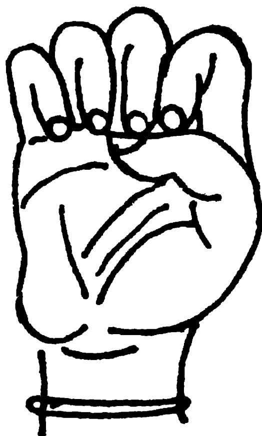


মুকুল—সব অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ কাছাকাছি আসলে মুকুল হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—*মুখ গহ্বর সংকোচন, কার্তিক মাস, ইঁদুর, মুহূর্ত, অর্ধদিবস, তারা, খাওয়া, চুম্বন, রক্ত, কোমলতা, আদেশ, লাল বস্ত্র, হলুদ বস্ত্র।*



ভ্রমর—মধ্যমা ও তিনটে আঙ্গুল আলাদা থাকলে ভ্রমর হস্ত হয়। যখন ভ্রমর হস্তের তর্জনী ও অনামিকা সঞ্চালিত হয় তখন **চলন্মধুকর** হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—কানের দুল, কুমীর, গন্ডার, ঘোড়া, শিংওয়ালা পশু, সাতমাথাওয়ালা সাপ, পদ্মফুল চয়ন, বিষ্ণুর বরাহ রূপ।



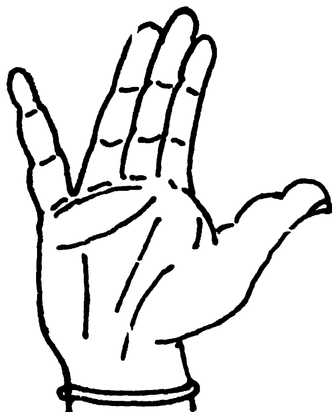
কদম্ব—পদ্মকোশ হস্তের অঙ্গুলিগুলি যদি আরও কাছে আনা যায় তবে কদম্ব হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—অবশেষে, স্বেদ, ঘাস, ছোট কলস, খাওয়া, মুখ থেকে বাষ্প নির্গত হওয়া, পিষ্টক বা পিঠে, গুড়, ভাল, বাঘ, বালিশ, ফুল, তারা, বন্ধু।



কৃষ্ণসার মুখ—মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ একত্রিত হয়ে মিলিত হয়ে কনিষ্ঠা ও তর্জনী ক্রমাগত ওপর নীচে সঞ্চালিত হলে কৃষ্ণসার মুখ হস্ত হবে।
বিনিয়োগ—নিদ্রা, দন্ত, গলার হার, বীণাবাদন, ধ্যান, দক্ষ, হরিণ, দুষ্ট, গতি।



ঘ্রাণিক—পাঁচটি অঙ্গুলি একত্রিত হয়ে বর্তুলাকারে ধৃত হলে ঘ্রাণিক হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—শূকর, জলের বুদবুদ, কপালে করাঘাত করা।



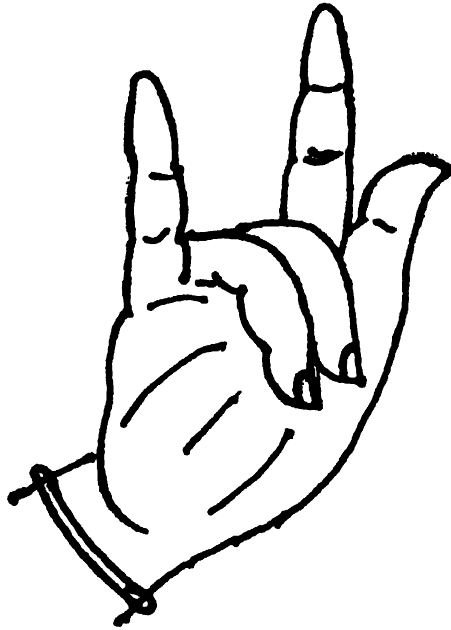
সিংহাস্য—যখন অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা একত্রে বিধৃত হয় এবং অন্য তিনটি অঙ্গুলি একত্রে উত্থিত থাকে তখন সিংহাস্য হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—সিংহের মুখ, বাঘ, সিংহ, ভালুক, কুমীর, ভয়।



অঙ্কুশ—যখন সমস্ত অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিহস্ত অবস্থায় থাকে ও তর্জনীর অগ্রভাগ খাড়াভাবে বক্র থাকে, তখন অঙ্কুশ হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—হাতির অঙ্কুশ, অস্ত্র, বড়শির হুক, বজ্র, স্নেহ, দড়ি, মধুসংগ্রহ।

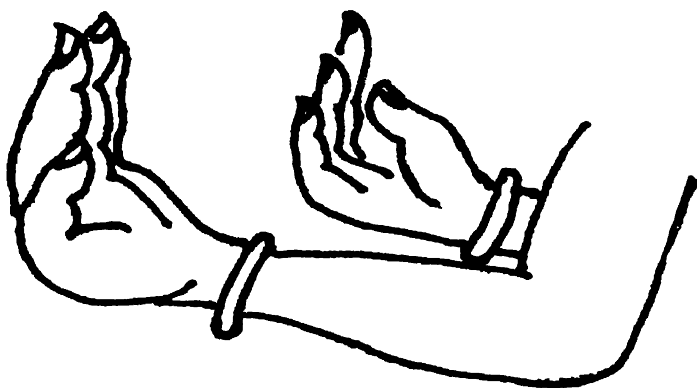


তন্ত্রীমুখ—অনামিকা ও মধ্যমা একত্রিত করে বক্র অবস্থায় নমিত হলে এবং অন্য তিনটে আঙ্গুল ফাঁক ফাঁক হয়ে আলাদা হলে তন্ত্রীমুখ হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—প্রাণায়াম ব্যায়াম, পবিত্র তিলক চিহ্ন কাটা, আচমন, আসন, সপ্ততন্ত্রী, বিপঞ্চী, চিত্রা, রুদ্র, এরাণ্ডি, কবিলসা, কচ্ছপিকা, কিন্নরী, পিনাকী, স্বরবীণা, ব্রহ্মবীণা, সূর্য-চন্দ্র-গুরু বীণা, অন্য বাদ্যযন্ত্রাদির জ্ঞান।

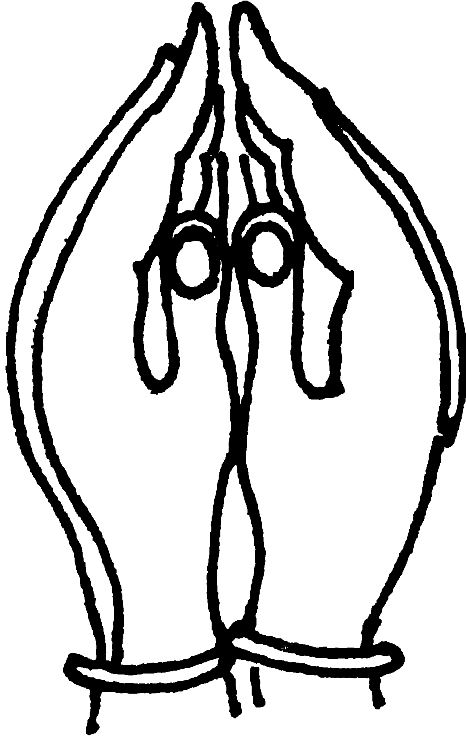
সংযুত হস্ত—১৪ প্রকার

"ইত্যেতে কথিতা হস্তা ময়া ত্রিংশদসংযুতাঃ।
সংযুতানাঞ্চ হস্তানামুদ্দেশঃ ক্রিয়তে অধুনা।।
গজদন্তঃ কপোতশ্চ বর্ধমানাঞ্জলি তথা।
নিষধঃ কর্কটশ্চৈব তথোৎসঙ্গো অবহিত্থকঃ।।
স্বস্তিকো মকরো দোলস্তথা পুষ্পপুটাভিধঃ।
মরালশ্চ তথৈবন্যাঃ খটকাবর্ধমানকঃ।। শ্রী হ.মু.



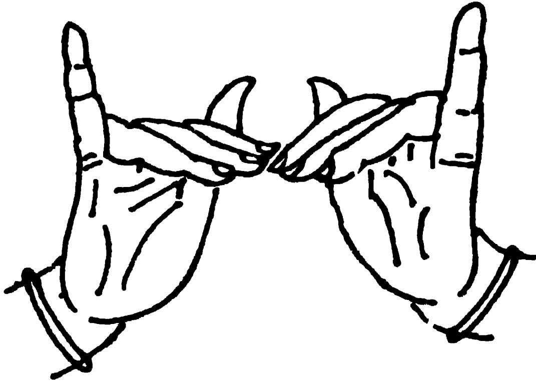
গজদন্ত—যখন দুটো সর্পশির হস্ত অবস্থায় কুর্পর অর্থাৎ কনুই বক্র হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয় তাকে গজদন্ত বলে।

বিনিয়োগ—বিবাহ, বিবাহের সময় খই দেওয়া, দোলানো, হাতী, সাতপাক, হাতীর দাঁত, বড় নৌকো, মালবাহকের মাল বওয়া।



কপোত—দুটো পতাক হস্ত সম্পূর্ণ যুক্ত করে মধ্যদেশ ফাঁকা গহ্বরের ন্যায় থাকলে কপোত হস্ত হয়।

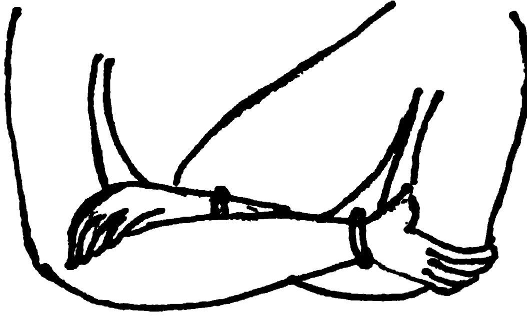
বিনিয়োগ—বিনয়, ঠান্ডা, মাঘ মাস, জন্ম (মানুষ বা পশুর), গুরু অভ্যর্থনা, ভীত, অহংকার, মহেশ্বর, পায়রা, প্রমাণ, প্রভু, আজ্ঞা পালন।



বর্ধমান—দুইটি মৃগশীর্ষ হস্ত সামনে একত্রে বিধৃত হলে বর্ধমান হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—জানালা, শহর, দরজা, মিলন, সত্য।



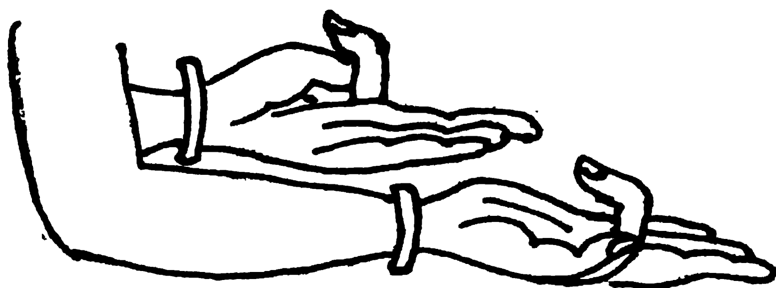
অঞ্জলি—যখন দুইটি পতাক হস্তের পার্শ্বদেশ সম্পূর্ণ রূপে যুক্ত হয় এবং কর দিকে বক্র ভাবে ঘোরানো তখন অঞ্জলি হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—দেবপ্রণাম, কৃষ্ণ প্রণাম, গুরু ব্রাহ্মণ প্রণাম, বন্ধুদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো, ছাতা, পদ্ম, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মঙ্গলচন্ডী, গঙ্গা।



নিষধ—দুই বাহুর কুর্পর বা কনুই দুই বিপরীত হাত দিয়ে ধরা থাকলে নিষধ হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—দৃঢ়তা, অহঙ্কার, ব্যতিক্রম, অহম্, নায়কোচিত, আগ্রহ, পরশুরাম।

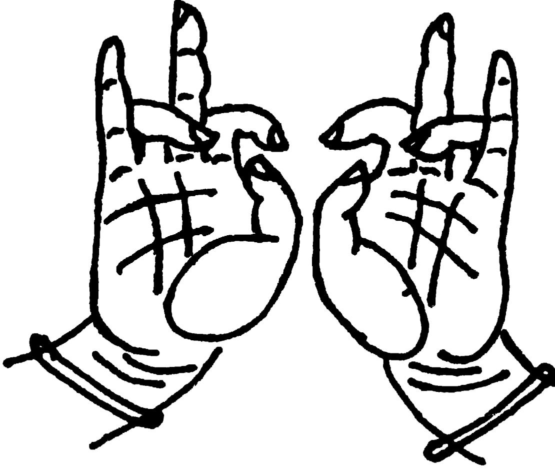


কর্কট—যখন উভয় হস্তের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর অন্তর্গামী হয় তখন কর্কট হস্ত হয়।
বিনিয়োগ—শঙ্খ, লতা, দেহমর্দন, বালিশ, মদনদেব, দুঃখ, কর্কট বা কাঁকড়া।



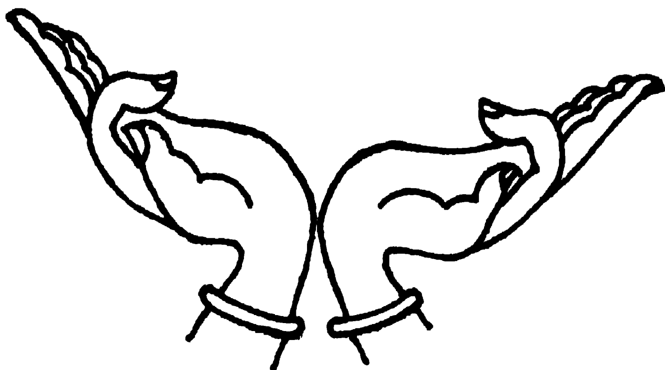
উৎসঙ্গ—দুইটি অরাল হস্ত সামনের দিকে এগিয়ে রেখে করতাল উর্দ্ধমুখী অবস্থায় থাকলে উৎসঙ্গ হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—বিছানা, অলঙ্কার, আঁধার, স্পর্শ, গ্রহণ, ঈর্ষা, রথ, ঘাস, মাস, বৎসর, দিন, আনন্দ, সময়ের পরিমাপ।



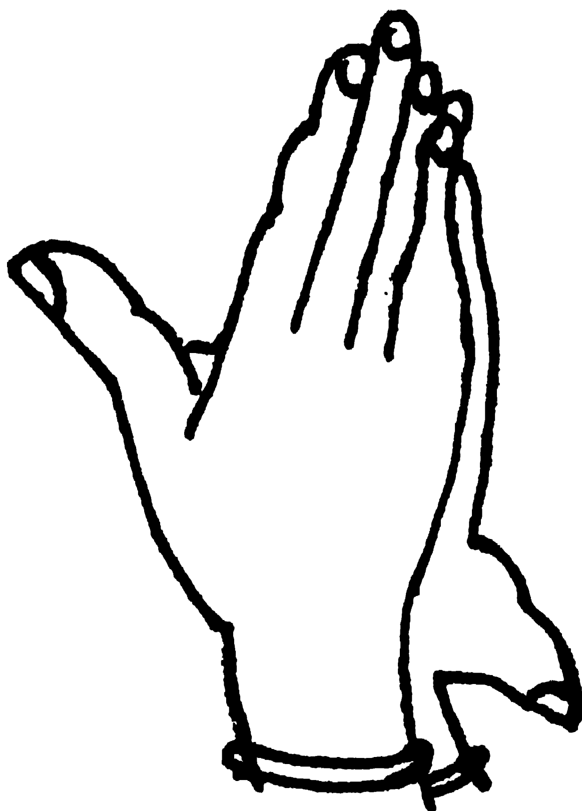
অবহিত্থ—দুই হাতে শুকতুন্ড হস্ত আড়াআড়িভাবে বুকের সামনে ধরলে অবহিত্থ হস্ত।

বিনিয়োগ—মনের দুঃখে পীড়িত নারী, উৎকণ্ঠা, পাতলা দেহ, পতন, অসুখ, ওঠা।



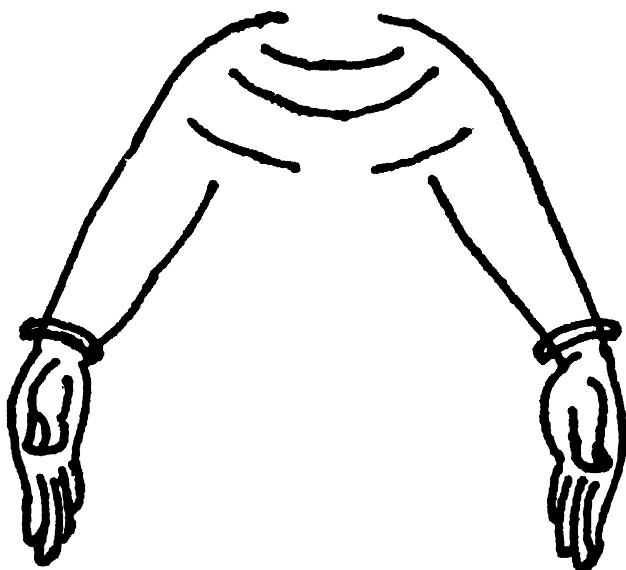
স্বস্তিক—দুই হাতে অরাল হস্ত মণিবন্ধে আড়াআড়ি ভাবে বিধৃত হলে স্বস্তিক হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—সপ্তদ্বীপ সহ পৃথিবী, সপ্তসমুদ্র, সপ্তস্বর্গ, আকাশযান, ধনসম্পত্তি, উৎসব, সকাল, দিন, নিশা, মেঘ, আকাশ, দিক, তারা, গ্রহ, বন, সৈন্য, যোদ্ধাদের লড়াই।



মকর—দুই হাতে পতাক হস্ত একটির পিঠে অন্য পতাক হস্ত স্থাপিত করলে অঙ্গুষ্ঠাদ্বয় উপরের দিকে উঠিয়ে রেখে কম্পিত করলে মকর হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—সিংহ, বাঘ, কুমীর, রাক্ষস, হত্যাকারী, নিষ্ঠুর, রাহু, মাছ, মৎস্যাবতার।



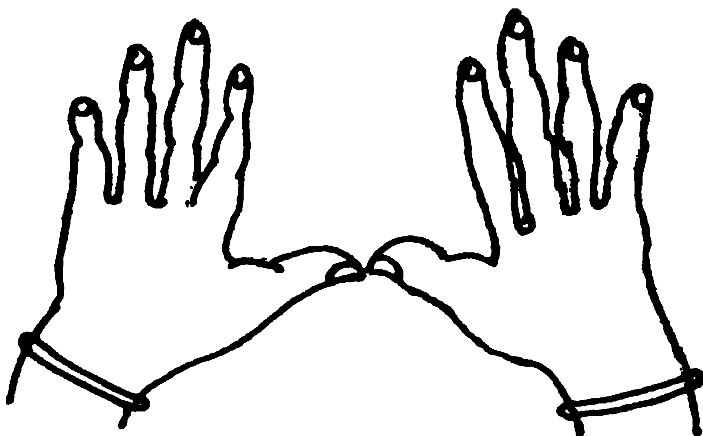
দোল—দুই হাতে পতাক নিচের দিকে মুখ করে আল্‌গা ভাবে অবস্থান করলে দোল হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—ঝগড়া, অজ্ঞান, মর্যাদা, ক্ষতি, অহঙ্কার, ভাদ্রমাস, প্রণাম, প্রার্থনা, ধ্যান, দোলনা, নৌকো।



পুষ্পপুট—যখন দুইটি সর্পশীর্ষ হস্তের পার্শ্বদ্বয় পাশাপাশি আনা হয় তখন পুষ্পপুট হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—ধ্যান, ডাল, সর্ষেবীজ, বীন, ভুট্টা, শস্য, প্রশ্ন, ধারণ, অধিদেবতা, প্রণাম, নৌকো।



মরাল—দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর ফাঁক ফাঁক করে কম্পিত করলে মরাল হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—নদী, বড় নদী, নদীর তীর, অগ্নি প্রজ্বলন, জ্বর, ঘৃণা, চোর, নিয়ম, নির্দয়, ব্যথা, ভীত, চুল, মলয় পবন।



কটকাবর্ধনম্—দুইটি কটকা মুখহস্ত একত্রে রাখা হলে কটকাবর্ধনম্ হস্ত হয়।

বিনিয়োগ—শংখ, তরবারী, প্রণাম, স্বর্ণকলস, রৌপ্যকলস, কুন্দফুল, লিলিফুল।

নৃত্তহস্ত—২৭ প্রকার

অথ নৃত্তহস্তৌ যথা।।

কেশবন্ধো নিতম্বশ্চ রেচিত্যোপ্যর্ধরেচিত।
চতুরস্রস্তথোদ্বৃত্তঃ পল্লবঃ পক্ষবঞ্চিতঃ।।
লতানামা নতমুখঃ স্বস্তিকো বিপ্রকীর্ণকঃ।
আবিদ্ধবক্তুঃ সূচাস্যোপ্যরালখটকামুখঃ।।
বক্ষোমণ্ডল্যথৈকঃ স্যাদুরঃ পার্শ্বার্ধমণ্ডলী।
পার্শ্বমণ্ডল্যথ ভবেদূর্ধ্ব মণ্ডল্যথাপি বা।।
মুষ্টিকস্বস্তিকশ্চাপি পক্ষপ্রদ্যোতকস্তথা।
করিহস্তঃ দণ্ডপক্ষস্তথা গরুড়পক্ষকঃ।।
অলপদ্মান্নোতশ্চৈব ভবেদুত্তানরেচিতঃ।।
নলিনীপদ্মকোশাশ্চেত্যমী চ সপ্তবিংশতিঃ।। শ্রী. হ. মু.

কেশবন্ধ—যখন দুই হাতে ত্রিপতাক চুলের বেণীর মত সামনে নেমে আসে এবং পুনরায় পিছনে পাঠায় তখন কেশবন্ধ হস্ত হয়।

নিতম্ব—দুই হাতে ত্রিপতাক নিতম্ব পর্যন্ত নামিয়ে এনে স্থিত হলে নিতম্ব হস্ত হয়।

রেচিত—দুই হাতে হংস পক্ষ দ্রুত নিচে দুই ধার দিয়ে নামিয়ে পিছনে নিয়ে গেলে এবং বারংবার পুনরাবৃত্তি করা হলে রেচিত হস্ত হয়।

অর্ধরেচিত—এক হাতে রেচিত এবং অন্য হাতে কটকামুখ হস্ত হলে অর্ধরেচিত হস্ত হয়।

চতুরশ্র—যদি দুইটি কটকামুখহস্ত বক্ষ থেকে আট অঙ্গুলি দূরে থাকে এবং কনুই সোজা থাকে। তবে চতুরশ্র হস্ত হয়।

উদ্‌বৃত্ত—যদি দুই হাতে হংসপক্ষ বুকের সামনে মন্দিরা দিয়ে তাল্‌বাজানোর মত ধরা হয় তবে উদ্‌বৃত্ত হস্ত হয়।

পল্লব—যদি দুইটি পদ্মকোশ হস্ত (পতাক হস্ত বা ত্রিপতাক হস্ত) বক্ষ থেকে তির্যক ভাবে এমন ভাবে অবস্থান করে যেন দুইটি পত্ররাজি পূর্ণ দুইটি গাছ মনে হয় তাকে পল্লব হস্ত বলে।

পক্ষবঞ্চিত—দুই হাতের ত্রিপতাক হস্ত একটি মাথার ওপর এবং অপরটি কোমরের ওপর বা কাছে ধরা হলে পক্ষবঞ্চিত হস্ত হয়।

লতা—যখন দুই হাতে ত্রিপতাক রেচিত অবস্থায় উর্দ্ধমুখী ও সামনে সামান্য কম্পিত করে ধরা হয় তখন লতা হস্ত হয়।

নতমুখ—দুইটি হংসপক্ষ হস্ত নিম্নমুখী অবস্থায় সামনে থাকলে নতমুখ হস্ত হয়।

স্বস্তিক—যখন দুই হাতে হংসপক্ষ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ উর্দ্ধমুখী অবস্থায় থাকে এবং মণিবন্ধে যুক্ত থাকে তখন স্বস্তিক হস্ত হয়।

বিপ্রকীর্ণ—দুই হাতে হংসপক্ষ নিচের দিকে মুখ করে রাখলে এবং বুকের সামনে থেকে দুই ধারে সরালে বিপ্রকীর্ণ হস্ত হয়।

আবিদ্ধবক্ত্র—যখন দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি উর্দ্ধমুখী যুক্ত থাকে এবং উর্দ্ধমুখী হস্ত কাঁপতে কাঁপতে নিম্নমুখী হয় তখন আবিদ্ধবক্ত্র হস্ত বলা হয়।

সূচাস্য—দুই হাতে সর্পশীর্ষ হস্ত অল্প প্রসারিত এবং দুই কনুই কুঞ্চিত হলে সূচাস্য হস্ত হয়।

অরালখটকামুখ—যখন ডান হস্তে কটকামুখ বক্ষের সামনে এবং বামহস্তে অরালা তীর্যক ভাবে থাকে।

বক্ষোমন্ডলী—যদি এক হাতে পতাক উর্দ্ধদিকে এবং অন্য হাতে পতাক নিচের দিকে থাকে এবং বক্ষ আবর্তিত হতে থাকে তবে তাকে বক্ষোমন্ডলী হস্ত বলে।

উর:পার্শ্বার্ধমন্ডলী—যদি বাম হস্তে অরাল হস্ত বাঁ দিকের বক্ষে আবর্তিত ও ডান হস্তে অলপদ্ম ডানদিকের বক্ষে আবর্তিত হতে থাকে তখন তাকে উর:পার্শ্বার্ধমন্ডলী বলে।

পার্শ্বমন্ডলী—এক হাতে অলপদ্ম, অন্য হাতে অরালা, যেকোন একপার্শ্বে পরিভ্রমণ করলে পার্শ্বমন্ডলী হস্ত হয়।

উর্দ্ধ মন্ডলী—যদি দুইটি পদ্মকোশ মণিবন্ধে যুক্ত হয় তবে উর্দ্ধ মন্ডলী হস্ত হয়।

মুষ্টিকস্বস্তিক—যদি দুই হাতে অরাল হস্ত পিছন দিকে টেনে এনে কাঁধের কাছে কটকামুখ হস্ত ধরা হয় তবে মুষ্টিকস্বস্তিক হস্ত হয়।

পক্ষপ্রদ্যোতক—যদি এক হাতে ত্রিপতাক হস্ত নিতম্বের কাছে এবং অন্য হাতে ত্রিপতাক মাথার ওপর ধরা হয় এবং দ্রুত বদলান হয়, তবে পক্ষপ্রদ্যোতক হস্ত হয়।

করিহস্ত—যদি এক হাতে ত্রিপতাক পার্শ্বে বিলোলিত হয় এবং অন্য হাতে ত্রিপতাক কানের কাছে থাকে তবে করি হস্ত হয়।

দন্ডপক্ষ—যদি দুই হাতে হংসপক্ষ দুই দিকে যায় এবং আবার তাদের লাবণ্যযুক্ত ভাবে

ওপরের দিকে আনা হয় এবং পর্যায় ক্রমে উর্দ্ধমুখী ও নিম্নমুখী হতে থাকে তবে দন্ডপক্ষ হস্ত হয়।

গরুড়পক্ষ—যদি দুই হাতে ত্রিপতাক তীর্যকভাবে দুই দিকে প্রসারিত করা হয় এবং কনুই কুঞ্চিত করে ফিরিয়ে আনা হয় তবে গরুড়পক্ষ হস্ত হয়।

অলপদ্মোন্নত—দুই হাতে অলপদ্ম উর্দ্ধমুখী করে অবস্থিত থাকলে অলপদ্মোন্নত হস্ত হয়।

উত্তান রেচিত—যদি দুই হাতে ত্রিপতাক তির্যক ভাবে দুই ধারে প্রসারিত হয় এবং দুই কনুই অল্প কুঞ্চিত করে ফেরত আনা হয় তবে উত্তান রেচিত হস্ত হয়।

নলিনীপদ্মকোশ—যদি দুই হাতে পদ্মকোশ হস্ত ধৃত হয় এবং জানু থেকে কম্পিত করা হয় তবে নলিনী পদ্মকোশ হস্ত হয়।

ভ্রূভেদ

ভ্রূভেদ সপ্ত প্রকার—সহজা, পতিতা, উৎক্ষিপ্তা, রেচিতা, কুঞ্চিতা, ভ্রূকুটি ও চতুরা—পন্ডিতগণ এই সপ্তবিধ ভ্রূর কথা বলেছেন।

সহজা—স্বাভাবিক ভ্রূর নাম সহজা। উহা সরলভাবে প্রযোজ্য।

পতিতা—ইহাতে ভ্রূযুগল যুগপৎ বা পৃথকভাবে পতিত হয়। উহা ক্রমশ: উৎক্ষেপ, বিস্ময়, হর্ষ, ক্রোধ, অসূয়া ও ঘৃণায় প্রযোজ্য।

বি. দ্র. হাস্যে ও ঘ্রাণে সহজা ও পতিতা এই উভয়বিধ ভ্রূই প্রযুক্ত হয়।

উৎক্ষিপ্তা—একটি ভ্রূ বা উভয় ভ্রূই উৎক্ষিপ্তা হতে পারে। স্ত্রীলোকের ক্রোধে, বিচার বিবেচনায়, দর্শনে, শ্রবণে, লীলা ও হেলায় এরূপ উৎক্ষিপ্তা ভ্রূ বিজ্ঞব্যক্তির মতে প্রযোজ্য।

রেচিতা—সুন্দররূপে উৎক্ষিপ্ত একমাত্র ভ্রূর নাম রেচিতা। এটি নৃত্তেই শুধুমাত্র প্রযোজ্য।

নিকুঞ্চিতা—একটিমাত্র বা উভয় ভ্রূ মৃদুভঙ্গযুক্ত হলে নিকুঞ্চিতা ভ্রূ হয়। এটি মোট্টায়িতে (অনুপস্থিত প্রেমিকের প্রতি নারীর নীরব ও অস্বেচ্ছাকৃত অনুরাগ প্রকাশ), কুট্টমিতে (প্রেমিকা কর্তৃক প্রেমিকের আদরের কৃত্রিম প্রত্যাখ্যান), বিলাসে, কিলকিঞ্চিতে (প্রেমিকের সম্মুখে প্রেমিকার শৃঙ্গারাশ্রিত বিক্ষোভ-রোদনাদি) প্রযোজ্য।

ভ্রূকুটি—উভয় ভ্রূ মূল থেকে উৎক্ষিপ্ত হলে ভ্রূকুটি হয়। এটি ক্রোধে প্রযোজ্য।

চতুরা—উভয় ভ্রূ সামান্য স্পন্দিত ও দীর্ঘকাল স্থির থাকলে হয় চতুরা। এটি মনোহর বস্তুতে, স্পর্শে, শৃঙ্গারে এবং কেলিতে প্রযোজ্য।

বক্ষ/হৃদয়—৫ প্রকার

সমং নির্ভুগ্নমাভুগ্নং কম্পিতোদ্বহিতে তথা।
হৃদয়ং পঞ্চধা জ্ঞেয়ং নৃত্যকর্মণি কোবিদৈঃ।। স.দা.

সম—স্বাভাবিক অবস্থায় সৌষ্ঠবযুক্ত বক্ষকে সম বলা হয়।

নির্ভুগ্ন—বক্ষ অনমনীয় (Steady) উন্নত, পৃষ্ঠ অবনমিত। এর ক্রিয়া—আত্মসম্মান, শপথ নেওয়া, অবশ অবস্থা, মান করা, বিস্ময় দৃষ্টি, সত্যকথন, উদ্ধতরূপে নিজের উল্লেখ।

অভুগ্ন—বক্ষ অবনমিত, পৃষ্ঠ উন্নত, স্কন্ধ ঈষৎ অবনমিত, কখনও কখনও শিথিল।

এর ক্রিয়া—ব্যস্ততা, বিষাদ, মূর্চ্ছা, শোক, ভয়, অসুস্থতা, ভগ্নহৃদয়, শিথিল পদার্থের স্পর্শ, বর্ষণ এবং কৃতকর্মহেতু লজ্জা।

প্রকম্পিত—ক্রমাগত বক্ষের স্ফীতি হলে প্রকম্পিত বক্ষ হয়। হাস্য, রোদন, পরিশ্রম, ত্রাস, শ্বাসকষ্ট, কাশি, হিক্কা ও দুঃখে এই বক্ষ প্রযোজ্য।

উদ্বাহিত—প্রয়োগানুসারে ঊর্দ্ধাগত বক্ষকে উদ্বাহিত বক্ষ বলে। দীর্ঘশ্বাস, উচ্চস্থিত বস্তুর দর্শন, হাইতোলা।

জঠর—৫ প্রকার

সমং পূর্ণ তথা ক্ষামমতিক্ষামং তথৈব চ।
রিক্তপূর্ণ ভবেদত্র জঠরং পঞ্চধা মতম্।। স.দা.

সম—স্বাভাবিক অবস্থা।

পূর্ণ—স্ফীতোদর পূর্ণ নামে অভিহিত।

ক্ষাম—ক্ষীণ উদর ক্ষাম নামে পরিচিত।

অতিক্ষাম—অতিক্ষীণ উদর অতিক্ষাম।

রিক্তপূর্ণ—ক্ষীণ থেকে স্ফীতোদর রিক্তপূর্ণ নামে অভিহিত।

পার্শ্বযুগ্ম (Sides) —৬ প্রকার

সম—স্বাভাবিক অবস্থা।

সমুন্নত—নতেরই অপর পার্শ্ব, কটিদেশ, পার্শ্ব, বাহু এবং স্কন্ধ উন্নত হলে সমুন্নত হবে। প্রয়োগ—পেছন দিকে যেতে করণীয়।

নত—কটিদেশ ঈষৎ অবনমিত, একটি পার্শ্ব ঈষৎ অবনমিত, একটি স্কন্ধ ঈষৎ অপসারিত। প্রয়োগ—কারুর কাছে উপস্থিতিতে করণীয়।

প্রসারিত—উভয়দিকে পার্শ্বদ্বয়ের বিস্তারহেতু প্রসারিতহয়। প্রয়োগ—হর্ষাদিতে প্রযোজ্য।

বিবর্তিত—ত্রিকের (মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ) ঘোরানো হলে বিবর্তিত হয়। প্রয়োগ—ঘোরানোতে প্রযোজ্য।

অপসৃত—বিবর্তিত অবস্থা থেকে পার্শ্বদেশ অপনীত হলে অপসৃত হয়। প্রয়োগ—প্রত্যাবর্তনে প্রযোজ্যে।

কটি—৬ প্রকার

সমা ছিন্ন বিবৃত্তা চ রেচিতা কম্পিতা তথা।
উদ্বাহিতা চেতি কটির ষড়বিধা পরিকীর্তিতা।। স.দা.

সম—স্বাভাবিক অবস্থান।

ছিন্ন—কটির মধ্যভাগে চালনা। প্রয়োগ—ব্যস্ততা।

বিবৃত্তা—পশ্চান্মুখ ব্যক্তির সম্মুখের দিকে বর্তিতা। প্রয়োগ—বিবর্তনে অর্থাৎ ঘুরতে।

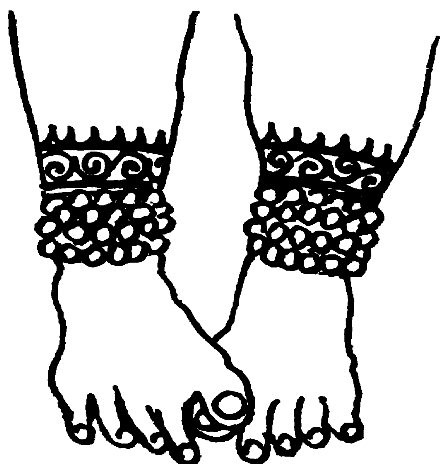
রেচিতা—সর্বদিকে সঞ্চালনে জ্ঞেয়। প্রয়োগ—সাধারণ ভাবে সঞ্চালন।

কম্পিতা—তির্যক ভাবে দ্রুত চালিত ও প্রত্যাগত কটি এই নামে অভিহিত। প্রয়োগ—কুব্জ পৃষ্ঠ ব্যক্তির, বামনের ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির চলায়।

উদ্বাহিতা—নিতম্বের পার্শ্বদেশের ধীরে ধীরে উন্নয়নে উদ্বাহিতা কটি হয়। প্রয়োগ—স্থূলবপু ব্যক্তির চলনে এবং স্ত্রীলোকের কামপূর্ণ চলনে।

স্থানক—৩৩ প্রকার (স.দা.)

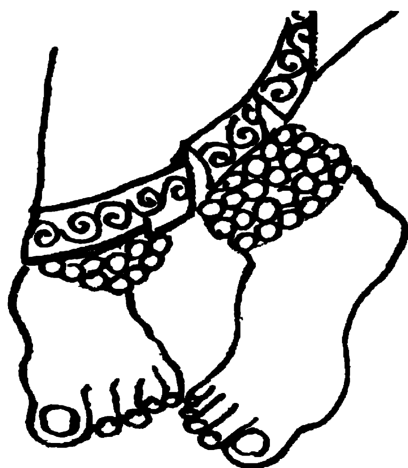
স্থানক অর্থাৎ দাঁড়ানোর ভঙ্গি। সংগীত দামোদর অনুযায়ী স্থানক ৩৩ প্রকার—সংহত, সমপাদ, স্বস্তিক, বর্ধমান, নন্দ্যাবর্ত, চতুরশ্র, পার্ষ্ণিবিদ্ধ, এক পার্শ্বগত, একজানুগত, পরাবৃত্ত, পৃষ্ঠোত্তান, দলন, এক পাদ, ব্রহ্মা, বৈষ্ণব, গরুড়, শৈব, বৃষভাসন, পার্ষ্ণিপার্শ্বগত, সমসূচী, বিষমসূচী, খণ্ডসূচী, বিশাখা, বৈতান, সংকুণ্ডল, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, অর্ধমণ্ডল, ঊর্দ্ধাসন, কমলাসন, জানুবর্তিত, মাণ্ডূক, দার্দুর।



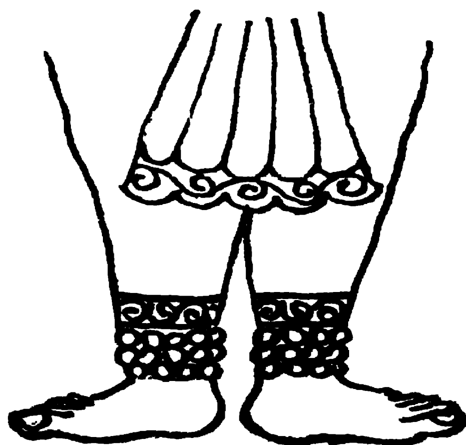
১। সংহত



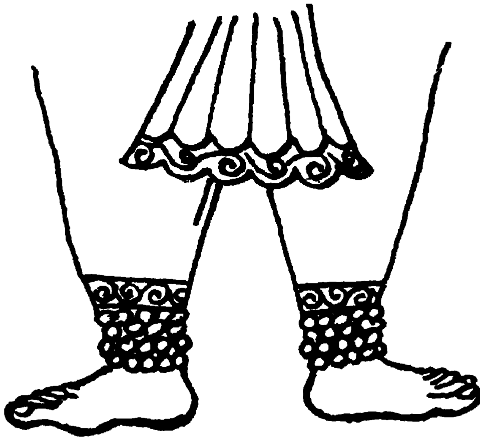
২। সমপাদ



৩। স্বস্তিক



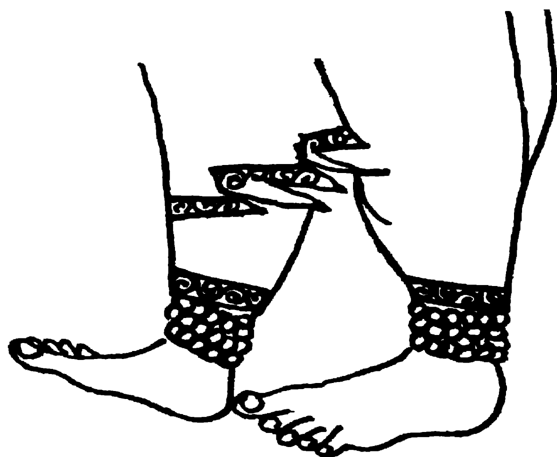
৪। বর্ধমান



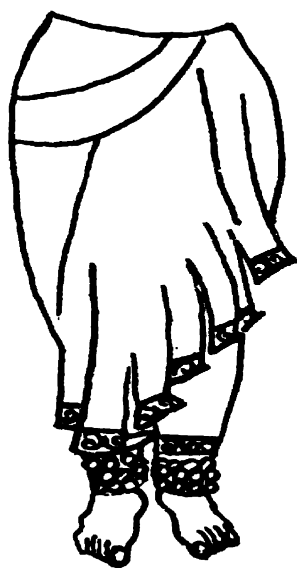
৫। নন্দ্যাবর্ত



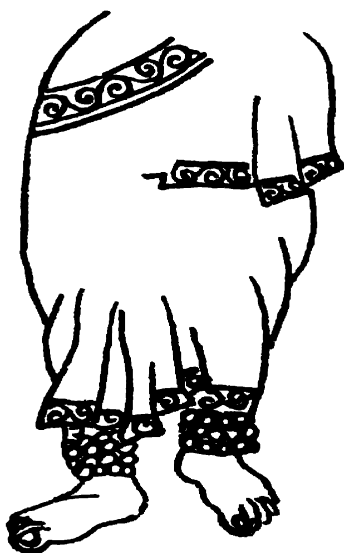
৬। চতুরশ্র



৭। পার্ষ্ণিবিদ্ধ



৮। এক পার্শ্বগত



৯। একজানুগত



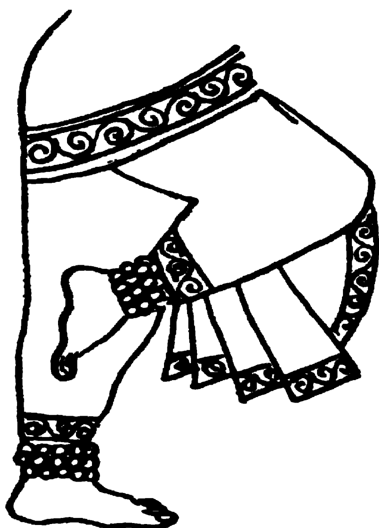
১০। পরাবৃত্ত



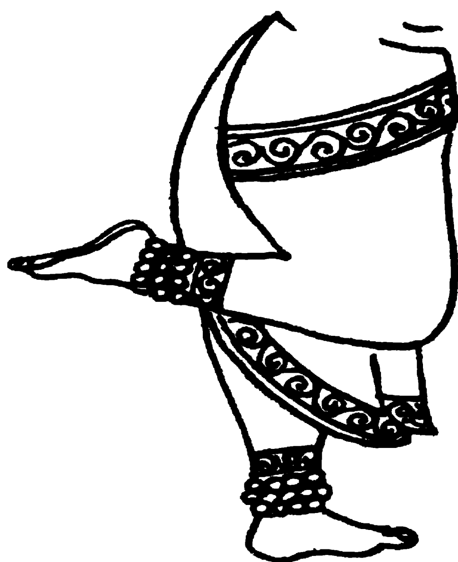
১১। পৃষ্ঠোত্তান



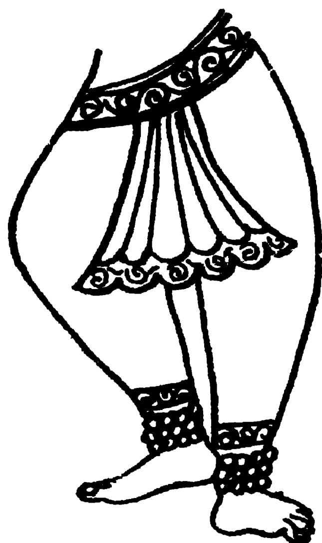
১২। দলন



১৩। একপাদ



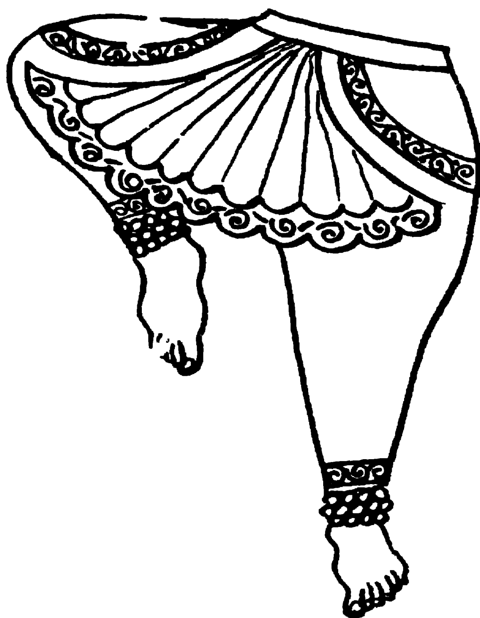
১৪। ব্রহ্মা (মতান্তরে বদ্ধপদ্মাসন হয়)



১৫। বৈষ্ণব



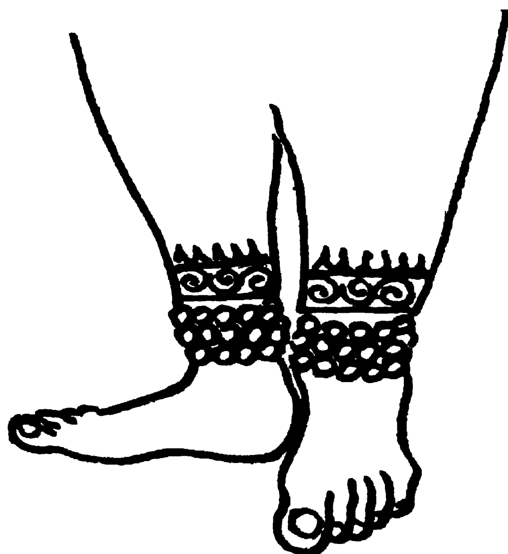
১৬। গরুড়



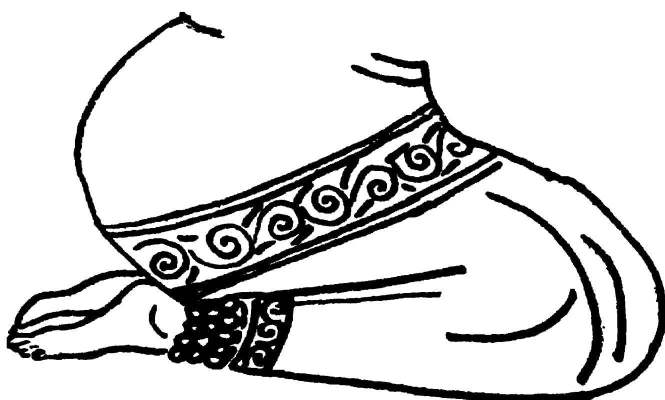
১৭। শৈব



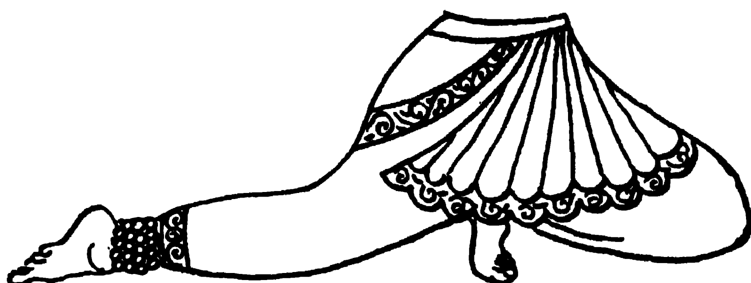
১৮। বৃষভাসন



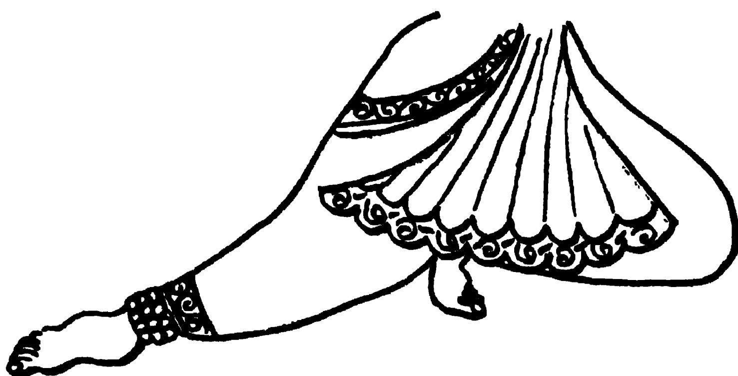
১৯। পার্ষ্ণিপার্শ্বগত



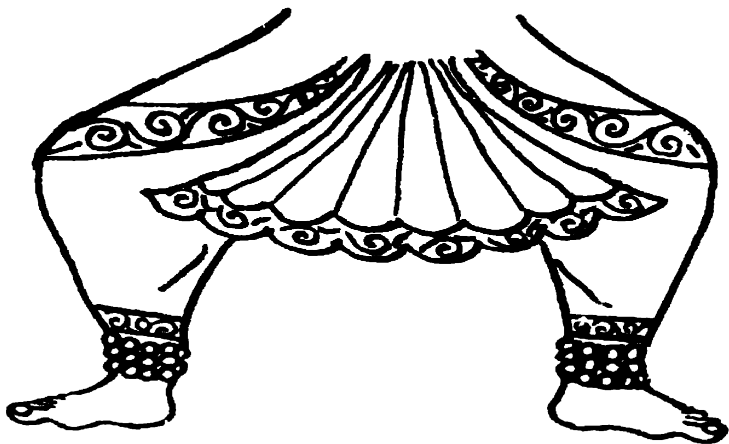
২০। সমসূচী



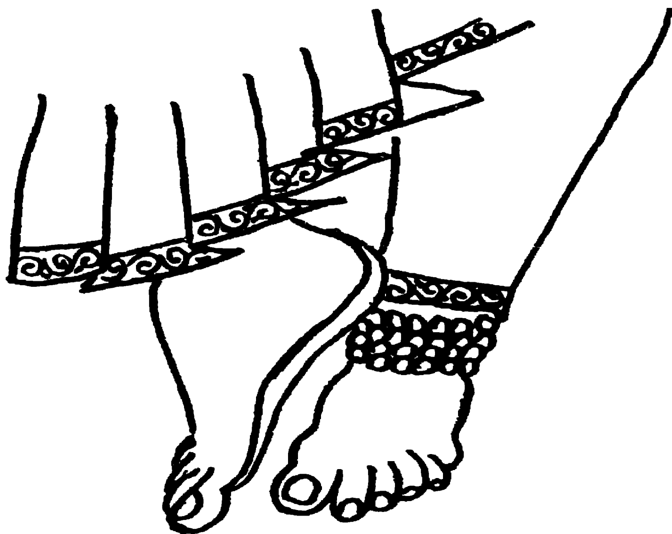
২১



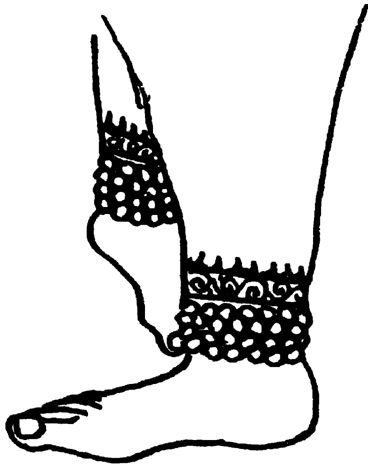
২২। খণ্ডসূচী



২৩। বিশাখা



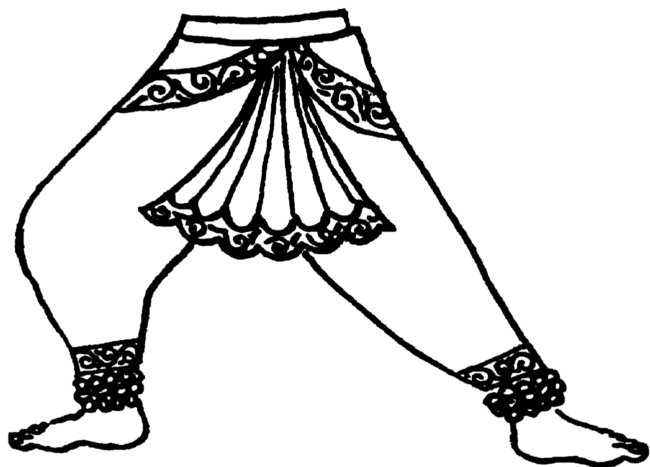
২৪। বৈতান



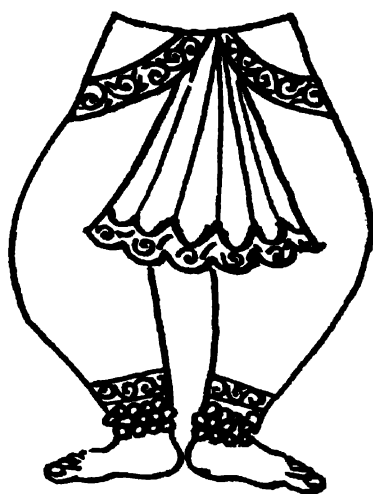
২৫। সংকুন্ডল



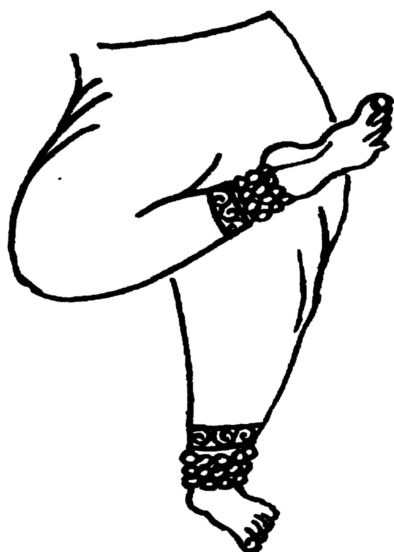
২৬। আলীঢ়



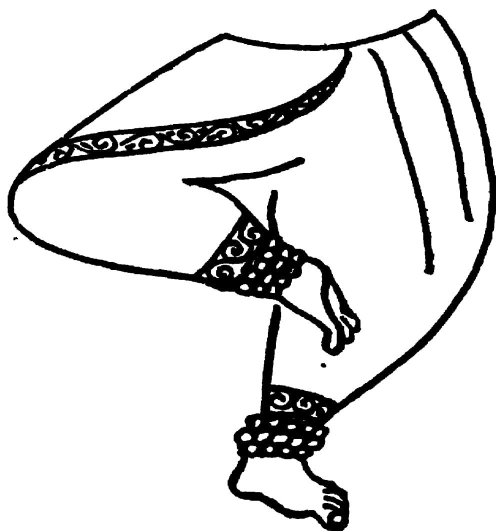
২৭। প্রত্যালীঢ়



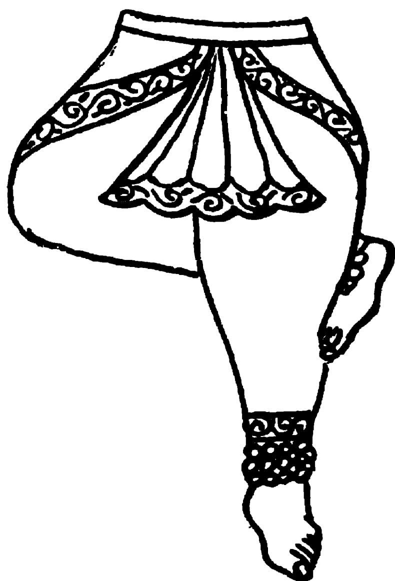
২৮। অর্ধমন্ডল



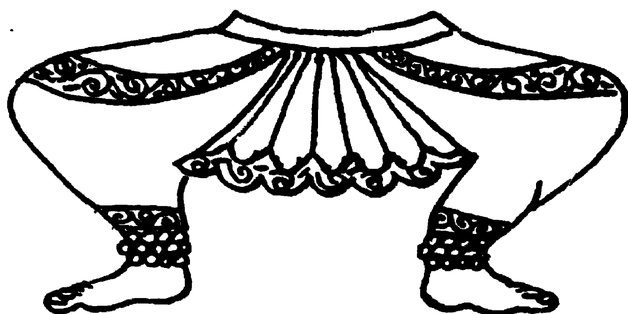
২৯। উর্দ্ধাসন



৩০। কমলাসন



৩১। জানুবর্তিত



৩২। মাণ্ডূক



৩৩। দার্দুর

চারী—২ প্রকার (স.দা.)

একপাদপ্রচারে চারী সম্পন্ন হয়। সংগীত দামোদরে চারী দুই প্রকার—ভূমিচারী ও আকাশচারী।

ভূমিচারী ২৬ প্রকার—সমনখা, নূপুরবিদ্ধা, তির্যঙমুখী, মরালা, কাতরা, কুলিরিকা, বিশ্লিষ্টা, রথচক্রিকা, পার্ষ্ণিরেচিতকা, তলদর্শিনী, গজহস্তিকা, পরাবৃত্ততলা, উরুতাড়িতা, অর্ধমন্ডলা, স্তম্ভক্রীড়নকা, হরিণত্রাসিকা, উরুরেচিকা, তলোদ্বৃত্তা, সঞ্চরিতা, স্ফুরিকা, লঙ্ঘিতজঙ্ঘিকা, সংঘট্টিতা, মদালসা, উৎকুঞ্চিতা, তীর্যককুঞ্চিতা, অপকুঞ্চিতা।

আকাশচারী ১৬ প্রকার—বিক্ষেপ, ডুমুরী, আংঘ্রিতাড়িতা, বেষ্টন, পুরঃক্ষেপা, সূচিকা, আক্ষেপা বা অপক্ষেপা, জঙ্ঘাবর্তা, বিদ্ধা, হরিণপ্লুতা, উরুজঙ্ঘাআন্দোলিতা, জঙ্ঘালজঙ্ঘনিকা, বিদ্যুৎভ্রান্তা, ভ্রমরিকা, দন্ডপাদ, উল্লোল।

করণ

শুভঙ্করের সংগীত দামোদর অনুযায়ী করণ ১০৮ প্রকার—গঙ্গাবতরণ, শকটাস্য অহিসর্পিত, লোলিত, বৃষভক্রীড়িত, উদ্‌ঘট্টিত, বিষ্কম্ভ, সম্ভ্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্তক, পরিবৃত্ত সিংহক্রীড়, উদ্‌বৃত্ত, সিংহকর্ষিত, তলসংঘট্টিত, উপসৃত, জনিত, অবহিত্থ, নিবেশ, এলকাক্রীড়িত, প্রসর্পিত, উরুবৃত্ত, করিহস্ত, স্খলিতক, নিতম্ব, প্রেঙ্খলিত, হরিণপ্লুত, উৎসর্পিত, দন্ডপাদ, গণ্ডসূচী, পার্শ্বজানু, সূচী, গৃধ্রাবলীন, সমুন্নত, অর্ধসূচী, সূচীপাদনিবৃত্তক, সূচীবৃত্ত, নিকুম্ভক, ময়ুরললিত, অপক্রান্ত, বিনিবৃত্ত, নিশুম্ভিত, পার্শ্বক্রান্ত, অতিক্রান্ত, বিবর্ত, বিদ্যুৎভ্রান্ত, গজক্রীড়, ক্রান্ত, গরুড়প্লুত, তলসংস্ফোটিত, কুঞ্চিত, চক্রমন্ডল, উরোমন্ডল, আক্ষিপ্ত, মুকুল, তলবিলাসিত, আবর্তিত, দোলপাদ, অর্ধস্বস্তিক, আঞ্চিত, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্ত, ভুজঙ্গত্রাসিত, নিকুঞ্চিত, উর্দ্ধজানু, মত্তল্লি, অর্ধমত্তল্লি, বলিত, রেচক, কুট্ট, ঘূর্ণিত,

পাদবিদ্ধক, ললিত, দন্ডপক্ষ, ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত, বিশাখরেচিত, নূপুর, ভ্রমর, চতুর, ভুজঙ্গ াঞ্চিত ছিন্নক, দন্ডরেচিত, বৃশ্চিককুট্টিত, কটিভ্রান্ত, লতাবৃশ্চিক, বৃশ্চিক, বৃশ্চিকরেচিত, ব্যংসিত, পার্শ্বকুট্টক, ললাটতিলক, অর্ধরেচিত, স্বস্তিক, কটিচ্ছিন্ন, বক্ষস্বস্তিক, উন্মত্ত, পৃষ্ঠস্বস্তিক, দিকস্বস্তিক, আলাত, লীন, কটীসম, আক্ষিপ্তরেচিত, স্বস্তিকরেচিত, মন্ডলস্বস্তিক, নিকুট্টক, বর্তিত, অর্ধনিকুট্টক, বিদ্ধ, সমনখ, তলপুষ্পপুট, বিক্ষিপ্ত।

অঙ্গহার

শুভঙ্করের সংগীত দামোদর অনুযায়ী অঙ্গহার ৩২ প্রকার। এর মধ্যে ১৬টি চতুরস্র তাল থেকে উৎপন্ন—অপরাজিত, মত্তক্রীড়, স্থিরহস্ত, ভ্রমরক, মদবিলসিত পর্যস্ত, সূচীবিদ্ধ, আক্ষিপ্তক, পরিচ্ছন্ন, পার্শ্বচ্ছেদ, পরাবৃত্ত, অপসৃতক, বিশাখরেচিত, আচ্ছুরিত, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত, আলীঢ়ক। পরবর্তী ১৬টি ত্র্যস্র তাল থেকে উৎপন্ন—অপবিদ্ধ, উদ্‌ঘটিত, বিষ্কম্ভ, বিষ্কম্ভাপসৃত, স্বস্তিকরেচিত, পার্শ্বস্বস্তিক, উদ্বৃত্ত, সম্ভ্রান্তি, রেচিত, বৃশ্চিকঅপসৃত, অলাত, মত্তস্খলিতক, উরোরেচিত, অর্ধনিকুট্ট, গতিমন্ডল, পরিবৃত্তরেচিত।

মন্ডল

মন্ডলভেদ দুই প্রকার—ভূমিমন্ডল ও আকাশিকীমন্ডল।

ভূমিমন্ডল ১০ প্রকার—ভ্রমর, শকটাস্য, সমোৎসারিত, অড্ডিত, অধ্যার্ধ, পরার্ধ, এলকাক্রীড়িত, অস্কন্দিত, আবর্ত, পিষ্টকুট্ট।

আকাশিকীমন্ডল ৮ প্রকার—দন্ডপাদ, সূচীবিদ্ধ, অলাত, বিচিত্র, বামাবিদ্ধ, বিহৃত, ললিত, লীন।

ভ্রমরী

ভ্রমরী বহু প্রকার। (স. দা., স. র., গো. লী.)

গৌড়ীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে ভ্রমরী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—চক্রভ্রমরী, কুঞ্চিতভ্রমরী, একপাদ, চৌকভ্রমরী, বিপরীত-চৌকভ্রমরী, অঙ্গভ্রমরী, বেষ্টিতভ্রমরী, উৎপ্লুত ভ্রমরী, কটিভ্রমরী, ছত্রভ্রমরী, তীর্যক ভ্রমরী, জানুভ্রমরী, আকাশভ্রমরী, উৎপ্লুত আকাশভ্রমরী ইত্যাদি।

এছাড়া ভ্রমরী দুইটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত—অন্তর্ভ্রমরী ও বাহ্যভ্রমরী।

পাদভেদ

পাদভেদ ১৩ প্রকার— সম, আঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্য, অগ্রতলসঞ্চর, মর্দিত, উদ্ঘটিত, অগ্রগ, পার্শ্বগ, পার্ষ্ণিগ, তাড়িত, উচ্ছেদ, ঘটিত। (ভ. র)

উৎপ্লবন

উৎপ্লবন ১০ প্রকার— অঞ্চিত, একপাদ, কর্তরী, ভৈরব, দন্ডপ্রণাম, অলগ, উত্তানঅলগ, অন্তরঅলগ, কুর্মালগ, লোহ্‌লী। (স. দা.)

রস

রস একপ্রকার মানসিক আস্বাদময় অবস্থা বিশেষ। পন্ডিত শুভঙ্করের সঙ্গীত দামোদরে আমরা পাই—

"শৃঙ্গার হাস্যকরুণ রৌদ্র বীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুত শান্তশ্চ নবনাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ।।

অর্থাৎ রসসংখ্যা নয়টি—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত।

বাংলার বৈষ্ণব শাস্ত্রকারেরা রসকে আরও নতুনতর বিভাগে বিভক্ত করলো। বৈষ্ণব মতে মূলরস হচ্ছে—ভক্তিরস। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন যে কৃষ্ণবিষয়িনী রতি বিভাবাদির দ্বারা পরিপুষ্টি-লাভ করে ভক্তিরসে পরিণত হয়।

"এসা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণবিভাগ, ১ লহরী) (ভ. র. সি.)

রূপ গোস্বামী ভক্তিরসের সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ

"শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ' ইত্যাদি দ্বারা জাত স্থায়ীভাব "কৃষ্ণরতি" বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিকভাব-ব্যভিচারীভাবের দ্বারা ভক্তহৃদয় আস্বাদ্য অবস্থায় আনীত হইলে তাহা ভক্তিরস হইয়া যায়।" বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতি : আলম্বন বিভাবের বিষয় কৃষ্ণ : আধার কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণের গুণ-চেষ্টা-প্রসাধন-হাস্য-বংশী প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব : নৃত্যগীত, ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, অট্টহাস্য, হিক্কা, জৃম্ভণ প্রভৃতি অনুভাব; স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিকভাব এবং নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, চিন্তা, হর্ষ, নিদ্রা, চাপল্য প্রভৃতি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব।

বিভাব

ভাব বা কৃষ্ণরতি উৎপত্তির হেতুকে বিভাব বলে। বিভাব দুই প্রকার— আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাব আবার দুই প্রকার—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণ রতির বিষয় এবং কৃষ্ণভক্তগণ আশ্রয়।

উদ্দীপন বিভাব—যে বস্তু চিত্তের ভাব উদ্দীপ্ত করে, তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, অঙ্গসৌরভ, বংশী ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাব।

অনুভাব

চিত্তস্থ ভাবের অববোধক (পরিচায়ক), বাহিরের বিক্রিয়াকে অনুভাব বলে। নৃত্য, গীত, হুংকার, অট্টহাস্য, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি অনুভাব বলে।

সাত্ত্বিকভাব

কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় রতি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে আক্রান্ত চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলা হয়। আর সত্ত্ব থেকে উৎপন্ন ভাবকে সাত্ত্বিকভাব বলা হয়।

"সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।

সাত্ত্বিক ভাব তিন প্রকার— স্নিগ্ধা, দিগ্ধা ও রুক্ষা। স্নিগ্ধা সাত্ত্বিকভাব মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পঞ্চরতি দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হলে মুখ্য স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাব হয়। আর হাস্য প্রভৃতি গৌণ সপ্তরতি দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হলে গৌণ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব। মুখ্য ও গৌণরতি ভিন্ন অন্যভাবের দ্বারা উৎপন্ন রতি চিত্তকে আক্রান্ত করলে তা হয় দিগ্ধ। ভক্ততুল্য অথচ রতিশূন্য জনের চিত্তে কখনও ঈশ্বর কথা শ্রবণে ভাবোদয় হলে তাকে রুক্ষসাত্ত্বিকভাব বলে। সাত্ত্বিকভাব আটটি—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়।

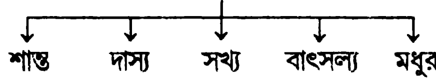
ব্যভিচারী ভাব

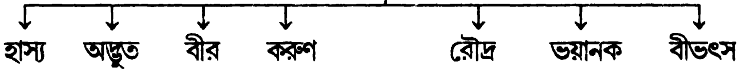
ব্যভিচারীভাব বিশেষ ভাবে অভিমুখ্যের সহিত স্থায়ীভাবের প্রতি গমনশীল (চরণ।) বাক্য, অঙ্গ ও সত্ত্ব দ্বারা সূচিত হয় এই ভাব। ভাবে গতিসঞ্চার করে বলে একে সঞ্চারী বলা হয়। ব্যভিচারীভাব তেত্রিশটি—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ।

এছাড়াও সঞ্চারীভাবের আরও বহুবিধ ভেদের কথা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে কথিত হয়েছে।

ভক্তিরস দুই প্রকার—মুখ্যভক্তিরস ও গৌণভক্তিরস।







সাত প্রকার গৌণ ভক্তিরসের আলোচনা যে কোন নৃত্য বিষয়ক গ্রন্থেই আলোচিত হয়ে থাকে। সেইজন্য এই সম্পর্কে এই গ্রন্থে আলোচিত হল না। মুখ্য ভক্তিরস নিয়েই আলোচনা করা হল।

চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত হয়েছে—

"রতিভেদে ভক্তিভেদ পঞ্চপরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর।।
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রসপঞ্চভেদ
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুররস নাম।।(২)

শান্তরস—শান্তরসকে বলা হয়েছে জ্ঞানভক্তিময় রস,

স্থায়ীভাব—শান্তরতি।

বিষয়ালম্বন বা অধিদেবতা— চতুর্ভূজ নারায়ণ।

আশ্রয়ালম্বন— শান্ত ভক্ত।

উদ্দীপন বিভাব— উপনিষদ পাঠ ও শ্রবণ নির্জ্জন স্থানে সাধনা জ্ঞানসঙ্গী ব্রহ্মসত্র ইত্যাদি।

দাস্যরস — কর্ম সমর্পণকেই কেহ কেহ দাস্য বলেন। স্থায়ীভাব দাস্যরতি। বিষয়ালম্বন—শ্রীকৃষ্ণ।

সখ্যরস—জীব গোস্বামী বলেছেন মৈত্রীরস। এর স্থায়ীভাব সখ্যরতি।

বিষয়ালম্বন বা অধিদেবতা—শ্রীকৃষ্ণ।

আশ্রয়ালম্বন— সুদাম, শ্রীদাম, অর্জুন প্রভৃতি।

সখ্যরসে উদ্দীপন বিভাব ঃ কৃষ্ণের বয়স, রূপ, বেণু, পরাক্রম, শঙ্কা প্রভৃতি।

অনুভাব— কন্দুক ক্রীড়া কৃষ্ণের সঙ্গে উপবেশন-শয়ন-নৃত্য-গীত প্রভৃতি :

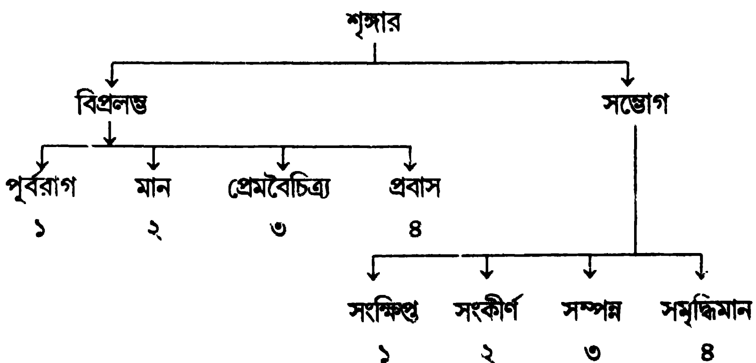
বাৎসল্য রস—এতে থাকে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে মাতা-পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক কৃষ্ণ সন্তান ভক্ত মাতা বা পিতা।

আলম্বন— কৃষ্ণ।

উদ্দীপন বিভাব— কুমার বয়স, রূপ, স্মিতহাসি, চাপল্য প্রভৃতি।

মধুর রস বা শৃঙ্গার রস— মধুর ভক্তিরসে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক কান্ত-কান্তা সম্পর্কের তুল্য। ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা। এতে শান্তের কৃষ্ণ নিষ্ঠ দাস্যের সেবা সখ্যের সংকোচ হীনতা বাৎসল্যের লালন-পালন সবই আছে। মধুররসের স্থায়ীভাব 'মধুরতি'।

বিষয় আলম্বন— নায়ক চূড়ামণি কৃষ্ণ, আশ্রয় আলম্বন বিভাব— কৃষ্ণ প্রেয়সীগণ, উদ্দীপন বিভাব— বংশীধ্বনি। মধুর রসের বিভিন্ন নাম— উজ্জ্বলরস, কান্তরস, শৃঙ্গাররস, শুচিরস। মধুররস সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—'ভক্তিরসরাজ'। শৃঙ্গার রসের দেবতা বিষ্ণু, বর্ণ শ্যাম। শৃঙ্গার দুই প্রকার—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের বিয়োগ অভীপ্সিত আলিঙ্গনাদি প্রাপ্তির জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা থাকে এই অবস্থাটি বিপ্রলম্ভ। দর্শন, আলিঙ্গন, সম্ভাষণ স্পর্শ প্রভৃতি থেকে যে সুখ ও উল্লাস হয় তা হল সম্ভোগ শৃঙ্গার। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ চারপ্রকার হয়। সেইগুলি প্রত্যেকটি আবার আট প্রকার হয়। এইভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যে শৃঙ্গারের চৌষট্টি ভেদ স্বীকৃত হয়েছে।



বিপ্রলম্ভ

প্রথম মিলনের পূর্বে অথবা মিলনের পরে নায়ক নায়িকার পারস্পরিকভাবে অভীপ্সিত আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্ত হেতু তীব্রতর হইয়া উঠিলে তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলে।

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগ: পুষ্টিমশ্মতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে ।।

(উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে শৃঙ্গারভেদ)

১। পূর্বরাগ

নায়ক নায়িকার রূপগুণাদি শ্রবণ বা দর্শনমাত্র উৎপন্ন রতিকে পূর্বরাগ বলে।

যেমন— (ক) শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন
(খ) চিত্রপট শ্রবণ।
(গ) স্বপ্ন দর্শন।
(ঘ) বন্দিমুখ শ্রবণ।
(ঙ) দূতীমুখ শ্রবণ।
(চ) সখীমুখ শ্রবণ।
(ছ) সঙ্গীত শ্রবণ।
(জ) বংশীধ্বনি শ্রবণ।

২। মান

পরস্পরানুরক্ত নায়ক ও নায়িকার আলিঙ্গন, দর্শন ইত্যাদি নিরোধকারী রোষ প্রকাশ মান। এটি দ্বিবিধ— সহেতু ও নির্হেতু। সহেতু—প্রিয় প্রতিনায়িকা বা তৎসখীগণের গুণোৎকর্ষ প্রকাশ করলে নায়িকার চিত্রে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্হেতু—অনেক সময় বিনা কারণে বা কল্পিত কারণে ও নায়ক বা নায়িকার প্রণয় মানতা প্রাপ্ত হয়। আট প্রকার কারণে মান হয়। এটি উভয়ত : পরস্পরের অপরাধের কথা— (ক) সখী মুখে শ্রবণ। (খ) শুক মুখে শ্রবণ (গ) মুরলীধ্বনি শ্রবণ (ঘ) বিপক্ষকৃত গাত্র ভোগাঙ্ক— অন্য নায়ক বা নায়িকার দেহে ভোগচিহ্ন দর্শন। (ঙ) প্রিয়গাত্র ভোগাঙ্ক— নায়কের অঙ্গে অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন দর্শন। (চ) গোত্রস্খলন— অনবধানে নায়িকার সামনে অন্য নায়িকার নাম গ্রহণ। (ছ) স্বপ্ন দর্শন—স্বপ্নে অন্য নায়িকার সঙ্গে নায়কের মিলন দর্শন অথবা বক্ষ:স্থিত কৌস্তভমণিতে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে অন্য নায়িকা ভেবে ভ্রম। (জ) অন্য নায়িকা দর্শনাদি—নায়কের অন্য স্ত্রীর সাথে বার্তালাপাদির প্রত্যক্ষ দর্শন।

৩। প্রেমবৈচিত্র্য বা প্রেমবৈচিত্ত্য

অনুরাগের আতিশয্য হেতু মিলনকালে ও বিচ্ছেদের শঙ্কা প্রেমিক প্রেমিকার চিত্তকে আর্তি ও উৎকণ্ঠায় অধীর করে তোলে এটাই প্রেমবৈচিত্র্য। অনুরাগ যত নিবিড় হয়ে ওঠে প্রেমবৈচিত্র্য তত তীব্রতর হয়।

(ক) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ—স্থানান্তরে থাকলে বিরহ কল্পনায় রাধা কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ করেন।

(খ) মুরলীর প্রতি আক্ষেপ—মুরলীধ্বনিতে বিহ্বল হয়ে রাধা কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ করেন।

(গ) নিজ প্রতি আক্ষেপ— প্রথমে নায়কের সাথে প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে পরে প্রেমের তীব্রতা বৃদ্ধিতে ব্যাকুল হয়ে অশান্তিতে নিজের প্রতি নিজে নিন্দা করেন।

(ঘ) সখীর প্রতি আক্ষেপ—নায়কের সাথে প্রেম করার জন্য অন্য সখীদের নিন্দাভাজন হওয়ায়, রাধা কৃষ্ণের কাছে সেই সখীনিন্দা শুনে স্ত্রীজাতির প্রতি আক্ষেপ করেন।

(ঙ) দূতির প্রতি আক্ষেপ— নায়কের সৌন্দর্য বর্ণনা দূতীমুখে শুনে প্রেমমগ্না হয়ে দূতীর প্রতি আক্ষেপ করে।

(চ) বিধাতার প্রতি আক্ষেপ।

(ছ) কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ—জটিলা-কুটিলাদি গুরুজন নায়কের সাথে মিলনের প্রতিবন্ধক। তাই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে গৃহত্যাগের বাসনা প্রকাশ।

৪। প্রবাস

পরস্পরানুরক্ত নায়ক ও নায়িকার মিলনের পর দেশান্তর গমনাদির দ্বারা যে বিচ্ছেদ তাহাই প্রবাস। প্রবাস দ্বিবিধ—বুদ্ধি পূর্ব ও অবুদ্ধি পূর্ব। কার্যানুরোধে স্বয়ং নায়ককৃত দেশান্তর গমনজনিত প্রবাস বুদ্ধিপূর্ব। দিব্য ও অদিব্য হেতু বশত: ইচ্ছা ব্যতিরেকে নায়কের দেশান্তর গমন জনিত প্রবাস অবুদ্ধিপূর্ব, স্থানানুসারে প্রবাস দুই প্রকার—সমীপপ্রবাস ও দূর প্রবাস।

(ক) সমীপপ্রবাস

১। কালীয়দমন—কালীয় নাগের সাথে যুদ্ধের বার্তা প্রাপ্তিতে দুঃখিতা শ্রীরাধা।

২। গোচারণ—গাভীর দল নিয়ে বনে যাওয়ায় সান্নিধ্যের অভাবজনিত দুঃখ।

৩। নন্দমোক্ষ— নন্দরাজকে বাঁচাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জলে লাফিয়ে পড়ার কথা শুনে অনিষ্ট আশংকায় দুঃখী।

৪। কার্যানুরোধ— কোন কাজে বাইরে গেলে বিরহকাতর।

৫। অন্তর্ধান—রাস মহোৎসবের মধ্যবর্তী সময়গুলিতে কৃষ্ণের সাময়িক অন্তর্ধানে কাতর।

(খ) দুরপ্রবাস

১। ভাবীপ্রবাস—কৃষ্ণকে নিয়ে যাবার জন্য অক্রুরের আগমন এবং ভাবী বিরহের সম্ভাবনায় কাতর।

২। ভবনপ্রবাস—মথুরাগমন, প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্রুরের কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে মথুরা যাত্রায় কাতর।

৩। ভূতপ্রবাস—কৃষ্ণ দ্বারকায় গেছেন এই কথা শুনে দুঃখিতা।

সম্ভোগশৃঙ্গার

পরস্পরানুরক্ত নায়ক-নায়িকার মিলনমধুর প্রেমাভিব্যক্তি সম্ভোগ।

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকুল্যন্নিষেবয়া।
যুনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে।। ১ (উঃ নীঃ মঃ, সম্ভোগ)

সম্ভোগ দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ।
জাগ্রদাবস্থায় মিলন মুখ্য সম্ভোগ। স্বপ্নে মিলন গৌণসম্ভোগ।

১। সংক্ষিপ্ত

পূর্বরাগের পর প্রথম মিলন, লজ্জা সংকোচাদির কারণে সংক্ষিপ্ত।

১। বাল্যাবস্থায় মিলন	২। গোষ্ঠে গমন কালে মিলন
৩। গোদোহন কালে মিলন	৪। অকস্মাৎ চুম্বন
৫। হস্তাকর্ষণ	৬। বস্ত্রাকর্ষণ
৭। পথরোধ	৮। রতি ভোগ

২। সংকীর্ণ

মানোত্তর মিলনে মিশ্রভাব হয়। নায়কের ভূতপূর্ব বঞ্চনায় কিছু রোষ, আবার শৃঙ্গার আসক্তিতে প্রীতি।

১। মহারস	২। জলকেলি
৩। কুঞ্জলীলা	৪। দানলীলা

৫। বংশীচুরি
৬। নৌকা বিলাস
৭। মধুপান
৮। সূর্যপূজা।

৩। সম্পন্ন সম্ভোগ

প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নায়কের সঙ্গে নায়িকার মিলন সম্পন্ন সম্ভোগ। তা দু'প্রকার অগতি ও প্রাদুর্ভাব। লৌকিক নিয়মানুসারে প্রিয়ের আগমন হলে সম্ভোগ অগতি আখ্যা লাভ করে। প্রেমবিহ্বল প্রিয়তমার সম্মুখে সহসা প্রিয়তমার আবির্ভাব হলে সম্ভোগ প্রাদুর্ভাব লাভ করে।

৪। সমৃদ্ধিমান

দৈববশতঃ অথবা অন্য কোন কারণহেতু বিযুক্ত নায়ক-নায়িকার মিলন সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ সংজ্ঞা লাভ করে।

১। স্বপ্ন বিলাস
২। কুরুক্ষেত্র মিলন
৩। ভাবোল্লাস
৪। ব্রজগমন
৬। ভোজন
৬। সহশয়ন
৭। বিপরীত সম্ভোগ
৮। স্বাধীন ভর্তৃকা

নায়কভেদ

বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে নায়িকা বহু হলেও নায়ক এক—

অনন্তগুণের আকর রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ। একই কৃষ্ণ বহু ভাবে প্রকাশিত। যেমন, তিনি কখনও পতি, কখনও উপপতি। নিত্যগুণশালী কৃষ্ণের ভক্ত-ভক্তি অনুযায়ী আধিকারিক প্রকাশ তিন প্রকার—পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ। গোকুলে তিনি পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণরূপে ব্যক্ত। নায়ক গুণকর্মভেদে চারপ্রকার—

ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত ও ধীরোদ্ধত।

ধীরোদাত্ত—যে নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, সুদৃঢ়ব্রত, গূঢ়গর্ব ও সুসত্ত্বভৃৎ (মহাবলবান) তাকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলে।

ধীরললিত—যে নায়ক বিদগ্ধ, নবতরুণ, পরিহাস নিপুণ, নিশ্চিন্ত, প্রেয়সী বশীভূত তাঁকে ধীরললিত নায়ক বলে।

ধীরপ্রশান্ত—যে নায়ক শান্ত প্রকৃতির, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক, বিনয়াদি-গুণবান তাঁকে ধীর প্রশান্ত নায়ক বলে।

ধীরোদ্ধত—যে নায়ক মাৎসর্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, রোষ পরায়ণ, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, চঞ্চল তাকে ধীরোদ্ধত নায়ক বলে।

নায়ক সংখ্যা তিন প্রকার—পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ। প্রত্যেকটি আবার চার প্রকার—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত ও ধীরোদ্ধত। প্রত্যেকে আবার দুই প্রকার—পতি ও উপপতি। তাদের প্রত্যেকে আবার চার প্রকার—অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট। অর্থাৎ নায়কভেদ মোট—১ × ৩ × ৪ × ২ × ৪ = ৯৬ প্রকার।

নায়িকাভেদ

বৈষ্ণবশাস্ত্রে কৃষ্ণবল্লভাদেরই নায়িকা বলা হয়। রূপ গোস্বামী স্তবমালায় অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত ভর্তৃকা ও স্বাধীন ভর্তৃকা—নায়িকার এই আট প্রকার বিভাগ করেছেন। তাঁর আবির্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্বে শ্রীধর দাস সদুক্তিকর্ণামৃতে বিভিন্ন অবস্থার নায়িকার মনোভাবের বর্ণনামূলক বহু শ্লোক সংগ্রহ করেছিলেন।

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি অনুসরণ করে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামগোপালদাস রসকল্পবল্লীতে (১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) ও তাঁর পুত্র পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরীতে অষ্টনায়িকার আবার প্রত্যেকের আটটি বিভাগ দেখিয়েছেন। তাঁদের রসবিশ্লেষণ চাতুর্য অসাধারণ—

১। **অভিসারিকা**—যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায় অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাকে 'অভিসারিকা' বলা হয়। অভিসারিকার আট বিভাগ সম্বন্ধে পীতাম্বর দাস লিখেছেন—

সেই অভিসার হয় অষ্টপ্রকার।
জ্যোৎস্না, তামসী, বর্ষা, দিবা-অভিসার।।
কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, সঞ্চরা।।
গীতপদ্যাস্ত্রে সর্বজনোৎকরা।।

২। **বাসকসজ্জা**—প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষায় বাসগৃহ (কুঞ্জাদি) এবং নিজের শরীরাদিকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করে অপেক্ষা করা—

ক। মোহিনী (মোহ উৎপন্নকারী)
খ। জাগৃতিকা (প্রতীক্ষায় জেগে থাকা)
গ। রুদিতা (নায়কের আগমন বিলম্বে ক্রন্দনরতা)
ঘ। মধ্যোক্তিকা (কান্ত এসে প্রিয়বাক্য বলবেন এইরূপ চিন্তা ও আলাপযুক্ত)
ঙ। সুপ্তিকা (কপট নিদ্রায় নিদ্রিতা)
চ। চকিতা (নিজাঙ্গ ছায়ায় কৃষ্ণভ্রমত্রস্তা)

ছ। সুরসা (সংগীত পরায়ণা)

জ। উদ্দেশা (দূত প্রেরণ কারিণী)

৩। **উৎকণ্ঠিতা**—প্রিয়তমের আগমনে বিলম্ব দেখে উৎকণ্ঠাযুক্তা।

ক। দুর্মতি (প্রিয় বাক্য বিশ্বাস করে পশ্চাত্তাপযুক্তা)।

খ। বিকলা (পরিতাপযুক্তা)।

গ। স্তব্ধা (চিন্তিতা)।

ঘ। উচ্চকিতা (পত্রপতনে বা অন্য কোনও আওয়াজে প্রিয়তম আসছে এই আশায় উচ্চকিত)।

ঙ। অচেতনা (দুঃখাভিভূতা)।

চ। সুখোৎকণ্ঠিতা (কৃষ্ণ ধ্যানমুগ্ধা)।

ছ। মুখরা (দূতীর সঙ্গে বৃথা কলহ)।

জ। নির্বন্ধা (স্বকর্মদোষে আক্ষেপকারী)।

৪। **বিপ্রলব্ধা**— সংকেত করে প্রিয়তম যদি না আসে, তাহলে যে নায়িকার অন্তর ব্যথিত হয় তাকে 'বিপ্রলব্ধা' বলে।

ক। বিকলা (কান্ত না আসায় সব ব্যর্থ হয়েছে এইরূপ খেদকারী)।

খ। প্রেমমত্তা (অন্য নায়িকার সাথে নায়কের মিলন হয়েছে এইরূপ আশংকাগ্রস্ত)।

গ। ক্লেশা (যিনি সব বিষয়ে কষ্ট পাচ্ছেন)।

ঘ। বিনীতা (বিলাপযুক্তা)।

ঙ। নির্দয়া (কান্তের উপর নির্দয়ত্ব আরোপকারিণী)।

চ। প্রখরা (অগ্নিতে বা যমুনায় বেশভূষাদি ও শয্যা নিক্ষেপ করতে তৎপর)।

ছ। দূত্যাদরা (দূতীর প্রতি আদর যুক্ত)।

জ। ভীতা (প্রভাত দর্শনে ভয়যুক্তা)।

৫। **খণ্ডিতা**—পূর্বসংকেতস্থানে না এসে অন্য নায়িকার সাথে সম্ভোগ চিহ্ন দেহে ধারণ করে পরবর্তী প্রভাতে নায়ক ফিরে এলে ঈর্ষায়, অপমানে, ক্রোধাদিতে কুপিতা নায়িকা 'খণ্ডিতা'।

ক। নিন্দা (কান্তকে নিন্দাকারিণী)।

খ। ক্রোধা (অনুনয়রত কান্তকে তিরস্কার কারিণী)।

গ। ভয়ানকা (কান্তকে সিন্দুর-কাজ্জলে মণ্ডিত দেখে ভীতা)।

ঘ। প্রগল্‌ভা (কান্তের সঙ্গে কলহ পরায়ণা)।

ঙ। মধ্যা (অন্য নায়িকার সম্ভোগচিহ্ন দর্শনে লজ্জিতা)।

চ। মুগ্ধা (রোষবাষ্প মৌনা)।

ছ। কম্পিতা (অমর্ষবশে রোদনপরায়ণা)।

জ। সন্তপা (কান্তের অঙ্গে ভোগচিহ্ন দর্শনে সন্তপা)।

৬। কলহান্তরিতা—প্রত্যাখ্যাত নায়কের প্রস্থানে পশ্চাত্তাপযুক্তা।

ক। আগ্রহা (আগ্রহযুক্তা নায়ককে কেন ত্যাগ করলাম, এইভাবে দুঃখিতা)।

খ। ক্ষুব্ধা (পাদপতিত নায়ককে দুর্বচন বলে পশ্চাত্তাপকারী)।

গ। ধীরা (পাদপতিত নায়ককে কেন দেখিনি এই বিষয়ে চিন্তিতা)।

ঘ। অধীরা (সখী তিরস্কৃতা)।

ঙ। কুপিতা (প্রিয়ের মিথ্যাভাষণ স্মরণে কোপযুক্তা)।

চ। সমা (কেবল কান্ত নয়, দূতী, সময় এবং নিজের ভাগ্যদোষে এই ক্লেশপ্রাপ্তি)।

ছ। মৃদুলা (পরিতাপে রোরুদ্যমানা)।

জ। বিধুরা (সখীর প্রবোধদানে আশ্বস্তা)।

৭। প্রোষিতভর্তৃকা— যার পতি প্রবাসে।

ক। ভাবি (কান্ত প্রবাসে যাবেন এই আশংকায় আশঙ্কান্বিতা)।

খ। ভবন (বর্তমান বিরহে জর্জরিতা)।

গ। ভূত (প্রিয় মথুরায়)।

ঘ। দশদশা (চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, জড়তা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু—পদাবলীতে মূর্চ্ছাই মৃত্যু নামে অভিহিত)।

ঙ। দূতসংবাদ—উদ্ধবাদি মুখে।

চ। বিলাপা—বিলাপ পরায়ণা।

ছ। সখ্যুক্তিকা—(যার সখী প্রিয়ের নিকট বিরহ বেদনা নিবেদন করে)।

জ। ভাবোল্লাসা—(ভাব সম্মিলনে উচ্ছ্বসিতা)।

৮। স্বাধীনভর্তৃকা—যার প্রিয় নায়িকার বশীভূত হয়ে সর্বদাই সঙ্গে থাকে।

ক। কোপনা (বিলাসে মিথ্যা-রুষ্টা)।

খ। মানিনী (নায়কের অঙ্গে নিজকৃত মানচিহ্ন দর্শনে মানিনী)।

গ। মুগ্ধা (নায়ক যার বেশবিন্যাসাদি করে)।

ঘ। মধ্যা (যার কাছে নায়ক কৃতজ্ঞ)।

ঙ। সমুক্তিকা (সম্যক উক্তিকারী)।

চ। সোল্লাসা (কান্তের ব্যবহারে আনন্দিতা)।

ছ। অনুকূলা (নায়ক যার অনুকূল)।

জ। অভিষিক্তা (অভিষেক করে নায়ক যার চামর ব্যজনাদি করেন)।

শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ

বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের শাস্ত্রগ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে বাংলারই সংগীত শাস্ত্রকারেরা লিখে গেছেন। সর্বভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেবে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য চারটি শাস্ত্র গ্রন্থে গৌড়বঙ্গের সংগীত সম্পর্কে আলোচনার উল্লেখ পাই।

নীচে ক্রমানুসারে সর্বভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলি যেখানে গৌড়ীয় সংগীতের (গীত-বাদ্য-নৃত্য) উল্লেখ আছে এবং বাংলার সংগীত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের তালিকা দেওয়া হল।

	শাস্ত্রগ্রন্থ	আনু: রচনাকাল	রচয়িতা
১।	নাট্যশাস্ত্র	খৃ: পূ: ২০০-২০০খৃষ্টাব্দ	ভরতমুনি।
২।	বৃহদ্দেশী	৫০০-৭০০ খৃ:	মতঙ্গমুনি।
৩।	সংগীত রত্নাকর	১২২৭-১২৩৫ খৃ:	শার্ঙ্গদেব।
৪।	অভিনয় চন্দ্রিকা (উড়িষ্যার)	অষ্টাদশশতক	মহেশ্বর মহাপাত্র।

(বাংলার শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ) ঃ

১।	গীতগোবিন্দ	দ্বাদশ শতক	কবি জয়দেব।
২।	সংগীত দামোদর	ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক	পন্ডিত শুভঙ্কর।
৩।	শ্রীহস্তমুক্তাবলী	ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক	পন্ডিত শুভঙ্কর।
৪।	নাটক চন্দ্রিকা	পঞ্চদশ শতক	রূপ গোস্বামী।
৫।	উজ্জ্বল নীলমণি	,,	,,
৬।	ভক্তিরসামৃত সিন্ধু	,,	,,
৭।	রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা	পঞ্চদশ শতক	রূপ গোস্বামী
৮।	আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ	,,	কবিকর্ণপূর।
৯।	অলঙ্কার কৌস্তভ	,,	,,
১০।	গোপাল চম্পূ	,,	শ্রী জীবগোস্বামী।
১১।	নাটক লক্ষণরত্নকোশ	,,	সাগর নন্দী।
১২।	নারদ পঞ্চমসার সংহিতা	ষোড়শ শতক	নারদকৃত।

১৩। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতম্	ষোড়শ শতক	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ
১৪। সংগীত দামোদর	”	দামোদর সেন।
১৫। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুবিন্দু	”	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
১৬। নায়িকা রত্নমালা	সপ্তদশ শতক	চন্দ্রশেখর-শশী শেখর
১৭। রসমঞ্জরী	”	পীতাম্বর দাস।
১৮। রসকল্পাবলী	”	রামগোপাল দাস।
১৯। ক্ষণদাগীত চিন্তামণি	”	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
২০। কৃষ্ণভাবনামৃতম্	”	”
২১। ভক্তিরত্নাকর	অষ্টাদশ শতক	নরহরি চক্রবর্ত্তী।
২২। রাগরত্নাকব	”	”
২৩। সংগীতসার সংগ্রহ	”	”
২৪। গীতচন্দ্রোদয়	”	”
২৫। পদামৃত সমুদ্র	”	”

ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ ঃ

নাট্যশাস্ত্র—নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী সারা ভারতে চার ধরণের নাট্য ধারার প্রচলন ছিল—দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী, আবন্তী ও ওড্রমাগধী। এরমধ্যে গৌড়বঙ্গে ওড্র-মাগধী রীতির প্রচলন ছিল। এই ওড্রমাগধী কীভাবে প্রযুক্ত হত, গৌড়বঙ্গের শিল্পীরা কীভাবে আহার্য অভিনয় করত তারও বর্ণনা আছে। অর্থাৎ ২০০০ বছর আগের এই শাস্ত্রগ্রন্থটি বাংলার সংগীতের (গীত-বাদ্য-নৃত্য) একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

বৃহদ্দেশী—মতঙ্গমুনি প্রণীত 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে আমরা গৌড় রাগরাগিনী, বঙ্গাল রাগের সঙ্গে নবরসযুক্ত নৃত্যাভিনয় তথা নাট্যাভিনয় নবরসের উল্লেখ পাই। বৃহদ্দেশীর পূর্বে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে যাষ্টিক মুনি 'গৌড়' রাগের কথা উল্লেখ করেছেন। বৃহদ্দেশীতে আমরা সর্বভারতীয় ভাবে সপ্তগীতির উল্লেখ পাই, তন্মধ্যে গৌড় গীত রীতি একটি বিশিষ্ট রীতি রূপে চিহ্নিত।

সংগীতরত্নাকর—সংগীত রত্নাকরে আমরা পাই—ভারতবর্ষে পাঁচরকম প্রবন্ধ সংগীতের প্রচলন ছিল—লাট, কর্ণাট, গৌড়, অন্ধ্র ও দ্রাবিড়। অর্থাৎ গৌড় প্রবন্ধের প্রচলন দিয়ে তৎকালীন বাংলায় সংগীতের শাস্ত্রীয় রূপটি পরিষ্কার বোঝা যায়।

অভিনয় চন্দ্রিকা—সপ্তদশ শতকের উড়িষ্যার সংগীত শাস্ত্র গ্রন্থ। সেখানে তৎকালীন ভারতবর্ষের ৭ রকম শাস্ত্রীয় শৈলীর উল্লেখ আছে, তার মধ্যে 'গৌড়' একটি শৈলী।

বাংলার শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ ঃ

গীতগোবিন্দ—দ্বাদশ শতকে গৌড় রাজা লক্ষ্মণ সেনের দরবারে পঞ্চরত্ন ছিলেন—শরণ, ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব। এই জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ তৎকালীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই জয়দেবের গীতগোবিন্দ সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন চারুকলায়, সাহিত্যে, বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। শাস্ত্রীয় এবং লোক উভয় নৃত্যধারাই 'গীতগোবিন্দ' আধার করে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী পরিবেশিত হয়।

দশাবতার ভাস্কর্যের প্রাধান্য বাংলায় ৭ম শতক থেকে ১৮দশ শতক পর্যন্ত প্রবল ভাবে দেখা যায়। দ্বাদশ শতকের গীতগোবিন্দে এই দশাবতার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এবং যা সর্বভারত ব্যাপী নৃত্য-চিত্র ও ভাস্কর্য কলা গ্রহণ করেছে।

নিচের ছবিটি দিল্লীর National Museum এ সংরক্ষিত আছে। এটি ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের চিত্র শিল্পী দ্বারা অঙ্কিত যেখানে লক্ষ্মণ সেনের দরবারের 'পঞ্চরত্নে'র নামাঙ্কিত ছবি অঙ্কিত। অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের দরবারের পঞ্চরত্নের খ্যাতি এতদূর পৌঁছেছিল যে ষোড়শ শতকে গুজরাটের এক চিত্রকরও তাঁর চিত্রশিল্পে পঞ্চরত্নকে স্থান দিয়েছেন।



জয়দেব ও অন্যান্য কবিদের অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের দরবারে পঞ্চকবির নামাঙ্কিত মিনিয়েচার চিত্র, দিল্লীর National Museum বা রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালা।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ পৃথিবীতে ৫০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরীর কে.বাসুদেব শাস্ত্রী কর্তৃক ১৯৫০ সালে প্রথম সম্পাদিত নৃত্য লক্ষণ সহিত গীতগোবিন্দ পাই। যেখানে ভূমিকায় পরিষ্কার ভাবে বলা আছে—"It is extremely probable that this work was composed by the direct disciples of Sri Jayadeva himself or those just after them. The gestures that are found in this work are simple, highly expressive and graceful and they followed the technique laid down by Bharata in the Natya Shastra. The movements and gestures chiefly to be found in this work are included in the 24 Asamyuta hastas (Single hand), 13 Samyuta hastas (double hands). The 4 hasta Karanas (winding movements) and the 13 movements of the head." এই কাজ সম্ভবত জয়দেবের সরাসরি শিষ্য বা তাঁর শিষ্য দ্বারা কৃত। আঙ্গিকাভিনয় অত্যন্ত সরল। লাবণ্যযুক্ত ও অভিব্যক্তিপূর্ণ, নাট্যশাস্ত্রানুসারী। এই গ্রন্থে দেখা যায় ২৪টি অসংযুত হস্ত, ১৩টি সংযুত হস্ত, ৪টি হস্তকরণ এবং ১৩টি শিরভেদ।

গীতগোবিন্দ যদিও শাস্ত্র গ্রন্থ নয়, একটি কাব্যগ্রন্থ, তবুও শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই গীতগোবিন্দ, যেটি সরস্বতী মহল লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গীতগোবিন্দের শ্লোকের একটি ছোট অংশের নমুনা নীচে দেওয়া হল।

"মেঘৈ মের্দুরমম্বরং বনুভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ"

মেঘৈ মের্দুরং—তীর্যক প্রসারিত শনৈরুর্দ্ধমিলিতাধস্তলপতাকাভ্যাম্।

অম্বরং—স্বস্তিকীকৃতোর্ধ বিস্তারিত পতাকাভ্যাম্।

বনভুবঃ—চলদুর্ধগতত্রিপতাকভ্যাং বিচ্যুতস্বস্তিকেন পুনস্তলদর্শিত পতাকেন।

শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ—উর্দ্ধবিস্তারিতচলৎসংন্দশেন চলদুর্দ্ধগতাত্রিপতাকাভ্যাম্।

গী. গো.

শ্রীহস্ত মুক্তাবলী ও সংগীত দামোদর—ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতকে উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র লাহিড়ী পরিবারভুক্ত পন্ডিত শুভঙ্কর রচিত সংগীত দামোদর গৌড়ীয় নৃত্যের এক আকর গ্রন্থ। সংগীতদামোদর বইটিতে গীত-বাদ্য-নৃত্য ছাড়াও রস শাস্ত্রের সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংগীত শাস্ত্রগুলি সমস্তই সংগীত দামোদর অনুসরণ করে রচিত। এই গ্রন্থখানিতে কৃষ্ণকেই নৃত্য-গীত-নাট্যের মূলরূপে দেখানো হয়েছে। এখানে নৃত্য শিখবার নানা নিয়ম কানুনের কথাও আছে। পন্ডিত শুভঙ্কর রচিত আর একটি হস্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'শ্রীহস্তমুক্তাবলী'। বাঙালি সংগীত

শাস্ত্রকারের রচিত এই গ্রন্থ দুটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সবচেয়ে সমাদৃত। শ্রী-হস্তমুক্তাবলীতে হস্তমুদ্রার বিনিয়োগ ভারতবর্ষের অন্যান্য শাস্ত্রের মতোই আছে। এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য দিক হল শ্লোক সমেত কীভাবে প্রতিটি বিনিয়োগ প্রযুক্ত হবে তাও বর্ণিত আছে। সংক্ষেপে একটি উদাহরণ রাখছি—যেমন পতাক হস্ত।

"জলে জগতি লজ্জায়াং সংখ্যায়াং রূপকে বনে।
নূপুরে চরণে মৌলৌ ভালে ধ্যানে চ ভূষণে।। শ্রী. হ. মু.

প্রতিটি বিনিয়োগ কি ভাবে হবে তারও বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে—

জল—মনাগ্‌বৃদ্ধো লম্বমানঃ পতাকঃ তলকুঞ্চিতঃ।
কিঞ্চিদ্দোলায়মানঃ সন্‌হস্ত এষ জলে মতঃ।।

পতাক হস্ত অবস্থায় করতল কুঞ্চিত করে কিঞ্চিৎ দোলায়মান দ্বারা জল বোঝান হয়।

জগত—বামস্কন্ধাদ্ যদা যাতি দক্ষিণং দক্ষিণঃ করঃ।
তদা জগতি নৃত্যজ্ঞৈঃ কথিতো হস্ত ঈদৃশঃ।। শ্রী. হ. মু.

বাম স্কন্ধ থেকে যদি দক্ষিণ করে পতাক হস্ত অবস্থায় দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করা হয় তবে নৃত্য জ্ঞানীরা তাকেই জগত বলে। অর্থাৎ প্রতিটি বিনিয়োগের বিস্তৃত সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। এই দুটি গ্রন্থই গৌড়ীয় নৃত্যের মূল শাস্ত্রীয় আকর গ্রন্থ, এক অমূল্য সম্পদ।

নাটকচন্দ্রিকা—পঞ্চদশ শতকে রূপ গোস্বামী রচিত। এই গ্রন্থে দশবিধ রূপকের মধ্যে একটি রূপক নাটকের আলোচনা রূপ গোস্বামী বিস্তৃতভাবে করেছেন।

উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—পঞ্চদশ শতকের বিশেষজ্ঞ শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বিষয়ক অমূল্য গ্রন্থ। বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রকারগণ নাট্যশাস্ত্রের আটটি রসের পরিবর্তে পাঁচটি মুখ্যভক্তি রস যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এবং ৭টি গৌণভক্তি রস—হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত স্বীকার করেছেন। শৃঙ্গার রসের ৬৪টি ভেদ অর্থাৎ ৩২টি সম্ভোগ ও ৩২টি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার ব্যাখ্যা করেছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্ত চিত্তের উপলব্ধি প্রকট হয়েছে। রসশাস্ত্রে উজ্জ্বলরসের প্রাধান্য হেতু 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা—পঞ্চদশ শতকের রূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থ। এখানে নৃত্যের বেশভূষা অর্থাৎ আহার্য অভিনয়ের এবং নাট্যের চরিত্রের সুন্দর বর্ণনা পাই।

দানকেলিকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব—রূপ গোস্বামী রচিত তিনটি নাট্যগ্রন্থ, 'দানকেলিকৌমুদী' একটি 'ভানিকা' শ্রেণীর উপরূপক। 'বিদগ্ধমাধব' সপ্তাঙ্ক নাট্য। এই ৭টি অঙ্ক যথাক্রমে—বেণুনাদ বিলাস, মন্মথলেক, শ্রীরাধাসঙ্গম, বেণুহরণ, রাধাপ্রসাধন, শারদ্বিহার, গৌরীতীর্থ বিহার। এতে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য দেখা যায়। 'ললিতমাধব' দশাঙ্ক নাট্য।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ও অলঙ্কারকৌস্তুভ—পঞ্চদশ শতকের কবিকর্ণপূর রচিত উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি। এঁর প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। 'অলঙ্কার কৌস্তুভ'-এ দশটি কিরণে বহুবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে 'রসভাবতত্ত্বেদ' উল্লেখযোগ্য। 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'র বিংশতিস্তবক নৃত্য-গীত-বাদ্য সম্পর্কিত শাস্ত্রের বর্ণনায় সমুজ্জ্বল। এছাড়া কবিকর্ণপূর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক একটি দশাঙ্ক নাট্য এবং 'পারিজাতহরণ' নামক আঠারোটি সর্গের মহাকাব্য রচনা করেছিলেন যা নৃত্যোপযোগী।

গোপালচম্পূ—আনুমানিক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের কবি জীবগোস্বামী রচিত। ইনি রূপগোস্বামীর ভ্রাতা অনুপমের পুত্র। গোপালচম্পূ ৭০টি অধ্যায়ে রচিত প্রকাণ্ড কাব্য। কাব্যটি পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বার্ধে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা—এখানে নৃত্যের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও আছে।

নারদপঞ্চমসারসংহিতা—ষোড়শ শতকের নারদকৃত সংগীত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, যেখানে ১৭ নম্বর শ্লোকে রাঢ়দেশের নটদের উত্তম অভিহিত করা হয়েছে। তাঁরা গীত-বাদ্য-নৃত্য ও কাব্যবর্ণনে পটু ছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

সংগীতদামোদর—ষোড়শ শতকের দামোদর সেন বিরচিত অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ। এটির প্রথম অধ্যায় বন্দনামূলক। দ্বিতীয় অধ্যায় গৌড়তাল সমূহের দশাবতার প্রবন্ধ নৃত্যের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। গ্রন্থটি শেষ হয়েছে প্রবন্ধনৃত্য এবং প্রবন্ধবাদ্যের বর্ণনা দিয়ে।

গোবিন্দলীলামৃতম—বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামের ষোড়শ শতকের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'গোবিন্দলীলামৃতমের' ২২ ও ২৩ সর্গে শাস্ত্রীয় নৃত্যের বর্ণনায় তৎকালীন প্রচলিত নৃত্যের বিশেষত রাসনৃত্যের একটি সুন্দর শাস্ত্রীয় চিত্র পাওয়া যায়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু—সপ্তদশ শতকের কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রচিত বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু'।

নায়িকারত্নমালা—সপ্তদশ শতকের চন্দ্রশেখর শশীশেখর কৃত 'নায়িকারত্নমালা'। এখানে অষ্টনায়িকার ৬৪টি ভেদের সুন্দর গীত সহ আহার্যের বর্ণনা আছে।

রসমঞ্জরী—সপ্তদশ শতকের পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, রসশাস্ত্রের একটি অপূর্ব গ্রন্থ।

রসকল্পবল্লী— পীতাম্বর দাসের পুত্র রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'ও রসশাস্ত্রের একটি আকর গ্রন্থ।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ও কৃষ্ণভাবনামৃতম—নৃত্যোপযোগী দু'টি গ্রন্থই সপ্তদশ শতকের বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রচিত।

ভক্তিরত্নাকর—অষ্টাদশ শতকের নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত। গ্রন্থটির পঞ্চম তরঙ্গে গীত-বাদ্য-নৃত্যের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ গৌড়ীয় নৃত্যের এক অপূর্ব শাস্ত্র গ্রন্থ।

রাগরত্নাকর—শাস্ত্রীয় নৃত্যে ব্যবহৃত গানের তত্ত্ব আলোচিত। রচনাকার অষ্টাদশ শতকের নরহরি চক্রবর্ত্তী।

সংগীতসারসংগ্রহ—এটিও অষ্টাদশ শতকের নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত গীত-বাদ্য-নৃত্যের বর্ণনা-ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

গীতচন্দ্রোদয়—ঘনশ্যাম ঠাকুর ছদ্মনামে অষ্টাদশ শতকে নরহরি চক্রবর্ত্তী অনেকগুলি সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেগুলি বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থটিতে বাংলার ১০১টি শাস্ত্রীয় তাল ছাড়া রাগ প্রবন্ধ গীতের বর্ণনা আছে।

পদামৃতসমুদ্র—বৈষ্ণবদর্শনে রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য তথা অষ্টাদশ শতকের রাধামোহন ঠাকুর বিরচিত গ্রন্থটি নৃত্যের, রাগের, তালের বর্ণনায় অনবদ্য।

উপরি উল্লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ছাড়াও আরও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। উল্লেখযোগ্যগুলির সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হল। যেমন রসশাস্ত্রের আরও অপূর্ব গ্রন্থ রসসুধার্ণব, রসামৃতশেষ। এ ছাড়া প্রয়াত মণিপুরী নৃত্যগুরু বিপিন সিং বলতেন বাংলার বহু শাস্ত্র গ্রন্থ এখনও মণিপুরে আছে যা অনেক বাঙালিই জানেন না। এই সব গ্রন্থ অবলম্বনেই মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্যটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে।[১]

এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের সুদৃঢ় উল্লেখ আছে। এছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটি সেটি হল বাংলার অফুরন্ত শাস্ত্র গ্রন্থের ভান্ডার যার রচয়িতারা সকলেই এই গৌড়বঙ্গের বলে দাবী করা যায়। অর্থাৎ বাংলায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাই সংগীতশাস্ত্রজ্ঞরা শাস্ত্রসম্বন্ধীয় এত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

১। শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্তন, দর্শনা কাবেরী ও কলাবতী দেবী, মণিপুরী নর্তনালয়, ১৯৯৩।

নৃত্ত-নৃত্য-নাট্য

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় নর্তন তিন ভাগে বিভক্ত—নৃত্ত, নৃত্য এবং নাট্য।

'নৃত্ত' অর্থাৎ তালের সঙ্গে ভাবাভিনয় ব্যতিরেকে নৃত্তহস্ত সহযোগে বিশুদ্ধ অঙ্গ চালনা। 'নৃত্য' অর্থাৎ ভাবাভিনয়—নৃত্যহস্ত সহযোগে নৃত্যশিল্পী যে দেহব্যঞ্জনা ব্যক্ত করে তাই 'নৃত্য'। 'নাট্য' অর্থাৎ নৃত্য-গীত-অভিনয় সংপৃক্ত হয়ে পৌরাণিক আখ্যানের নাটকীয় উপস্থাপনা। শাস্ত্রীয় গৌড়ীয় নৃত্যকলা— নৃত্ত, নৃত্য এবং নাট্য এই তিনটি উপাদান দ্বারা প্রভূতভাবে সমৃদ্ধ। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে 'শিবকরণ' এবং বাংলার শাস্ত্র গ্রন্থ 'সংগীত দামোদর'-এর চতুর্থ অধ্যায়ে 'বিষ্ণুকরণ' অর্থাৎ ১০৮টি 'করণ' এর বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

শুদ্ধনৃত্ত মূল দুটি বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—**তাল** এটি কাল বা সময় পরিমাপক, অন্যটি **লয়** অর্থাৎ গতি সংপৃক্ত। গৌড়ীয় নৃত্যের একককে অর্থাৎ প্রাথমিক পদসঞ্চারকে **'নৃত্তাঙ্গ'** বলে। নৃত্তাঙ্গের মূল ভিত্তি তিনটি—নৃত্তহস্ত, স্থানক, চারী।

গৌড়ীয় নৃত্যের **'নৃত্ত'** পর্যায়ভুক্ত অংশগুলি—প্রবন্ধনৃত্ত, আলাপচারী, আরতিনৃত্ত, মৃদঙ্গনৃত্ত এবং মহাজনপদ বা পালানৃত্যের 'প্রস্তার' বা 'যতি'গুলি। 'গৌড়ীয় নৃত্য' শিখতে গেলে যে কোনও শিক্ষার্থীকে অঙ্গশুদ্ধির জন্য শিখতে হয় বহু সংখ্যক প্রাথমিক 'পদসঞ্চার শিক্ষাবিধি' বা 'নৃত্তাঙ্গ', তিন লয়ে—বিলম্বিত, মধ্যম, দ্রুত—করার অভ্যাস।

নৃত্তাঙ্গের শ্রেণী বিভাগ—

১। বিশাখ/চৌক	—	বিশাখ স্থানকে সমপাদ বিভিন্নপ্রকার নৃত্তাঙ্গ।
২। উৎপ্লবন বিশাখ বা চৌক	—	লাফিয়ে বিশাখ স্থানকে বিভিন্ন ভাবে আঘাত।
৩। উচ্চণ্ড	—	বিশাখ স্থানকে ঊর্দ্ধমণ্ডলীহস্ত সহযোগে তাণ্ডবাঙ্গের নৃত্য।
৪। রেখা বা মধুর	—	উরুতাড়িতা চারী এবং নলিনীপদ্মকোশক হস্ত সহযোগে নৃত্তাঙ্গটি নিষ্পন্ন হয়। অঙ্গ উদ্গার বা উদ্গত হবে।
৫। মূর্চ্ছন বা কাটান	—	নৃত্তপ্রস্তার সমাপ্তি সূচক নৃত্তাঙ্গ। এটি তিনপ্রকার—
ক। নটি	—	বৈতান-বিশাখ স্থানকে কর, চরণ, কটি—একত্রে চালিত করে নলিনী পদ্মকোশ এবং নিতম্ব হস্তসহযোগে।

খ। রঙ্গণ	—	বৈতান-বিশাখক স্থানকে কুচ্চালন যুক্ত অঙ্গ বিবর্তিত হবে এই নৃত্তাঙ্গটিতে।
গ। নতি	—	উদ্‌ঘাটিত-বিশাখক স্থানকে গাত্র ও মস্তক প্রাথমিকভাবে অবনত হবে ও তির্যক ভাবে উন্নত হবে।
৬। দ্যোতিত	—	উদ্‌ঘাটিত পদে রেচিত নৃত্তহস্তসহযোগে, লাস্যাঙ্গ নৃত্ত।
৭। চালি	—	কটি, কর এবং বাহু ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকারের হস্তসহযোগে চাল বা চলন।
৮। উপবিষ্ট	—	উৎপ্লবন সহ উপবেশন নৃত্তাঙ্গ।
৯। ঘষক	—	ললিতভাবে পার্শ্বসরণ চাল।
১০।তুক	—	ভ্রূ, নেত্র, অধর, পক্ষপ্রদ্যোতক হস্ত সঞ্চালন সহযোগে আবর্তন।
১১।ভ্রমরী	—	বিবিধ প্রকার পাক বা আবর্তন সহযোগে নৃত্তাঙ্গ।
১২।মান্ডলী	—	অষ্টজাতিতে বিভিন্ন প্রকার তান্ডব ও লাস্য নৃত্তাঙ্গ।
১৩। বিচিত্র লাস্যাঙ্গ	—	অঙ্গউদ্‌গার সহযোগে নলিনীপদ্মকোশক হস্ত সহযোগে খন্ডসূচী স্থানক যুক্ত নৃত্তাঙ্গ।
১৪।বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তা	—	বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তা তান্ডবাঙ্গের নৃত্তাঙ্গ।

পূর্বেই পাদভেদ, চারী, স্থানক এবং নৃত্ত হস্ত ব্যাখ্যাত হয়েছে। নৃত্তাঙ্গগুলি সমস্তই এগুলির ওপর আধার করে নির্মিত। নৃত্তাঙ্গগুলি গায়ে তেল মেখে লঘু আহার করে অভ্যাস করতে হয়। (স.দা. ৪র্থ স্তবক)

শিক্ষারম্ভ

নৃত্যশিক্ষারম্ভে নর্তক বা নর্তকীকে শুভদিনে বিশেষ উৎসবের মাধ্যমে শুরু করতে হত। কস্তুরী ও চন্দনাদি সুগন্ধী অনুলেপন, সুগন্ধী শ্বেতপুষ্প, ধূপ, আরাত্রিক, তাম্বুল ইত্যাদি দ্বারা রঙ্গমঞ্চ এবং উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ করতাল ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ দিয়ে পূজা করে নর্তকী নৃত্য শুরু করবেন।

সংগীত রত্নাকরে এর বর্ণনা পাই—

"বিঘ্নেশং ভারতীং দেবীং ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাণ।
রঙ্গতদ্দেবতা স্তালবাদ্য ভান্ডানি চ ক্রমাৎ।। ১২২৭

উপাধ্যায়ং নৃত্তকন্যাঃ স্তম্ভযুগ্মং চ দন্তিকাম্।
কস্তুরীকাচন্দনাদৈঃ সামোদৈবনুলেপনৈঃ।। ১২২৮
শুভ্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ পুষ্পৈর্ধূপৈরারাত্রিকৈরপি।
নৈবেদৈর্বি বিধৈর্বস্ত্রৈ স্তাম্বুলৈর্ব লিভিস্তথা।। ১২২৯
অর্চয়িত্বা শুভ লগ্নে প্রারভেত শ্রমংসুধীঃ।[১]

এই পদ্ধতিগুলি বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে। তবে বাংলার গুরু পরম্পরা নৃত্যে কিছুটা রয়ে গেছে। যেমন কীর্তন, নাচনী, ছৌ ইত্যাদি। যখন গুরু গম্ভীর সিংমুড়া বা শশী মাহাতোর কাছে শিখেছি তখন এগুলি কৃত হয়েছিল অর্থাৎ কীর্তন নৃত্য শুরুর আগেও এই ধরণের প্রথা দেখা যায়। বাংলার দেবদাসীরা মন্দিরগুলিতে এই প্রথা মেনেই নৃত্য করতেন।

গণেশ, অষ্টদিকপালকদের, গুরু, উর্দ্ধ, অধ এবং দর্শকদের প্রণাম জানিয়ে নৃত্য শিক্ষা বা অনুষ্ঠান শুরু হয়।

"তত্র গণপতিদিকপালাদি পূজাং কুর্যাত্।[২]

গুরু, রসিক বা আচার্য মন্দিরা বাজিয়ে নৃত্য শিক্ষা দেন।

পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন নৃত্তাঙ্গ অর্থাৎ নৃত্ত পর্যায়ের পর আসে নৃত্য পর্যায়ভুক্ত অংশ শিক্ষা। নৃত্য পর্যায়ের মধ্যে নামাবলী নৃত্য, শ্লোক, স্তুতি, স্তোত্র, কীর্তন নৃত্য, মহাজনপদ নৃত্য সমূহ। এটিতে মূলতঃ নৃত্য হস্ত অর্থাৎ—অসংযুত, সংযুত, বিপ্রযুত তথা মিশ্র (দেবহস্ত, দশাবতার হস্ত, বর্ণহস্ত, আত্মীয় হস্ত) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। হস্তগুলি অভিনয়ের প্রয়োজনানুসারে উত্তান, অধোমুখ, উন্মুখ, পরান্মুখ ভাবে প্রযুক্ত হয়। নাট্য পর্যায়ভুক্ত লীলাকীর্তন 'পালানৃত্য' সমূহ। নাট্যেও নৃত্যহস্ত এবং নৃত্তহস্ত ব্যবহৃত হয়। পালানৃত্য সাধারণত দলগত বা সমবেত ভাবে পরিবেশিত হয় এবং লীলা কীর্তন 'একহার্য' ভাবে অর্থাৎ একক ভাবে প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ নাট্যপর্যায়ভুক্ত অংশটি একক (লীলাকীর্তন) বা দলগত (পালানৃত্য) উভয় প্রকারই হয়ে থাকে। নাট্যশাস্ত্র সূত্রে আমরা জানি বাংলায় 'ভারতীবৃত্তি' অর্থাৎ কথোপকথন সহযোগে নৃত্যের প্রচলন ছিল। নাট্যে এর প্রয়োগ বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

গৌড়ীয় নৃত্যের মার্গ ঃ

বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য যেহেতু দু হাজার বছরেরও প্রাচীন এবং এক জায়গায় স্থির

১। শ্রী নিঃশঙ্কশার্ঙ্গদেব প্রণীত, সংগীত রত্নাকর, বিনায়ক গণেশ আপটে, আনন্দ আশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, ১৯৪২, পৃঃ ৭৯৫।
২। শ্রী শুভঙ্কর বিরচিত সংগীতদামোদর, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬০, পৃঃ ৭১।

নয়, প্রতি মুহূর্তে চলমান—নদীর জোয়ার ভাঁটার মতো কখনও বর্ধমান, কখনও ক্ষীয়মান, কখনও মনে হবে নীরব। আসলে কিন্তু কখনই সে নীরব নয়। যার ফলে এর মূল ভিত্তি বা পরিকাঠামো অপরিবর্তনীয় কিন্তু এর মার্গ, প্রদর্শরীতি বারে বারে সময়ানুসারে, অবস্থানুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। যে পদ্ধতিতে বাংলার শাস্ত্রীয় গীতির মার্গ প্রকীর্ণ প্রবন্ধের পথ ধরে মনোহরশাহী, গরাণহাটী ইত্যাদি কীর্তনে এসে পরিণত হয়েছে, তেমনি গৌড়ীয় নৃত্যও নানা সংযোজন-বিয়োজন-পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন-রূপান্তরের মাধ্যমে আজ নব রূপে রূপায়িত হয়ে পুনর্গঠিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নৃত্ত-নৃত্য এবং নাট্যের মেল বন্ধনে সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে নবকলেবর লাভ করেছে। অর্থাৎ এটি যেমন প্রাচীন তেমনি নবীন। মূল অভিনয়-প্রধান নৃত্যে অভিনয়ের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য অল্প পরিমাণে নৃত্ত প্রযুক্ত হয় যেমন— অভিসারিকা নায়িকার নৃত্য। সাধারণত পুনর্গঠিত গৌড়ীয় নৃত্যের নৃত্যসূচী হিসেবে—বন্দনা, মঙ্গলাচরণ, আলাপচারী, মহাজনপদ, লীলাকীর্তন নৃত্য, পালানৃত্য ও দশা বা অন্তঃ বা নৈষ্ক্রামিকী নৃত্য মূলতঃ এইগুলিই বর্তমানে গৃহীত হয়েছে। তার মানে এই নয় যে এই কয়টির মধ্যেই গৌড়ীয় নৃত্য সীমিত। এটিই মূল পরিকাঠামো। এর বাইরেও বহুবিধ নৃত্যসূচী আছে যা পূর্বে প্রচলিত ছিল, এখনও গুরুমুখী নৃত্য ধারায় ছড়িয়ে আছে। যেমন—পর্ব নৃত্য, নামাবলী নৃত্য, মৃদঙ্গ নৃত্য, শ্লোক আরতি নৃত্য, প্রবন্ধ নৃত্য, স্তুতিনৃত্য, স্তোত্র, বিরুত্তম ইত্যাদি।

বন্দনা নৃত্য—গৌড়ীয় নৃত্যের মূল পরিকাঠামো অনুযায়ী প্রথমে বন্দনা নৃত্য। এটি মূলত সংস্কৃত এবং প্রাচীন বাংলা ভাষায় হয়ে থাকে। এছাড়া বর্তমানে প্রচলিত সাধু/বাংলা ভাষাতেও হয়। কৃষ্ণ, শিব, সরস্বতী বা গণেশ বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। এটি প্রথমে তাল ছাড়া পরে তাল ও সুরের ওপর কথাগুলি বিন্যস্ত হয়ে অনেকটা আগমন বা আহ্বান জানানোর মতো চামর এবং ধূপ-দীপ ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত পুষ্পডালি নিয়ে মৃদঙ্গ ও মন্দিরা সহযোগে মাটির সরার ওপর পরিবেশিত হয়। মাটির সরা অর্থাৎ ধরিত্রীর উপর দাঁড়িয়ে বন্দনা করা হয়। এটি ৪-৭ মিনিটের নৃত্যাংশ। বিভিন্ন চারীভেদে নিজেকে উজাড় করে দেবতা, সমবেত সহৃদয় দর্শকমণ্ডলী, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিতচিত্তে 'বন্দনা' অনুষ্ঠান শুরু হয়।

মঙ্গলাচরণ—বন্দনার পরবর্তী নৃত্যসূচী 'মঙ্গলাচরণ'। মঙ্গলাচরণ কৃত হয় মঙ্গলময়তা এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি নির্বিঘ্নে সমাধা করার জন্য।

মঙ্গলাচরণে—মঙ্গল, মঙ্গলগীতি বা তেন-তেন জাতীয় শব্দ থাকে—

"তেনাতেনেতি নানারসমথ নটনং গানমপ্যূঢ়রাগৌ
তেনা তেনেতি লোকং সরভস কুতুকোল্লাসমন্যোন্যজিষ্ণু।।'

'তেনতেন' এরূপ মঙ্গল সূচক আলাপে নানা রস এবং তৎপর নাচে গানে উল্লসিত করে তুললেন লৌকিক প্রকাশ রহিত ভাবে।[১] মঙ্গলাচরণ নৃত্যটি পরিবেশন করতে ৮-১০ মিনিট সময় লাগে। মঙ্গলাচরণ ঢাক, পাকাজ বা মৃদঙ্গ জাতীয় তাল বাদ্যের সহযোগে সাধারণতপরিবেশিত হয়। যেমন—গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ "শ্রুতকমলা কুচমন্ডল" গানটি শেষ হয় "মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতম" ইত্যাদি বাণী সহযোগে।

আলাপচারী—এটি 'নৃত্ত' প্রধান অংশ। আলাপ অর্থাৎ সরগম, চারী অর্থাৎ চলন। কতকগুলি নৃত্তাঙ্গের সমষ্টিতে যতি বা প্রস্তার নির্মিত হয়। প্রস্তার অর্থাৎ বিস্তার। প্রাচীনতালকে বিভিন্নভাবে প্রস্তার বা বিস্তার করার নিয়ম ছিল। 'সংগীতদামোদরে' প্রস্তার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

"সর্ব্বপ্লুতাৎ সমারম্ভ মাত্রা নিবহনির্ম্মিতাৎ।
অবৎ প্রস্তারয়েদান্তে যাবৎ সর্বং দ্রুতং ভবেৎ।।"

এই প্রস্তারগুলি বা চারীগুলি শ্রুতি মধুর স্বরবিন্যাসের সহযোগে পরিবেশিত হয়। এই যতি বা প্রস্তার বহু ধরণের হয়—সমা, স্রোতগতা, মৃদঙ্গা, পিপীলিকা, গোপুচ্ছা ইত্যাদি। 'আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ'তে বর্ণিত আছে—

'সগরিম পধনিষু সকল লঙ্কৃতমণিভিঃ সুমঞ্জুলশ্রুতিষু।
স্বর সমদয়েষু-তামাং, ধামসু চ প্রীতিমাযলৌ কৃষ্ণঃ।।"
তধিক তা ধিগিতি ননাদ মৃদঙ্গ স্তচ্ছ্রু ত্বা সুরপুরনর্ত্তকী সমাজ।[২]

গোবিন্দলীলামৃতমে আছে—

"নটনগতিবিরাজৎ পাদতালানুগামী
নিজবরমধুরিম্না ব্যানশেহসৌ জগন্তি।।৭৬।।
অনিবদ্ধং নিবন্ধঞ্চ দ্বিধা গীতঞ্চ তে জন্তঃ।
সারিগমপধন্যাখ্য স্বরানাললপুঃ পৃথক্।।৭৭।।[৩]

নৃত্যগতি শোভা শীল পাদতলের অনুগামী হয়ে আপনার অত্যুৎকৃষ্ট মাধুর্য নিখিল জগতকে ব্যাপ্ত করল। এর সাথে অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ ভেদে দুই প্রকার গানই করতে

১। শ্রী মম্মহাকবি শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত শ্রী শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-চম্পূ (বঙ্গানুবাদ ২য় খন্ড), মণীন্দ্রনাথ গুহ, সাবিত্রী গুহ, রাধারমণ মন্দির, বৃন্দাবন, শ্লোক ৫১, বিংশ স্তবক, ৮৬৯।
২। শ্রী মম্মহাকবি শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-চম্পূঃ (বঙ্গানুবাদ ২য় খন্ড), মণীন্দ্রনাথ গুহ, সাবিত্রী গুহ, রাধারমণ মন্দির, বৃন্দাবন, শ্লোক ৪৫, বিংশস্তবক, ৮৬৭।
৩। শ্রীশ্রী গোবিন্দলীলামৃতম্ (৩য় খন্ড) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, সৎসেবক আশ্রম, বৃন্দাবন, ১৩৯৫ (বঙ্গাব্দ) শ্লোক ৭৬-৭৭ পৃঃ ১৩৭।

লাগলেন, তন্মধ্যে প্রথমে নিবদ্ধ অর্থাৎ সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি এই সপ্ত স্বর পৃথক পৃথক ভাবে আলাপ করতে প্রবৃত্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজাঙ্গনা সকলে বহুবিধ সুন্দর সুন্দর কঠিন তালের ওপর আলাপচারী করে থাকেন।[১] যেমন—দোজ, আড়াদাসপাহাড়ি, রূপক, ব্রহ্মতাল ইত্যাদি। এই 'নৃত্ত' পর্যায়ভুক্ত পর্বটি সম্পন্ন করতে ৮-১০ মিনিট সময় লাগে।

মহাজনপদনৃত্য—শ্রীজয়দেব, বিদ্যাপতি, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজচণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বাসুদেব ঘোষ, উদ্ধব দাস, বলরাম দাস, অনন্তদাস, শশীশেখর দাস, নরহরি সরকার ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুর, রাধামোহন ঠাকুর, প্রমুখ বহুসিদ্ধ পদকর্তাদের রচিত পদকে মহাজনপদ বলে এবং সেই পদ আশ্রয়ী নৃত্যকে মহাজনপদনৃত্য বলে। যেহেতু এর সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী তার ফলে এই নৃত্য বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় সম্পৃক্ত। এই অংশের অভিনয় অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল। পদকর্তার রচনাশৈলীর বিশিষ্টতার জন্য অভিনয় সম্পৃক্ত গৌড়ীয় নৃত্যের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা মধ্যমণি। এই নৃত্যে সাধারণত সংস্কৃত, প্রাচীন বাংলা, ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহৃত হয়। এটি সম্পন্ন করতে ১৫-২৫ মিনিট সময় লাগে। নায়িকাভেদ, নবরস, দশাবতার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মহাজনপদ নৃত্য। প্রাচীনকালে দশাবতারের বাদ্য প্রচলিত ছিল, সেটি ছিল সম্পূর্ণ নামমালা বাদ্য। বর্তমানে তা প্রায় বিলুপ্ত।[২]

লীলাকীর্তন—'কীর্তন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'প্রশংসা'। কোনও দেবদেবীর মহিমাসূচক লীলা গুণগানকে কীর্তন বলা হয় এবং এর ওপর আধার করে নৃত্য হয়ে থাকে। বিশেষত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক বর্ণনা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বর্ণনামূলক পদাবলী এক বিশেষ সুরে ও তালে আখর-যোজনাপূর্বক গাইবার রীতিকে 'কীর্তন' গান ও তৎসহ নৃত্যকে 'কীর্তন নৃত্য' বলা হয়। সুরে, তালে, করতাল এবং মৃদঙ্গ সহযোগে ভগবানের নাম অর্থাৎ কীর্তি-গান-আবৃত্তি অর্থে 'কীর্তন' শব্দের ব্যাপক প্রচলন ও প্রসার হয়েছে চৈতন্যদেবের সময় থেকে। চৈতন্যদেব যে সংকীর্তন করতেন তাকে নৃত্য-সংকীর্তন বলা হয়। কীর্তন শব্দের উল্লেখ পাই ভাগবতে, 'স্মরণং কীর্তনং বিষ্ণো'।[৩] সম্ভবত 'কীর্তন' কথাটির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন পাই পূর্বভারতে অষ্টম শতকের মূর্তির তলায় লেখা শংকর-কীর্তন কথা থেকে।[৪] নাট্যশাস্ত্র থেকে জানতে পারি বাংলায়

১। শ্রীশ্রী গোবিন্দলীলামৃতম্ (৩য় খন্ড) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, সৎসেবক আশ্রম, বৃন্দাবন, ১৩৯৫ (বঙ্গাব্দ) শ্লোক ৭৬-৭৭ পৃ: ১৩৭।

২। শ্রী খোলবাদ্য শিক্ষা, শ্রীভোলানাথ দত্ত, মহেশ লাইব্রেরী, ১৩৬১ (বাং), পৃ: ২৪০।

৩। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, সুকুমার সেন, রূপা, ১৯৭০, পৃ: ১৩১-১৩২।

৪। East-India Art Style–A study in Parallel Trends–B.N.Mukherjee, K.P.Bagchi and Co., Fig. 63.

ঔড্র-মাগধী নৃত্যের বৃত্তি বা Style ছিল— ভারতী ও কৈশিকী। ভারতী অর্থাৎ কথোপকথন সহযোগে উচ্চন্ডএবং কৈশিকী অর্থাৎ লাবণ্যমন্ডিত নৃত্য। তাই প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমানের বাংলার কীর্তনে এই নাট্যশাস্ত্রের ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি অর্থাৎ কথোপকথন সহযোগে উচ্চন্ড ও লাস্য বা মধুর নৃত্যের এইভাব থেকে গেছে। এই নৃত্যের ক্ষেত্রে সময় লাগে ২০-৩০ মিনিট। পুতনাবধ, কৃষ্ণকালী, মাখনচুরি ইত্যাদি।

পালা নৃত্য—'নৃত্ত' ও 'নৃত্য' সংপৃক্ত পৌরাণিক কাব্য আশ্রয়ী নাট্যপর্যায়ভুক্ত অংশটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় পালা নৃত্যটি ৭-৮ দিন ধরে পরিবেশিত হত, এক একদিন এক একটি দৃশ্যের বা পালার অবতারণা করে। যেমন—মনসামঙ্গল পালার এক এক দিন এক এক পালা—চাঁদের বাণিজ্য পালা, দুর্দশাপালা ইত্যাদি নৃত্যগীত সহযোগে পরিবেশিত হতো। বর্তমানে এক দিনে ২-৩ ঘন্টাতেই 'মঙ্গলকাব্যের পালা' শেষ হয়। গৌড়ীয় নৃত্যের পালাগুলি ১০-১৫ মিনিট। সাধারণত: পালানৃত্যে বহু চরিত্রের সমাবেশ থাকে এবং বহুশিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। বহু পালা নৃত্য আছে। যেমন—মহিষাসুরমর্দিনী, বকাসুরবধ, ভস্মাসুরবধ, অভিমন্যু সপ্তরথী, কিরাত অর্জুন ইত্যাদি। ষষ্ঠ-সপ্ত শতকের যুগের কিরাত অর্জুনের একটি অপূর্ব প্রস্তর নির্মিত ভাস্কর্য কলিকাতাস্থ ভারতীয় যাদুঘরের প্রদর্শশালায় সংরক্ষিত আছে। অনেক সময় পালা নৃত্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এর রচনাগুলি সাধারণত বাংলা ভাষায় হয়ে থাকে। কারো কারো মতে 'পালা' কথাটির সূচনা পাল রাজত্বে।

দশা বা অন্ত:ভাব বা নৈষ্ক্রামিকী নৃত্য—গৌড়ীয় নৃত্য সাধারণত শেষ হয় দশা বা অন্ত:ভাব নৃত্য দিয়ে। এটিতে শিল্পী নিজেকে উজাড় করে সাত্ত্বিক অভিনয়যুক্ত হয়ে নৃত্য শেষ করেন। এটি সাধারণত তাল ছাড়া ২-৩ মিনিট সংস্কৃতভাষায় নিবেদিত হয়ে থাকে। উপরোক্তগুলি ছাড়া দশমহাবিদ্যা, শিবপঞ্চমহিমাকম্ এগুলি বিরুত্তম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আহার্য অভিনয়

নৃত্যে আহার্য অভিনয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। গৌড়ীয় নৃত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলার সাহিত্যে, শাস্ত্রে, ভাস্কর্যে সর্বত্রই আহার্য অভিনয়ের সুন্দর পরিচয় পাই। ভারতীয় সংগীতের মূল বা আদি শাস্ত্রগ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রেও গৌড় তথা বাংলার আহার্য অভিনয়ের বর্ণনা পাই—

"গৌড়ীনামলকং প্রায়সশিখাপাশবেণিকম্।।[১]

গৌড়ী নারীদের থাকবে সাধারণত কোঁকড়া চুল, শিখাপাশ বা চূড়াপাশ অর্থাৎ

১। নাট্যশাস্ত্র (৩য় খণ্ড), ড: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড: ছন্দা চক্রবর্ত্তী, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২, পৃ: ৯৫।

ঘোড়াচূড়ার মত কবরী ও বেণী।[১] অঙ্গ রাগ অর্থাৎ make up সম্বন্ধেও নাট্যশাস্ত্রে বলা আছে—

"অঙ্গা বঙ্গা কলিঙ্গাস্তু শ্যামাঃ কার্যাস্তু বর্ণতঃ।।[১]

অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গবাসীর বর্ণ শ্যাম করণীয়।[১] পরবর্তীকালে বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যে শাস্ত্রে আহার্য অভিনয়ের সুন্দর বর্ণনা পাই। খৃ: পূ: ৩য়-৪র্থ শতকে চন্দ্রকেতুগড়ে টেরাকোটা ভাস্কর্যে প্রসাধনরতা নর্তকীর নৃত্য ভঙ্গিমা দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্যে যেমন নর্তক নর্তকীর বেশভূষা রূপসজ্জার বর্ণনা পাই, তেমনি পাশাপাশি গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আহার্য অভিনয়ের সুন্দর বর্ণনা পাই। যেমন—রূপ গোস্বামী রচিত শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আহার্য অভিনয়ের বর্ণনা পাই—

"কথিতং বসনাকল্পমন্ডনাদ্যং প্রসাধনম্।।৩৮৩।।[২]

"খন্ডিতা খন্ডিতং ভূরি নটবেশ ক্রিয়োচিতম্।
অনেক বর্ণং বসনংভূয়িষ্ঠ কথিতং বুধৈঃ।।৩৫২।।[৩]

বিশেষত রূপ গোস্বামীর লেখা "রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা"তে আহার্য অভিনয় অর্থাৎ বেশভূষা, অলঙ্কার ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা পাই—যেমন পাঁচপ্রকার কর্ণপুর অর্থাৎ কর্ণভূষণের বর্ণনা পাই—

"তাড়ঙ্ক, কুন্ডল, পুষ্পী, কর্ণিকা, কর্ণবেষ্টনং ইতি পঞ্চবিধং প্রোক্ত কর্ণপুরোহ শিল্পিভিং।।"[৪]

"রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা" বইটি সম্পূর্ণ রূপে আহার্য অভিনয়ের বর্ণনায় সমৃদ্ধশালী। বিশেষত বেশভূষা, বর্ণ, পুষ্পসজ্জা, অলঙ্কার ইত্যাদির বর্ণনা বিশদে বলছে। চন্দ্রশেখর ও শশীশেখর কৃত "নায়িকারত্নমালা"য় অষ্ট নায়িকার গানসহ আহার্য অভিনয়ের বর্ণনা পাই। কোন নায়িকা কোন বেশে অভিসারে যাবেন সম্পূর্ণ বিবরণ সমেত অষ্ট নায়িকার আটটি উপবিভাগের গান আছে। যেমন—জ্যোৎস্না অভিসারিকা নায়িকার বেশভূষার বর্ণনা সমেত গান—

"সুচারু চন্দ্রিকা ফুটিল জানি
শ্যাম অভিসারে চলিল ধনি।।
লোটনে লম্বিত মালতি মাল।

১। নাট্যশাস্ত্র.....পৃ: ১০৩-১০৪।
২। শ্রী রূপ গোস্বামী রচিত শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, চৈতন্যসারস্বতকৃষ্ণানুশীলন সংঘ, ১৩৯৬ (বাংলা), (দক্ষিণ—প্রথম লহরী) পৃ: ১৬৬।
৩। ঐ, পৃ: ১৬৮।
৪। রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীরূপ গোস্বামী বিবচিত, শ্রীশ্যামসুন্দর মিশ্র প্রকাশিত, ১৩৫৬ (বাং) পৃ: ৬।

সৌরভে মাতল ভ্রমর জাল।।
কুচ শিরফল চন্দন মাখা।
নূপুর ধবল বসনে ঢাকা।।
সোনাতে জড়িত মুকুতা কসা।
ওঠমাঝে খেলে লম্বিত নাসা।।
গজদশনের সুচারু শাখা।
করমূলে কিবা দিয়াছে দেখা।।
নিশি সঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি।
শশি কহে কুঞ্জে মিলিল গোরি।।[১]

বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের দুই ধরণের পোশাক ছিল—কাঞ্চী ও শাড়ী বা মেখলা। দ্বাদশ শতকের জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে', গোবর্ধন আচার্যের আর্যা সপ্তশতীতে, পঞ্চদশ শতকের কবি কর্ণপুরের 'আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ'তে কাঞ্চী পোশাকের বর্ণনা পাই এবং এই পোশাক ও অলঙ্কারের নিদর্শন বাংলার ভাস্কর্যে ও চিত্রশিল্পে বিশদভাবে পাওয়া যায়। খ্রী: পূ: পোড়ামাটির ভাস্কর্যে বিশেষত: সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পাল-সেন যুগের ভাস্কর্যে এবং পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরের পোড়া মাটির মন্দির, বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির, এরকম বহু মন্দিরের গায়ে সাহিত্য ও শাস্ত্র বর্ণিত পোশাক ও অলঙ্কারের সুন্দর নিদর্শন আছে।

আনন্দবৃন্দাবন চম্পূতে—

"কাঞ্চী কিঙ্কিনি কঙ্কনাদি বিগলৎসং ব্যানভং ভ্রম্যতি।[২]

জয়দেবের গীতগোবিন্দে—

"কাঞ্চী কিঞ্চিদ্‌গতাশং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যর"[৩]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বর্ণনায় জানতে পারি নটীরা ইজার, কাঁচুলি ও ওড়না পরতো। ইজার অর্থাৎ—কাঞ্চী বা কাঞ্চলি। নববেহার, বেহার, দেবমহল, ঘোড়াচূড়া, খোপ্যক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের খোঁপা বাঁধতো। এছাড়া সিঁথি, বেশর, কুণ্ডল, হার, চক্রাবলী, অনন্ত, কেয়ূর, রতনচূড়, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের অলঙ্কার পরতো।

১। নায়িকা রত্নমালা, শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় সম্পাদিত, অহান বা লম্বা, ১৯৮৪, পৃ: ৬।
২। শ্রীশ্রী আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ—কবিকর্ণপুর, (২য় খন্ড), শ্রী রাধারমণ মন্দির, পৃ: ৮৫৫।
৩। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০ খৃ:)—শ্রীসতীশ মোহন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৮, পৃ: ৮২।

বাংলার শাস্ত্রগ্রন্থ 'সংগীত দামোদর' (১৫ তম শতক) বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের আহার্য অভিনয়ের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছে—

অথ কলা

অঞ্জনং শুদ্ধসিন্দুরং পত্রাবল্যত যাবকঃ।
তাম্বুলরাগোৎ পডলকার কেশান্তঃ পট্টগুচ্ছকঃ।।
পটবাসকিচিত্রপটর কটকং রত্নমুদ্রিকা।
মুক্তাহারঃ কঙ্কণ কং গ্রৈবেয়কমথাঙ্গদম্।।
সৈমন্তিকন্তুলাকোটির কুন্ডলং কর্ণচুলিকা।
বিশোষকোঅবতংসকচ কাঞ্চী কঞ্চুলিকাদয়ঃ।
সন্তি যাবচ্চতুঃষষ্টিমপরাশ্চ সুবিস্তারাঃ।
কলা কলাবতীনান্ত হরে র্হৃদয়হারিকাঃ।
তা বাহুল্যভয়ান্নোক্তা ননু যোজ্যাস্ততো বয়ম্।।[১]

—কাজল, সিঁদুর, পত্রাবলী, আলতা, তাম্বুল বা পান দিয়ে অধর রঞ্জিত করা আবশ্যক। কেশান্তে পট্টগুচ্ছ বা টাসেল, পরিধেয় বস্ত্র সিল্কের কাপড় যা দিয়ে কাঞ্চী বা কোমর থেকে পরিধেয় ধুতির মত পোশাক এবং কঞ্চুলিকা অর্থাৎ কাঞ্চী বেশের সামনে আঁচল কুঁচিয়ে ঝুলিয়ে পরতে হবে। ব্যবহার হবে কটক বা বলয় বা বালা, রত্নমুদ্রিকা বা রত্ন খচিত আংটি, মুক্তাহার, কঙ্কণ বা চুড়ি, কণ্ঠাভরণ বা গলার হার, অঙ্গ দ বা বাহুর অলঙ্কার, সৈমন্তিক বা টিক্‌লি বা ললাটিক, তুলাকোটি বা পায়ের নূপুর, কুন্ডল বা বড় কানের দুল কান থেকে চুল অবধি টানা অলঙ্কার, অবতংস বা মস্তকভূষণ, বিশোষক বা তিলক, এরকম বিস্তৃত বেশভূষা বা কলার ব্যাখ্যা করেছে।

উপরোক্ত শাস্ত্র, সাহিত্য ও ভাস্কর্য এবং প্রচলিত বেশভূষা রূপসজ্জা থেকে আহার্যঅভিনয়ের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। অর্থাৎ শাস্ত্র, সাহিত্য, ভাস্কর্য এবং প্রচলিত নৃত্যের আহার্যের ওপর ভিত্তি করেই গৌড়ীয় নৃত্যের বেশভূষার উপকরণ মন্ডিত হয়েছে।

কাঞ্চী বা কাঞ্চলি—ধুতির মত কাছা দেওয়া পোশাক। যার সামনে ঝোলানো কুঁচিকে বলে কঞ্চুলিকা, ওপরের আঁচলকে বলে অঞ্চল। শাড়ী বা মেখলা—শাড়ী বা কাঞ্চী পোশাকের জন্য পট্টবস্ত্র বা সিল্ক শাড়ী অর্থাৎ গরদ, তসর, বালুচরী বা তাঁতের

১। শ্রীশুভঙ্কর বিরচিত সংগীতদামোদর, গৌরীনাথ শাস্ত্রী এবং গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬০, পৃঃ ৫১।

অর্থাৎ সুতীর শাড়ী ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণালঙ্কার, শাঁখা, পলা, তুলসীর মালা, নৃত্যের চরিত্র অনুযায়ী রুদ্রাক্ষের মালা। কেশপাশ বা কবরী অথবা কবরী পট্টগুচ্ছক যুক্ত দীর্ঘ বেণী পুষ্প বেষ্টন করে করা হয়। কপালে লাল টিপ ও তার চারদিকে চন্দনাঙ্কিত প্রভাতের সূর্যের ছটার মত, হাতে পায়ে যাবক বা লাক্ষা বা অলক্ত বা আলতা ব্যবহার করা হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে—ধুতি, উত্তরীয়, স্বর্ণালঙ্কার, তুলসীর মালা, বিশোষক বা তিলক। এছাড়া, পালা নৃত্যের ক্ষেত্রে চরিত্রানুযায়ী পোশাক ব্যবহৃত হয়। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত নৃত্যধারাটির পোশাক নির্মাণে ও রূপসজ্জায় শ্রীমতি ছবি চক্রবর্ত্তীর অবদান অবিস্মরণীয়।

ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যে গৌড়ীয় অবদান

সর্বভারত পর্যটন করে স্বামী বিবেকানন্দ মধ্যযুগের আর এক পর্যটক শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন—

"The influence of Shri Chaitanya is all over India. Whereever the Bhakti-Marga is known, there he is appreciated, studied and worshipped,....most of his so-called disciples in Bengal do not know how his power is still working all over India." চৈতন্যদেবের প্রভাব সর্বভারতব্যাপী। যেখানেই ভক্তিমার্গ সেখানেই তিনি পঠিত ও পূজিত....এব্যাপারে তাঁর তথাকথিত বাঙালী শিষ্যরা অজ্ঞ...এখনও তাঁর প্রভাব ক্ষমতা সর্বভারতব্যাপী কাজ করে চলেছে।[১]

স্বামীজী একথা ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজ সংবর্ধনার প্রতিভাষণে বলেছিলেন, কিন্তু আজও শ্রীচৈতন্যদেবের ভারতব্যাপী প্রভাব সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা দূর হয়েছে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বভারতীয় প্রভাবের মধ্যে এই প্রবন্ধের আলোচনা কেবল সংগীত (গীত-বাদ্য-নৃত্য) বিশেষত নৃত্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। সর্বভারতীয় সংগীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের প্রভাব অপরিসীম।

উপরোক্ত উক্তিটির সাক্ষাৎ প্রমাণস্বরূপ অজস্র উদাহরণ আছে, তবে গুটিকয়েক উল্লেখ করছি—জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' শ্রীচৈতন্যদেব দ্বারা দক্ষিণভারতে ব্যাপক প্রসার লাভ করে, তার ফলেই কেরালাতে ''অষ্টপদী-আট্টম'' গান সমৃদ্ধ রাধাকৃষ্ণের নৃত্যনাট্য শুরু হয়। এটি ষোড়শ শতাব্দীর কথা। এতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হত, মদ্দলম ও বাঁশি। নাট্যে কৃষ্ণ, রাধা, সখীর দল ইত্যাদি চরিত্র থাকত। 'অষ্টপদী-আট্টম' কেরালায় দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর বহুল প্রচার ছিল। এখনও প্রতিদিন গীতগোবিন্দের গানগুলি কেরালার বিষ্ণুমন্দিরগুলিতে পরিবেশিত হয়। পরবর্তীকালে কেরালার রাজাদের দ্বারা কৃষ্ণগীতির নৃত্যরূপগুলি ধাপে ধাপে এগিয়ে

১। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য, নির্মলনারায়ণ গুপ্ত, রত্নাবলী, ১৯৮৬, পৃঃ ১-৩।

চলে, নানাধরনের নাট্টম তৈরি হয়। যেমন—কৃষ্ণনাট্টম, রামনাট্টম। এই পথ ধরেই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে 'কথাকলি' তৈরি হয়।[১,২] Prof. Aymanam Krishna Kaimal, রচিত "কথাকলি বিজ্ঞান কোশম"- এ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে আছে (মালয়ালী ভাষা থেকে অনূদিত)— "Ashtapadiattam is a dance form which arose in Kerala based on Geeta-Govindam. The Ashtapadi songs were sung to the accompaniment of instruments (Edaikka etc.) at the sopana of the temples in Kerala as a devotional recital called Sopana-Sangeetam and also a new dance form, based on Geeta-Govindam.

"This formed the basic for the formation of Kathakali Music and Atta Katha Sahityam. Kozhikod (Calicut) Manaveda Raja, who was a devotee of Lord Krishna used to observe Ashtapadiattam of Guruvyoor temple with attention. It was Ashtapadi, which influenced him to create another Geeti-Kavya i.e. Krishna Geeti, another Visual art form of Krisnanattam. The influence of Ashtapadi is clearly visible in the art form of Krishnanattam imitating Jayadeva, Manaveda also composed slokas as poet's statements, dialogues and padas in the form of praises etc. as subdivisions of his work.

It was Jayadeva's Geeta Govindam and Manaveda's Krishna Geeti which were taken as models by Kottarakara, also composed his work in the art form of Geeta Govindam in eight stories for eight days performances of the Ramayana, story. He also used sloka as poet's statements and Padas as the words of the characters (dialogue, soliquy, praises etc.), like Geeta-Govindam."

Kottarakara Thampuran wrote some Kathakali works afterwards, in which he made some changes in this style.[৩] রাজা মানবেদ রচিত 'কৃষ্ণগীতি' গ্রন্থে পাই—"Ashtapadi or Geeta Govindam was not only singing, but also for dancing. In the 15th and 16th century A.D. there was a renaissance of Vaishnavism brought about by Chaitanyadeva and as a

১। কথাকলির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, গুরু গোবিন্দন কুট্টি, নন্দন, সংগীতসংখ্যা, মে ১৯৮৪, পৃঃ ৮৯।

২। Kathakali, K.P. Padmanavan. Thampy, Indian Publication, 1963, Pg. 1.

৩। কথাকলি বিজ্ঞান কৈাশম্—অধ্যাপক আইমানম কৃষ্ণ কাইমল, সাহিত্য প্রবর্তক সহকরণ সংঘ, ১৯৮৬, পৃঃ ৮০।

part of this Ashtapadiattam and other dance form started growing Melapathur Narayana Bhattahari (author of Narayaneeyam) has mentioned about one such. Sanyasis in the verse starting. "To Vrindavana Vasino Niyaminah... It is mentioned that this Sanyasi from Vrindavana was a realised soul and he gave direct divine instructions to the king of Ambalapuzha and made the king happy in his heart by presenting a visual-art dance drama (UTSAVAKALI) named "Krishnavalokam as an indirect method of spreading spiritual education.[১] (অষ্টপদী আট্টম কেরালার একটি মূল নাট্যধারা যেটি গীতগোবিন্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অষ্টপদীগানগুলি কেরালার মন্দির সিঁড়িতে গীতগোবিন্দর ওপর আধার করে 'সোপান-সংগীত' নামে ভক্তিগীতি হিসেবে পরিবেশিত হয়ে থাকে এবং এর সঙ্গে নতুন ধরণের নৃত্যও পরিবেশিত হয়।

এই অষ্টপদী আট্টম কথাকলির গীত-বাদ্য ও আট্টকথা সাহিত্যের মূলসূত্র। কালিকটের রাজা মানবেদ, কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ 'গুরুবায়ুর মন্দির'-এ অষ্টপদী আট্টম শুনতে যেতেন। এই অষ্টপদীর প্রভাবেই প্রভাবান্বিত হয়ে কৃষ্ণগীতি রচনা করেন, এটি একটি দৃশ্যকাব্য 'কৃষ্ণ নাট্টম' নামে পরিচিত। কৃষ্ণনাট্টমে অষ্টপদী আট্টমের প্রত্যক্ষপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজা মানবেদ কৃষ্ণগীতি রচনা করেছিলেন, যেখানে উপবিভাগ হিসেবে কবির বক্তব্য, কথোপকথন, পদ, প্রশংসা ইত্যাদিতে জয়দেবের অনুকরণের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা যায়।

রাজা মানবেদ 'কৃষ্ণগীতি' গ্রন্থে লিখেছেন—গীতগোবিন্দ শুধুমাত্র গানের জন্যই নয়, নৃত্যেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব দ্বারা নবযুগের সূচনা হয় এবং তারই ফলে অষ্টপদী আট্টম নৃত্যগীত কেরালাব শুরু হয়।)

কথাকলির উৎপত্তি নিয়ে Prince Kerala Verma-র মন্তব্য—"First of all what is the origin or the source of this art ? Different scholars attribute it to different sources. Some say that it is evolved out of Jayadeva's Geeta Govinda and the Krishna Yatra in Bengal.[২] (কথাকলির উৎপত্তি এবং উৎস নিয়ে কেরল বর্মা লিখেছেন কারও কারও মতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বাংলার কৃষ্ণযাত্রা থেকে এর উদ্ভব।)

১। কৃষ্ণগীতি (সংস্কৃত)—শ্রীমানবেদ কবি, সপ্তদশ শতক. প্রকাশক গুরুবায়ুর দেবস্বম।

২। The Appurtenances of Kathakali—by Prince Kerala Verma, Bulletin of the Rama Verma Research Institute, Vol. V, Part II, Reprinted and Published by Kerala Sahitya Academy. 1980, Pg. 131.

এ ছাড়া গোবিন্দদাস যিনি চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারতের ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন তাঁর রচিত গোবিন্দদাসের কড়চা থেকে জানতে পারি, ত্রিবাঙ্কুর রাজা চৈতন্যদেবের ভক্ত হন এবং তাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ভক্তিরস-আপ্লুত নৃত্য করেছিলেন। চৈতন্যদেব যখন ত্রিবাঙ্কুর পৌঁছান রাজা রুদ্রপতিও তখন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়েছিলেন—

"কৃষ্ণপ্রেমে যাও প্রভু অমনি উঠিয়া।
নাচিতে লাগিল দুই বাহু প্রসারিয়া।।
হরিবোল বোলে গোরা অজ্ঞান হইয়া।
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া।।
পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিল।
সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিল।।
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল।
নয়নের জলে তার হৃদয় ভাসিল।।[১]

চৈতন্যদেব পুরীতে যান এবং জীবনের শেষ আঠারো বছর তিনি নীলাচলেই কাটান। চৈতন্য পার্শ্বচরদের মধ্যে অনেকেই নৃত্য-গীতে পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে বক্রেশ্বর, রায় রামানন্দ, কবিকর্ণপুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ওড়িশি নৃত্যে রায় রামানন্দের অবদান সর্বজনস্বীকৃত।[২] ওড়িশার জনজীবনে চৈতন্য প্রভাব সম্পর্কে Hunter তাঁর 'Orissya' (১৮৭২ খ্রি:) বইটিতে লিখেছেন—

"The adoration of Chaitanya has become a sort of family-worship throughout Orissa. In Puri there is a temple specially dedicated to his name and many little shrines are scattered over the country. But he is generally adored in connection with Vishnu and of such joint temples there are at present 300 in the town of Puri and 500 in districts...At this moment Chaitanya is the apostle of the common people in Orissa". (সমগ্র উড়িষ্যায় চৈতন্যপূজন প্রায় প্রতি পরিবারের পুজা হয়ে দাঁড়ায়। পুরীতেই তাঁর নামে উৎসর্গী মন্দির আছে, এছাড়া সারা রাজ্য জুড়ে বহু ছোট বড় মন্দির আছে। বিষ্ণুর সঙ্গেই তিনি পূজিত হন পুরীতে সেরকম মন্দির আছে প্রায় ৩০০ এবং ৫০০ আছে জেলায়।)

১। গোবিন্দদাসের কড়চা, সম্পাদনা শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬, পৃঃ ৩২-৩৩।

২। ভারতের নৃত্যকলা, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ৩২০।

ওড়িশার 'পঞ্চসখা' বলরাম, জগন্নাথ, অচ্যুত, যশোবন্ত ও অনন্ত ছিলেন চৈতন্যের পার্ষদ। অচ্যুতানন্দ পঞ্চসখার সঙ্গে চৈতন্যর ঘনিষ্ঠতার কথা লিখেছেন।

"বৈষ্ণবমন্ডলী খোল করতাল বাজাই বোলন্তি হরি।
চৈতন্যঠাকুর মহানৃত্যকার দন্ড কমন্ডলুধারী।।
অনন্ত অচ্যুত ঘেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চসখাহি নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গ চন্দ্র সঙ্গত।।[১]

এই পঞ্চসখার রচনা ও কর্মের ফলেই যোড়শ শতকের ওড়িশি সমাজ ও সাহিত্যে এল নবজাগরণ। এই জাগরণের মূলে ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। এ সম্পর্কে পঞ্চসখার রচনায় দ্বিধাহীন স্বীকৃতি রয়েছে। ওড়িয়া সাহিত্যে যোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত চৈতন্য চরিত মোট পাঁচটি।[১] এই পঞ্চসখা ছাড়া রায় রামানন্দ ছিলেন চৈতন্য ভক্ত এবং তিনি গোদাবরী (বর্তমানের অন্ধ্ররাজ্য) নদীর তীরে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের কথাতেই তিনি নীলাচলে যান এবং 'মাহারী' অর্থাৎ 'দেবদাসী' নৃত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। রায় রামানন্দের পরবর্তীকালে বৈষ্ণবরা নারীদের নৃত্যকে মেনে নেননি এবং তাঁরা নিজেরাই সখীভাবে নৃত্য করতেন—যোড়শ শতকের 'গোটিপুও' নৃত্যসূচনার এটি একটি কারণ হিসেবে দর্শানো হয়। এই মাহারী নৃত্য এবং 'গোটিপুও' নৃত্য এ যুগের নবনির্মিত ওড়িশি নৃত্যের জনক।[২] প্রখ্যাত 'গোটিপুও' নৃত্যগুরু মাগুনী দাসের মতে—"বালিকাবেশে গুটিকয়েক বালক সখীভাবে কৃষ্ণবন্দনা করে 'গোটিপুও' নাচের মধ্য দিয়ে। ওড়িশায় এই নাচ প্রথম শুরু হয়েছিল মধ্যযুগের শেষের দিকে ভৈ রাজা রামচন্দ্রদেবের সময়ে। প্রচলিত ধর্মীয় ধারা অনুযায়ী দেবদাসী বা মাহারীরা মন্দিরগুলিতে নৃত্য করত। কিন্তু দেবমূর্তির সামনে এই নৃত্য নিষিদ্ধ ছিল দেবদাসীদের রজস্রাব চলাকালীন। এই সমস্যার সমাধান হয় চৈতন্যদেব দ্বারা। তাঁর 'মধুর রস' উপাসনাতে প্রভাবিত হয়ে সখীভাব বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থির করেন যে বালকেরা নারীরূপে দেবতার সামনে নৃত্যগীতের মাধ্যমে শ্রী কৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রসার করবে। তখন থেকে আজ অবধি চন্দন যাত্রা, ঝুলন যাত্রা, রথযাত্রার সময় এই নৃত্য হয়ে আসছে। এই হল গোটিপুয়া নৃত্যের আদি কথা।"[৩] আজকের ওড়িশি নৃত্যের উৎস এই গোটিপুয়া নৃত্য।

ওড়িশায় হরেকৃষ্ণ মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়েছিল চৈতন্যদেবের সময় থেকে তা পূর্বে উল্লিখিত, হান্টার-এর বর্ণনায় পাই। গোবিন্দদাসের কড়চায় আছে—

১। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য—নির্মলনারায়ণ গুপ্ত, রত্নাবলী, ১৯৮৬, পৃঃ ৮-১০।
২। ওড়িশি নৃত্য, অলকা কানুনগো, দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৯৪ (বাংলা), পৃঃ ১৫২-১৫৩।
৩। এ সপ্তাহের আলাপ, গুরু মাগুনী দাস—প্রতিদিন পত্রিকা (দৈনিক), ২রা জুন ১৯৯৬।

এত বলি সার্বভৌম গড়াগড়ি যায়।
তাহারে তুলিয়া আলিঙ্গনে গোরা রায়।।
এই রূপে হরিধ্বনি করিতে করিতে।
প্রভুরে লইয়া সবে চলিলা পুরীতে।।[১]

মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল চৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্গে করে নিয়ে যান ওড়িশায় এবং তা বাজাবার প্রাচীন পদ্ধতি ওড়িশায় গৌড়দেশী পদ্ধতি বলে প্রতিষ্ঠিত, যা ওড়িশায় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং এখনও ওড়িশার অধিকাংশ গ্রামে খোঁজ করলেই গৌড়দেশী মৃদঙ্গ পদ্ধতি পাওয়া সম্ভব।

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে ষোড়শ শতকের 'হরিদাস' গায়কদের ওপর একসঙ্গে শ্রীব্যাসরায় ও শ্রীচৈতন্যের যুগ্ম প্রভাব ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। দক্ষিণ ভারতের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী ষোড়শ শতকের কন্নড় সাহিত্যে মাধবাচার্য, ব্যাসরায় ও চৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন—

"Popular songs by Dasas (mendicant singers) was another form by Vaishnava literature in Kannada in this period. These singers got their inspiration from Madhvacharya and Vyasaraya and the visit of Chaitanya to South in 1510 did much to stimulate the growth of this popular type of songs."

কন্নড় ভাষায় রচিত এই সব ভক্তিগীতি 'দাসর পদগলু' নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতীয় সমাজেও চৈতন্যের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল। 'A History of Kanarese Literature' গ্রন্থে E.P. Rice, জৈনধর্ম হ্রাসের অন্যান্য কারণের উল্লেখ করে শেষে লিখেছেন—

"And finally in the sixteenth century a wave of Vaishnava enthusiasm inspired by Chaitanya preaching the doctrine of Krishna Bhakti, swept over the peninsula, and completed the alineation of the people from the austere teaching of the Jainas." (ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন বয়ে যায় চৈতন্যদেবের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে।)

গোবিন্দদাসের কড়চায় দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ ও সেখানকার মানুষদের ভক্তিরসে উজ্জীবিত করার সার্থক বর্ণনা পাই। চৈতন্য যখন ত্রিপদী (তিরুপতি) নগরে গিয়েছিলেন তখন সেখানে রামাত পন্ডিতরা থাকতেন, তাঁরা চৈতন্যভক্ত হয়ে যান অচিরেই।

১। গোবিন্দদাসের কড়চা .... পৃঃ ৮৪।

"যতেক রামাতগণ ভাব নিরখিয়া।
নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়া।।
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ তো নয়।
চরণে পড়িয়া কেহ বিলুণ্ঠিত হয়।।[১]

এরপরে আরও অনেক স্থানে যান এবং কাবেরীর তীরে 'নাগর' নগরে আসেন। সেখানেও সকলে ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে নৃত্যগীতিতে বিভোর হন—

"প্রভুর প্রেমের গতি হেরি পুরবাসী।
আবাল বনিতা সবে হইয়া উদাসী।।
তিনদিন নৃত্যগীত সেইখানে করে।
এই কথা প্রচারিল নাগর নগরে।।

দক্ষিণ ভারতের মহীশূর কূর্গ অঞ্চলের 'সাতানি' সম্প্রদায়ের ইতিহাসও চৈতন্য প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। 'সাতানি' (চৈতন্য > সাতানি ?)-রা এ অঞ্চলের ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। এঁরা বিষ্ণুকে কৃষ্ণমূর্তিতে উপাসনা করেন এবং এরা চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা নিজেদের 'বাংলার বৈষ্ণব' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে এঁরা নাম সংকীর্তন বা ভ্রাম্যমাণ গায়কের কাজে নিযুক্ত থাকেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্সে চোখ বুলালেও বোঝা যায় চৈতন্য প্রভাব আজও প্রবলভাবে জীবন্ত—

"how his power is still working all over India"[২]

চতুর্দশ শতকের মারাঠী সাহিত্যে ভক্তিস্তোত্র 'অভঙ্গ' রচয়িত্রী জনাবাঈ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন বঙ্গীয় সন্ত চৈতন্যদেবের ভাবোল্লাসকে—

"Janabai is a unique personality... in the whole panorama of Marathi Literature... she always, as she says in her abhangas, felt the presence of her god... This simple and innocent maid-servant lived always in that ecstacy. Do we not find this very same ecstacy in Chaitanya, the saint of Bengal ? [২]

ভরতনাট্যমের আদিজনক 'ভগবতমেলা নাটক' এবং 'কুচিপুড়ি' (প্রাচীন কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্য যেখানে পুরুষেরা মহিলা চরিত্রের অভিনয় করত।) আত্মপ্রকাশ করে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে। চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিরসের ধারায় তখন সমগ্র দক্ষিণভারত প্লাবিত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল থেকে সেকথা জানতে পারা যায়। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়

১। গোবিন্দদাসের কড়চা .... পৃঃ ৮৪।
২। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য......পৃঃ ১-১৫, ২৪৩।

সাহিত্যে ও দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে চৈতন্য প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের সপ্তম অঙ্কে অমাত্য মল্লভট্ট ওড়িশারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট এসে বিজয়নগরের অধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের কুশল জানিয়ে চৈতন্যদেবের দক্ষিণদেশ গমন বার্তা দিচ্ছেন এরকম উদাহরণ পাই। বিজয় নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের গুরু ছিলেন শ্রীব্যাসরায় ও চৈতন্যদেব উভয়েই।[১] সমগ্র দক্ষিণভারত ভক্তিরসের জোয়ারের ফলে কীর্তন, হরিকথা ইত্যাদি নৃত্যনাট্যগুলি লোকের মধ্যে আরও ভক্তিরসের সঞ্চার করে। সেই সময় দুজন বৈষ্ণবভক্ত তীর্থনারায়ণ যতি এবং তাঁর শিষ্য সিদ্ধেন্দ্রযোগীর আবির্ভাব ঘটে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এঁরা দুজন নৃত্য-গীত-নাট্যের প্রভূত উন্নতি ঘটান। তীর্থনারায়ণ যতি তেলেগু ব্রাহ্মণ এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গাইতে খুব ভালবাসতেন। সে জন্য সেখানকার লোকেরা বিশ্বাস করত যে, তিনি স্বয়ং জয়দেবের অবতার। তীর্থনারায়ণ নিজেও কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিণী' লেখেন। তার শিষ্য তেলেগু ব্রাহ্মণ সিদ্ধেন্দ্রযোগী লেখেন "পারিজাত হরণম"। এই দুই ভক্ত শিল্পী গুরুদের কুচিপুড়ি ও ভরতনাট্যমের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান আছে, যা জয়দেবের গীতগোবিন্দ বৈষ্ণবভক্তি ভাবনাতেই অনুপ্রাণিত।[২]

পূর্বভারতের এক অপূর্ব শাস্ত্রীয় নৃত্য মণিপুরী। মণিপুরী নৃত্যের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অবদান সর্বজন বিদিত। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নতুন করে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার শুরু করেন, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ প্রায় সারা ভারতকে মুগ্ধ করে। তখন থেকেই এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব পরিব্রাজকগণ ভারতের পূর্ব প্রান্তে গিয়েছিলেন। এই ভাবে বাংলা ও অসমের বুক বেয়ে গৌড়ীয় ধর্মপ্রচারকেরা মণিপুরের রাজদরবারে পৌঁছেছিলেন। কৃষ্ণ ভক্তিরসাশ্রিত এই ধর্মকে মণিপুরের মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ স্বাগত জানান। রাজা স্বয়ং বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী হওয়ায় বেশিরভাগ দেশবাসী স্বভাবতই একে স্বধর্ম রূপে গ্রহণ করে এবং মণিপুরী জনপদ কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে। রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রের শাসনকালেই (১৭৬৩-১৭৯৮) বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় মণিপুরে প্রচারিত ও আদৃত হয়। তাঁর সময়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত ধর্মে অনুপ্রাণিত শ্রীনরোত্তম গোস্বামীর মতাবলম্বীরা মণিপুরে এসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত ধর্মের প্রচার করেন। স্বয়ং

১। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য .... পৃঃ ১-২০।

২। Bhagavat Mela and Kuchipudi, by Prof. Mohan Khoker, MARG, 1957, Pg. 28-29.

মহারাজ এই ধর্মে দীক্ষা নেবার পর প্রচলিত রাসনৃত্যের এক নবীনরূপের প্রচার করেন। সেই নৃত্যকে বলা হয় 'নটসংকীর্তন'। অর্থাৎ মণিপুরী নৃত্যধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র, সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্যরীতির বিরাট অবদান আছে। পরবর্তীকালে মণিপুরী গুরু ও পন্ডিতবর্গের অসামান্য অবদানে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম দর্শনে নৃত্যশাস্ত্রে সংপৃক্ত মণিপুরী নৃত্যধারা আরও পল্লবিত হয়েছে।[১]

ভারতের আর একটি শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা 'কথক' বৈষ্ণবদর্শন, ইসলামীয় ও পারসিক সংস্কৃতির এক অপূর্ব নিদর্শন। কথক নৃত্যের মূল উপজীব্য বিষয়—রাধা কৃষ্ণলীলা। এই রাধাতত্ত্ব জয়দেব-বিদ্যাপতি-চন্ডীদাসের সময় থেকে শুরু হয় এবং চৈতন্যদেব এই রাধাবাদকে দৃঢ়ভাবে ভারতবর্ষে স্থাপিত করে যান। অর্থাৎ, সারা ভারতে রাধাবাদ প্রচলিত হওয়ার পেছনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিরাট অবদান আছে।

আজকে যে কথক নৃত্য দেখি তা রূপ পরিগ্রহ করেছে মূলত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। নবাবের দরবারে তৈরী হয় লখনউ ঘরানার কথক নৃত্য। সেই দরবারে দক্ষ নৃত্যশিল্পী বিন্দাদীন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কথকে ব্যবহৃত হত বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাস, গোবিন্দস্বামী, তানসেন প্রমুখ প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞদের রচিত গীতসমূহ।[২] নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ বৈষ্ণবদের রাসযাত্রা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন ১৮৪৩ সালে "রাধা কানহাইয়া কা কিস্‌সা।" নবাবের দরবারী রাস অনুষ্ঠিত হত লখনউয়ের কাইজার বাগ নামক অঞ্চলে। অভিনয়ে তিনি নিজে সাজতেন কানাই, বেগমরা হতেন গোপী।[৩] জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক ভানুজী ছিলেন শিবভক্ত। তাঁর পুত্র মালুজী ও পৌত্র লালুজী কানুজীর মাধ্যমে বংশপরম্পরায় 'শিবতাণ্ডব' নৃত্যের এই ঘরানা প্রচলিত হতে থাকে। কানুজী বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ ও লাস্যভাবযুক্ত "রাধাকৃষ্ণলীলা" নৃত্য রচনা করেন।[২]

লখনউ প্রভাব এবং ঠুম্‌রী, দাদরা, গজল ও বৃন্দাবনের প্রভাব থাকার ফলে ধ্রুপদ, ধামার, কীর্তন, ভজন ইত্যাদি এবং এছাড়া জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর পদ সহযোগেও কথক নৃত্য পরিবেশিত হত।[৪]

গৌড়ীয় গোস্বামীদের প্রভাব উদয়পুরের রাণী মীরাবাঈয়ের ওপরেও পড়েছিল। গিরিধারীর আকর্ষণে তিনি ব্রজে আসেন। এই স্বনামধন্যা সাধিকাও ব্রজভাষায় একটি 'গৌরপদ' রচনা করেছেন।[৫]

১। শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্তন, দর্শনকাবেরী ও কলাবতী দেবী, মণিপুরী নর্তনালয়, ১৯৯৩, পৃঃ ২।

২। ভারতের নৃত্যকলা ..... পৃঃ ২৫১-২৬৬।

৩। মেটিয়াবুরুজের নবাব, শ্রীপান্থ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃঃ ৯৯-১০০।

৪। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য .... পৃঃ ৩-৪।

৫। ঐ, পৃঃ ৩৮।

পাঞ্জাবের গুরুনানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রি:) শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ঈশ্বরদাসের ওড়িয়া চৈতন্য-ভাগবতে আছে, পুরীতে চৈতন্য সেবকদের মধ্যে ছিলেন নানক সেবক 'উদ্যও'। ঈশ্বরদাসের মতে নানক স্বয়ং পুরীতে চৈতন্যমন্ডলীর মধ্যে কীর্তন নৃত্য করেছিলেন।

নানক সারঙ্গ এই দুই, রূপসনাতন দুই ভাই।।
জগাই মাধাই একত্র কীর্তন করন্তি এ নৃত্য।।[১]

পূর্বভারতের প্রাচীন অসমীয়া কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে পুরীতে শংকরদেব চৈতন্যদেব সাক্ষাতের আগে চৈতন্যদেবের আসাম ভ্রমণ এবং শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য শংকরদেবের আগ্রহের কথা।[১]

বৃন্দাবনে সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি আঞ্চলিক ব্রজভাষা বা 'ব্রজভাখা'-তেও চৈতন্য প্রভাব লক্ষণীয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমাধুরীজী ব্রজভাষায় পদাবলী রচনা করেন। এগুলি সাতটি ভাগে বা মাধুরীতে বিন্যস্ত। প্রত্যেক মাধুরীর পূর্বে শ্রীচৈতন্য-এর বন্দনা আছে। শ্রীশুক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রীসরস মাধুরীজী 'সরস সাগর' নামক গ্রন্থে প্রায় তিন হাজার পদ রচনা করেছেন। এই সম্প্রদায় আলোয়ারে, জয়পুরে এবং রাজপুতনার স্থানে স্থানে বর্তমান। 'সরস সাগর' গ্রন্থে তৃতীয় ভাগে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুজীকো জন্মবধাই' শীর্ষক ৫৫টি পদ আছে।[১]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে সারা ভারত জুড়ে যে ভক্তিরসের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল সংগীত (গীত-বাদ্য-নৃত্য) জগতে পড়েছিল তার ব্যাপক প্রভাব। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের দেহাবসান হয়। তাঁর জীবন স্বল্প পরিসরের হলেও সৃষ্টি কিন্তু অজস্র। সেই অক্ষয় সৃষ্টি চৈতন্যর উত্তরসূরীরা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবাহিত রেখেছেন। ফলে সময় বদলালেও সমাজে অব্যাহত ছিল ভক্তিরসের ধারা। তাঁর অনুগামী বৃন্দাবনবাসী ষড়গোস্বামী শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর স্থাপিত করে, একে বিশিষ্ট মর্যাদার আসন দিয়ে গেছেন। সেই সময় বৃন্দাবন প্রায় জনশূন্য হয়ে কোনও রকমে টিঁকেছিল। সম্রাট সিকন্দর লোদীর অত্যাচারে মথুরামন্ডলে তীর্থযাত্রা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বৃন্দাবন ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। এই বৃন্দাবনকে আবিষ্কার করবার জন্য মহাপ্রভু প্রথমে ভূগর্ভ ও লোকনাথ স্বামীকে পাঠান, রূপ ও সনাতনকে তীর্থ উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। রূপ-সনাতন ষড়গোস্বামী বৃন্দাবনকে আবার বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত করেন। বৃন্দাবন সমগ্র আর্যাবর্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম সমগ্র আর্যাবর্তে প্রচারিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবিতকালে এবং তাঁর তিরোধানের

১। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য .... পৃঃ ১-৫০।

পর দলে দলে বাঙ্গালি বৈষ্ণব সাধকগণ বৃন্দাবনে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের দ্বারাই বাঙ্গালির সংস্কৃতিও আর্যাবর্তে প্রচারিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবনাময় জীবন, সাধন ও বাণী বাংলাসাহিত্যকে অপূর্বরূপ দান করেছে। মধ্যযুগে সাহিত্য বলতে প্রধানত বৈষ্ণব সাহিত্যকেই বোঝায়। এর মূল দুটি ধারা। এই সময় শ্রীচৈতন্যের জীবন ও সাধনার কথা বাণীরূপ লাভ করেছে। অন্যধারার নাম 'পদাবলী সাহিত্য'। চৈতন্য উৎসাহিত সংগীত কীর্তন দ্বারা রাধাকৃষ্ণ উপাসনা উৎসাহিত হল। তার ফলে সংগীতকলারও চরম উৎকর্ষ সাধিত হল। বৃন্দাবনে বিষ্ণুপদ গানসহযোগে নৃত্য পরিবেশিত হতে লাগল।[১,২]

শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করেন। এই পর্যটনের ফলে ভারতবর্ষের বিরাট জনজীবনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাভাষীর লোকেরাও প্রেম ভাব ধারার আদর্শে আপ্লুত হয়। এ ব্যাপারে চৈতন্যদেবের জীবনই হল যোগসূত্র এবং তারপরেও সেই সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা।[৩]

দ্বাদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের ধ্বংসলীলা পর্বের পর বাঙ্গালি সমাজ ও সংস্কৃতি পুনর্গঠিত হতে শুরু করেছে, বাংলা সাহিত্যের নতুনত্বের সূচনা দেখা দিয়েছে—পদ ও পাঁচালিতে, মঙ্গলকাব্যে ও পৌরাণিক অনুবাদে। পাঁচালি ছিল একধরনের গান—মৃদঙ্গ , মন্দিরা ও চামর সহযোগে নৃত্যসহ পরিবেশিত হত। নৃত্য-গীত সম্বলিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণলীলা অভিনীত হত যার নাম ছিল নাট্য-গীত। স্বয়ং চৈতন্যদেব 'রুক্মিণীহরণ' পালায় রুক্মিণীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করেছিলেন।[৪] হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল'-এ চৈতন্যদেবের নাচের কথা পাই। সেখানে উল্লেখ আছে শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্য রাধারূপে, অদ্বৈত কৃষ্ণরূপে এবং নিত্যানন্দ বড়ায়িবুড়ি রূপে দানলীলাযুক্ত 'নৌকাবিলাস'-এ নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য চৈতন্য জীবনী থেকে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য ও অন্য দুই প্রভু দানলীলায় নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। কিন্তু সে শান্তিপুরে নয়, নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে। আবার ভাবাবেশে চৈতন্যদেব সে অভিনয় শেষ করতে পারেন নি।[৫] চৈতন্য-ভাগবতে সনাতন গোস্বামীর বর্ণনায় চৈতন্যদেবের নৃত্য রূপের বর্ণনা পাই—

"কীর্তয়ন্তং মুহুঃ কৃষ্ণং জপধ্যানরতং ক্বচিৎ।
নৃত্যন্তং ক্বাপি গায়ন্তং ক্বপি হাসপরং ক্বচিৎ।[৬]

১। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য .... পৃঃ ১-৫০।

২। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, কালিদাস রায়, পৃঃ ১০।

৩। ঐ, পৃঃ ১০-১২।

৪। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার, (১ম খণ্ড), মুক্তধারা, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৩।

৫। ঐ, পৃঃ ৮১।

৬। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, সুকুমার সেন, রূপা, ১৯৭০, পৃঃ ১৩১-১৩২।

'কৃ' ধাতু থেকে 'কীর্তন' কথাটি এসেছে, 'কীর্তন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'প্রশংসা'। কোনও দেবদেবীর লীলাস্তব গানকে কীর্তন বলা হলেও রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক বর্ণনা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বর্ণনা মূলক পদাবলী এক বিশেষ সুরে ও তালে আখর যোজনাপূর্বক গাইবার রীতিকে 'কীর্তন' বলা হয়ে থাকে। 'কীর্তন' শব্দের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে চৈতন্যদেবের সময় থেকে। তবে শব্দটির উল্লেখ পাই ভাগবতে— 'স্মরণং কীর্তনং বিষ্ণো'। সম্ভবত 'কীর্তন' কথাটির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাই পূর্বভারতে অষ্টম শতকের মূর্তির তলায় লেখা শংকর-কীর্তন থেকে।[১] কীর্তন গান বাঙ্গালীর অমূল্য সম্পদ। এ গান বাংলার ঘরে ঘরে চিরকালই সমাদৃত হয়ে এসেছে। মধ্যযুগে বাদশাহ আকবরের শ্রেষ্ঠ দরবার গায়ক তানসেন যে সময় তার অপূর্ব সংগীত সৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এক নবজীবনের সূচনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় বৈষ্ণব-পদকর্তারা একের পর এক তাদের অভিনব সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার সংগীত ভান্ডারকে অলঙ্কৃত করতে শুরু করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত কীর্তন-সংগীতের অমৃতধারা বাংলার কাব্য ও সংগীতের প্রবহমান ধারার ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে আসছে এ কথা জোর দিয়ে বলা চলে।[২]

গৃহাশ্রমেও শ্রীচৈতন্য কীর্তন করতেন। চৈতন্যদেব যে সংকীর্তন করতেন তাকে বলা যায় 'নৃত্য-সংকীর্তন'। বাংলার ঘরে ঘরে কীর্তনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। আজও নাট্ মন্দিরগুলিতে, বৈষ্ণব আখড়ায় কীর্তনের আসর দেখা যায়। কীর্তনের, বিশেষত পদাবলী কীর্তনের মহাজন পদগুলি কথোপকথনের ঢঙে রচিত। উচ্চন্ডও মধুর নৃত্য দুই ভাবেই পরিবেশিত হয়। কীর্তন-সংগীতে থাকে নবরস, নায়ক-নায়িকাভেদ, পালা ইত্যাদির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় ও কথোপকথন সহযোগে পরিবেশিত লাবণ্যমন্ডিত নৃত্য। নাট্যশাস্ত্রের যুগে (খ্রিঃ পূ: ২০০-২০০ খ্রিষ্টাব্দ) অবশ্য বাংলার নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসারে ধ্রুপদী নৃত্যের চর্চা হত—"অঙ্গ বঙ্গ উৎকলিঙ্গা বৎসাশ্চৈবৌড্রমাগধাঃ"। অর্থাৎ বাংলায় এই সময় ঔড্রমাগধী নৃত্যধারা প্রবর্তিত ছিল এবং এই নৃত্যের বৃত্তি ছিল ভারতী ও কৈশিকী। ভারতী অর্থাৎ কথোপকথনের সঙ্গে উচ্চন্ডএবং কৈশিকী অর্থাৎ লাবণ্যমন্ডিত নৃত্য।[৩] এরপর খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতকে কলহণের রাজতরঙ্গিণীতে প্রমাণ

১। East India Art Style—A Study in Parallel Trends—B.N.Mukherjee, K.P.Bagchi & Co., Fig. 63.

২। শ্রেষ্ঠ কীর্তন স্বরলিপি, সম্পাদনা—অধ্যাপক বুদ্ধদেব রায়, নাথ ব্রাদার্স, মুখবন্ধ।

৩। ভরতনাট্যশাস্ত্র, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, চতুর্দশ অধ্যায়, 'প্রবৃত্তি' — নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

পাই নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসারে বাংলার মন্দিরে দেবদাসীরা নাচত। এরকমই একজন দেবদাসী 'কমলা'।[১]

এরকম আরও বহু প্রমাণ পাই এবং আমরা পূর্বেই জেনেছি বাংলার নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসারে যে নৃত্য হত তার বৃত্তি ছিল ভারতী ও কৈশিকী। নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসারে লাস্য নৃত্য মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত। তাই নিশ্চিত রূপে তা দেবতার যশমহিমা-প্রশংসাসূচক অর্থাৎ কীর্তন এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানের বাংলার কীর্তনও এই নাট্যশাস্ত্রের ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি অর্থাৎ কথোপকথন (Verbal dialogue) সহ উচ্চন্ড ও লাস্য বা মধুর নৃত্যের ভাব থেকে গেছে, যা বর্তমানের বৈষ্ণবমন্দির-আখড়াগুলিতে খোল-করতাল সহযোগে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা পরিবেশন করে থাকেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর কাল থেকে এই কীর্তন নবকলেবর ধারণ করে। নাট্যশাস্ত্রের কালে সাধারণত এই কথোপকথন সংস্কৃত ভাষায় হত, বর্তমানকালে তা সাধারণত বাংলায় হয়ে থাকে। মহাপ্রভু সংকীর্তনে নাচতেন এবং কোনও কোনও সময়ে 'ধুয়াপদ' গাইতেন, নাচের প্রকার ছিল দুরকম—উচ্চন্ড ও মধুর। 'ধুয়াগান' গাইতেন মূল গায়েন হিসেবে নয়, পালি গায়েন বা 'দোহার' হিসেবে মধুর নৃত্যের সঙ্গে। নাট্যশাস্ত্রে যে বৃন্দগানের উল্লেখ পাওয়া যায় গঠনগত বিশ্লেষণে কীর্তনের দলও ঠিক তাই। বৃন্দগানে মুখ্য গায়েন, সমগায়ন, মার্দঙ্গিক ইত্যাদি যে ভাষার প্রয়োগ আছে ঠিক তার বাংলা পরিভাষা মূলগায়েন, দোহার এবং বায়ান কীর্তনে প্রচলিত। অধমবৃন্দে একজন মুখ্য গায়ন, চারজন সমগায়ন এবং দুজন মার্দঙ্গিক থাকে। কীর্তনে সাধারণ দলও ঠিক তাই। 'এলা' প্রবন্ধের যে রূপটির উল্লেখ শার্ঙ্গদেব করেছেন তার সঙ্গে কীর্তনের কিছু সাদৃশ্য আছে। সংগীত রত্নাকরে সংগীতের স্বরূপভিত্তিক ভারতভূমিকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে—লাট, কর্ণাট, দ্রাবিড়, অন্ধ্র এবং গৌড়। প্রতিটি অঞ্চলেই এলা প্রবন্ধ প্রচলিত। তার মধ্যে গৌড় অর্থাৎ বঙ্গ তথা ভারতের পূর্বাংশে প্রচলিত এলাকে 'গৌড়েলা' বলা হয়েছে। ওই এলায় গমক, অনুপ্রাস থাকবে এবং রস প্রধান সংগীত হবে। গমক বলতে বোঝায় বাষ্পাকুল কণ্ঠ নির্গত স্বরের অস্ফুট স্বরবিন্যাস। কীর্তনে এই প্রকৃতির প্রয়োগ সর্বাধিক। অনুপ্রাস বলতে কাব্যিক অলঙ্কার বোঝায়। কীর্তনের প্রতিটি পদে ব্যাপক মাধুর্যপূর্ণ শব্দ সমন্বয় এবং অনুপ্রাস বহুলতা দেখা যায়। এছাড়াও রসের প্রাধান্য এত যে, কীর্তনীয় পদগুলির রসবিশ্লেষণ দ্বারা সমৃদ্ধশালী রসশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। কিলকিঞ্চিৎ, প্রেমবৈচিত্ত্যাদি, অনুভাবাত্মক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রসের সন্ধান কেবলমাত্র কীর্তনেই পাওয়া যায়। স্বর, বিরুদ, পদ, পাট, তেনক ও তাল নামে প্রবন্ধের

১। Kalhana's Rajatarangini. 4th Taranga, Vol. III, M.A. Stein, Motilal Banarsidass.

যে ছয়টি অঙ্গ এই সব কটিই কীর্তনে আছে, কীর্তন মেদিনী জাতীয় প্রবন্ধ এবং এর সঙ্গে নৃত্য হত। কীর্তনে নৃত্ত বিশুদ্ধ তাল লয়াশ্রিত (যেমন—আলাপচারী, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, করতাল নৃত্য, প্রভৃতি), অভিনয় আশ্রিত (যেমন— বলদেব নর্তন, রাধা নর্তন, কৃষ্ণ নর্তন), নাট্য অর্থাৎ, বিভিন্ন ধরণের পালা নৃত্য লীলাকীর্তন অর্থাৎ, ধ্রুপদী নৃত্যধারার তিনটি রূপই সুন্দরভাবে বিদ্যমান ছিল, যা সেই সময় থেকে আজও ক্ষিয়ষ্ণুরূপে বর্তমান। চৈতন্যদেবের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'নৃত্যসংকীর্তন' হয়েছিল সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে—দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে রথযাত্রায়। বঙ্গদেশ থেকে ভক্তরা মিলিত হয়ে এই 'মহানৃত্য-সংকীর্তন' করেছিলেন। মুখ্য অর্থাৎ চৈতন্যদেবের নিজস্ব চার সম্প্রদায় আর বঙ্গদেশের স্থানীয় তিন সম্প্রদায় এই সাত সম্প্রদায়ের কীর্তনে চৌদ্দ মৃদঙ্গ আর ছাপান্ন জোড়া করতাল বেজেছিল। মুখ্য সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিতে নির্দিষ্ট ছিল একজন প্রধান গায়েন, পাঁচজন পালিগায়েন (অর্থাৎ, দোহার), একজন নর্তক, দুজন মাঙ্গলিক। চারজন প্রধান গায়েন ছিলেন স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ। নর্তক ছিল যথাক্রমে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস ও বক্রেশ্বর। বঙ্গদেশের তিন সম্প্রদায় ছিলেন কুলীন গ্রামের, শান্তিপুরের ও শ্রীখন্ডের। এখানে নেচেছিলেন যথাক্রমে সত্যরাজ, রামানন্দ, অচ্যুতানন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন। সাত সম্প্রদায়ের এই কীর্তন এবং মহাপ্রভুর 'উচ্চন্ড নৃত্য' লোকের মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগিয়েছিল। শেষে তিনি 'মধুর নৃত্য' করেছিলেন স্বরূপের গাওয়া এই ধুয়াগান ধরে—

"সেই তো পরান নাথ পাইনু
যাহা লাগি মদন দহনে ক'রি গেনু"

রথাগ্রে প্রযোজ্য চৈতন্যদেবের এই কীর্তন 'পরিমুন্ডা কীর্তন' ও 'নৃত্য' হিসেবে বিখ্যাত।[১] এই নৃত্যরূপের কথা গোস্বামী প্রমুখ সকল বৈষ্ণব কবি উল্লেখ করে গেছেন। এই নৃত্যের প্রারম্ভে মহাপ্রভু কীর্তনীয়াগণকে সাতসম্প্রদায়ে বিভক্ত করে, এক এক সম্প্রদায়ের এক-একজন মহাজনকে নৃত্য করতে আদেশ দিয়েছিলেন—

"নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে।
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান
আর পঞ্চমজন দিল তার পালিগান।
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ
রাঘব পন্ডিত আর গোবিন্দানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য তাহা নৃত্য করিতে দিল

১। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ..........পৃ: ৫১-৫৩।

শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল।
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান শুভানন্দ।

বাসুদেব রঘুনাথ মুরারি যাহা গায়
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুইজন
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্তন।
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়।
সাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর
নৃত্য করে তাহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর
কুলীন গ্রামের এক কীর্তনীয়া সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ।
সত্যরাজ আচার্যের এক সম্প্রদায়
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়।
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।”

এর থেকে বেশ বোঝা যায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন করে মহাজন নৃত্য করেছিলেন।[১] জগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণ করে শ্রীচৈতন্য অনেকবার সংকীর্তন করেছিলেন। তা ‘বেঢ়া কীর্তন’ নামে প্রসিদ্ধ। এক প্রভাতি বেঢ়া কীর্তনে শ্রীচৈতন্য সাত সম্প্রদায় নিয়ে নৃত্য সংকীর্তন করেছিলেন। ‘উচ্চন্ড’ নৃত্যের শেষে তিনি নিজেই এই চমৎকার ওড়িয়া পদটি গেয়ে মধুর নৃত্য করেছিলেন—

“জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই
মনমাতিলা রে চকা চন্দ্রকু গাঞি।[১]

অদ্বৈত ছাড়া আরও দুজন পদাবলী গানে দক্ষ ছিলেন—মুকুন্দ ও স্বরূপ। সুকণ্ঠী মুকুন্দ গৃহাশ্রমে শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম গায়ক ছিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে হয়েছিলো স্বরূপ। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবকে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জয়দেবের পদাবলী শুনিয়ে তাঁর ‘কৃষ্ণবিরহ’ দাহে শান্তির প্রলেপ দিতেন। বৈষ্ণবসমাজে পদাবলী কীর্তনের এই ভাবেই সূত্রপাত

১। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ .... পৃঃ ৫১-৫৩।

হয়েছিল। কীর্তনে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যযন্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। সারা ভারতেই পদাবলী কীর্তন সংগীতের প্রচলন ও প্রসারতা ঘটেছে। বিশেষত দক্ষিণভারত, আসাম, মণিপুর, ওড়িশা ইত্যাদি অঞ্চলে এর প্রসার অধিক পরিমাণে লাভ করে। এ সম্পর্কে Dr. V.Raghavan এর মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—"The Geeta Govinda occupies indeed a key-position in the history of both music and dance and not only inspired numerous Sanskrit imitations but led to the outburst of a class of musical dance-drama in the local languages, sometimes with Sanskrit, in different parts of the compositions of Sankaradeva of Asam, of Umapati in Bihar of Bhagavatanatakas and Yakshaganas and the Krishnattam and Kathakali of the Andhra, Karnataka, Tamil and Malayalam areas—all return to Geeta Govinda as the ultimate source and inspiration. In the whole history of music or dance, in any part of the world, I do not think there has been a creation of a genius of greater destiny and potentiality than the Geeta Govinda of Jayadeva[১] (সর্বভারতীয় সংগীতে বিশেষত নৃত্যগীতে গীতগোবিন্দ মূল চাবির মত বিরাজ করছে। গীতগোবিন্দ যে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যকেই অনুপ্রাণিত করেছে তা নয়, এমন কি আঞ্চলিক ভাষা অথবা সংস্কৃত ভাষা মিশ্রিত আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করেছে। যেমন আসামের শংকরদেবের পদসমূহ, বিহারের উমাপতি, ভগবতমেলা নাটক, যক্ষগণ, কৃষ্ণনাট্টম, কথাকলি—অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিল, মালয়ালাম অঞ্চলের প্রত্যেককেই গীতগোবিন্দে ফেরৎ আসতে হয় মূল উৎস ও প্রেরণার স্থল হিসেবে। বিশ্বের নৃত্যগীতের ইতিহাসে জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের মত এমন সৃষ্টি বিরল এবং অদ্বিতীয়।) ৪৮ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে। কিন্তু কোথায় কীভাবে দেহাবসান হয় তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। অনেক প্রচলিত গল্প আছে তার মধ্যে একটি হল রথযাত্রার সময় নৃত্যকালে তিনি পায়ে আঘাত পান তাতেই দেহাবসান হয়।

কীর্তনের সৃষ্টিরহস্য বিচার না করেও সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যা ছিল উত্তম এবং মধ্যম বৃন্দগান, তারই অপভ্রংশ অধম বৃন্দ রূপে ছিল খ্রিষ্টিয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এবং পরবর্তী সংস্করণই রূপ নিল 'গৌড়েলা' প্রবন্ধের। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এ ছিল পূর্বভারতের প্রধান সংগীত। রাধাতত্ত্ব বিধৃত হল কতিপয় সংগীত কাব্যস্রষ্টার হাতে। প্রাকচৈতন্যযুগের কেন্দুবিল্বের গায়ক জয়দেব,

১। *Uparupaka and Nritya Prabandha,* Dr. V.Raghavan, Sangeet Natak, No. 76, April-June, 1985. Pg. 41-42.

মিথিলার গায়ক বিদ্যাপতি এবং নান্নুরের গায়ক চণ্ডীদাস মুখরিত হয়ে উঠলেন শ্রীমতী রাধার উৎকর্ষ-ব্যাখ্যায় আর রাধামুখে কৃষ্ণকথা বর্ণনাকে 'কীর্তন' নামে অভিহিত করলেন। সমগ্র ব্রজ-বর্ণনাই কৃষ্ণের যশোগাথা। তাই পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন শুভলগ্নেই এই সংগীত পদ্ধতিকে কীর্তন নামে অভিহিত করা হল। জয়দেব বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম বলে পরিগণিত হন। নাটকীয়তা ছিল প্রাচীন যুগের গানের প্রধান উপজীব্য এবং এই উপাদানটি কীর্তনে সর্বাধিক। পরবর্তীকালে এরই অনুকরণে নানাবিধ গানের সৃষ্টি হয়েছে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য গায়কদের মধ্যে ছিলেন স্বরূপ দামোদর, ছোট হরিদাস, শ্রীবাস, রামানন্দ, মুকুন্দ, বাসু ঘোষ প্রমুখ। এছাড়া শ্রীখন্ডের নরহরি সরকার, অগ্রদ্বীপের গোবিন্দ ঘোষ, জাজী গ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য সকলেই ছিলেন প্রতিভাবান গায়ক। তুর্কী শাসন, হাব্সী শাসনের দৌরাত্মে বাঙ্গালী শিল্পীদের শিল্পের কোন বিশেষ প্রদর্শনালয় ছিল না, তাই সংগীত (গীত-বাদ্য-নৃত্য) ছিল দেবমন্দিরে। তৎকালীন বর্ধিষ্ণু সমাজ ছিল নবদ্বীপে আর সেখানে ছিল একমাত্র নাট্যশালা শ্রীবাসের অঙ্গন। ওই অঙ্গনেই তৎকালীন ওই সমস্ত গায়ক শিল্পীদের সমাবেশ হত প্রত্যহ। রূপ, সনাতন , শ্রীজীব প্রমুখ বিদগ্ধ পন্ডিতবর্গ প্রেম প্রস্রবনের উৎস সন্ধানে বৃন্দাবনে গিয়ে উদ্‌ঘাটন করলেন অভিনব রস-রহস্য এবং ভক্তি-রহস্য। শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতন কীর্তনীয় সংস্কৃতপদ সৃষ্টি করে সংকলিত করলেন 'গীতাবলী' 'পদাবলী' ইত্যাদি গ্রন্থ। কীর্তন সংগীতের ঐতিহাসিক দিক বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই দেখা যায় যে এটি সম্পূর্ণরূপেই বঙ্গীয়, এমনকি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যে সব সমসাময়িক সঙ্গীত ধারা প্রচলিত ছিল কীর্তনের ওপর তার বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার ঘটেনি। তাই কীর্তন গৌড়বঙ্গের এক বিশিষ্ট সংগীতধারা যা প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বিশিষ্ট রূপে উৎসৃত হয়েছিল। নবদ্বীপের দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান আসমুদ্র হিমাচল আপ্লুত করেছিলেন ভক্তিরসে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে। কীর্তনে প্রচলিত তালগুলির প্রয়োগেও কতকগুলি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট আছে। প্রাচীনকালের তালের মাত্রার গতি সম্পর্কে অবহিত করবার জন্য হস্ত এবং অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা কখনও সশব্দ এবং নিঃশব্দ যেসব ক্রিয়া ব্যবহৃত হত, সেই পদ্ধতি ক্রিয়ার কিছু কিছু ব্যবহার কীর্তনাঙ্গীয় তাল পদ্ধতিতে দেখা যায়, কীর্তনাঙ্গীয় পদ্ধতিতে সশব্দ ক্রিয়াকে বলা হয় 'তাল'। প্রাচীন কীর্তন পদ্ধতিতে প্রতিটি গায়কের হাতেই একজোড়া কাংস্য নির্মিত করতাল থাকে, সশব্দ ক্রিয়াটি প্রকাশ করে ওই করতালের আঘাত দ্বারা। বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণবমন্দিরগুলির গায়ে, বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরের গায়ে করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ সহ নৃত্যের বহু অঙ্কিত সমৃদ্ধশালী ভাস্কর্য রয়েছে। অবশ্য অনেক সময় করতাল ধারণ না করেও হাতে তালি দিয়ে সশব্দ ক্রিয়া বোঝানো হয়। দ্বাদশ শতকের পন্ডিত গোবর্ধন আচার্য রচিত 'আর্যাসপ্তশতী'তে

পাই নৃত্য গীতের সঙ্গে হস্ততালের দ্বারা সংগত করা হত—"কৃত হ্‌সিত হস্ততালং"। এই তালির মাধ্যমে তালের প্রকৃতি বোঝাবার রীতি সুপ্রাচীন। চৈতন্যদেব নিজেও কীর্তনবিধি প্রচার নিমিত্ত 'দিশা দেখান প্রভু হাতে তালি দিয়া'—চৈতন্য ভাগবতে উক্ত আছে।

অর্থাৎ, ভারতীয় সংগীতে (গীত-বাদ্য-নৃত্য) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা চৈতন্যদেবের প্রভাব এবং তৎসহ জয়দেবের প্রভাব পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিরস ও প্রেমধর্মের জোয়ার সমগ্র বঙ্গদেশ তথা প্রায় সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করেছিল এবং আরও দেখা যায় যে, চৈতন্যদেবের প্রভাব বিদগ্ধ জনের ওপর যেমন পড়েছে ঠিক তেমনই পড়েছে লোক জীবনেও।

বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ডঃ বিমল রায়ের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বর্তমান নিবন্ধের পরিসমাপ্তি টানছি। ডঃ রায় বলেছেন—"ষোড়শ শতকের যুগ চৈতন্যদেবের যুগ। এযুগে পূর্বাঞ্চলে কীর্তন পদ্ধতির সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ... চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচারের সময়ে পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে বৃন্দাবনাদি, দক্ষিণে কর্ণাটক থেকে উত্তর পশ্চিমে গুজরাট পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপ কীর্তন সম্বন্ধে সারা ভারত অবহিত হয়েছিল।"[১]

১। নারদকৃত পঞ্চমসার সংহিতা ও দামোদর সেন কৃত সংগীত দামোদর, সম্পাদনা গুরু বিপিন সিংহ, মণিপুরী নর্তনালয়, ডঃ বিমল রায় কৃত ভূমিকা।

গৌড়ীয় নৃত্য ও নাট্যশাস্ত্র

আধুনিক ভারতে চর্চিত শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি সারাবিশ্বে সমাদৃত। এগুলির ঐতিহ্য অতীতাশ্রয়ী কিন্তু নবরূপে পুনর্গঠিত ও শাস্ত্রীয়রূপে পরিচিত, আধুনিক ভারতে বিংশ শতাব্দীতে। কোনটি স্বাধীনতার কিছু আগে, কোনটি বা পরে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক মোহন খোকরের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—"Four major forms of traditional dance speedily came to the fore during the Revival and each built up its own following. So rapidly did these dances emerge and so firmly did they establish themselves, that for a long time people believed that Bharata Natyam, Kathakali, Kathak and Manipuri were the only forms of classical dance in the Indian tradition. For years, almost all writing on Indian dance referred pointedly to "the four classical forms." Only later did it become increasing evident that a number of other modes rooted in the classical tradition existed.[১] (চারটি ঐতিহ্যবাহী নৃত্যকলা খুব দ্রুত পুনর্গঠন পর্বে সামনে এসে গেল। নৃত্যগুলি এত দ্রুত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেললো, যে বহুদিন পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত শাস্ত্রীয় নৃত্য শুধুমাত্র —ভরতনাট্যম, কথক, কথাকলি ও মণিপুরী। বহু দিন বেশীরভাগ পত্র পত্রিকায় চারটি শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসেবেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে জানা গেছে আরও বহু শাস্ত্রীয় নৃত্য ঐতিহ্য ভারতে বিদ্যমান।[১] এই পুনরুদ্ধার হওয়ার পর বিশ্বমানসে একে একে পরিচিতি লাভ করেছে শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসেবে ভরতনাট্যম (১৯৩৬ সাল), কথাকলি, কথক, মণিপুরী, কুচিপুড়ী, ওড়িশি, মোহিনীআট্টম। গৌড়ীয় নৃত্য পরিচিত হল প্রথম ১৯৯৩ সালে।

প্রচলিত একটা ধারণা ছিল বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য বলতে কিছু নেই। কিন্তু গৌড়ীয় নৃত্য পুনরাবিষ্কারের ফলে সেই ধারণা বদলেছে। বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারা বহু প্রাচীন, নাট্যশাস্ত্রের সময় বা তারও আগে থেকে; যার ফলে নাট্যশাস্ত্রে এর উল্লেখ পাই। গৌড়ীয় নৃত্যপদ্ধতি গভীরভাবে নাট্যশাস্ত্রানুসারী। সময়ের দাবীতে যুগের প্রয়োজনে, ঐতিহাসিক কারণে নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে।

১। Dance in Transition—Mohan Khokar, Marg, Vol. XXXXI, No. 2. Pg. 54.

সর্বভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে 'প্রবৃত্তি' অর্থাৎ চারপ্রকার নাট্য তথা নৃত্যের উল্লেখ আছে। তারমধ্যে 'ওড্রমাগধী' থেকে বর্তমানের ওড়িশি ও গৌড়ীয় নৃত্য উদ্ভূত। ওড্রমাগধী নৃত্য প্রসারের অঞ্চল যদি পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রায় পুরোটাই বৃহৎ বঙ্গ এবং একেবারে বাংলা সংলগ্ন অঞ্চলে এটি প্রচলিত ছিল—

"অঙ্গা বঙ্গা উৎকলিঙ্গা বৎসাশ্চৈবৌড্রমাগধাঃ।
পৌন্ড্রা নেপালকাশ্চৈব অন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ।।
তথা প্রবঙ্গ মাহেন্দ্রমলদা মল্লবর্তকাঃ।
ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতয়ো ভার্গবা মার্গবাস্তথা।।
প্রাগ্জ্যোতিষাঃ পুলিন্দাশ্চ বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
প্রাঙ্গপ্রভৃতয়ৎশ্চৈ যুঞ্জন্তি চৌড্রমাগধীম্।।"[১]

উপরোক্ত শ্লোকটি থেকে বৃহৎবঙ্গের যে অঞ্চলগুলি পাই সেগুলি হল—

অঙ্গ—বর্তমানের ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত, মুঙ্গেরের অন্তর্ভুক্ত।
বঙ্গ—বঙ্গদেশের মূল মধ্যভাগ।
পৌন্ড্র—উত্তরবঙ্গ মূলত রাজশাহী-বগুড়া ইত্যাদি অঞ্চল।
অন্তর্গিরি—বিহারের রাজমহল পাহাড় অঞ্চল।
বহির্গিরি—বীরভূম।
প্রবঙ্গ—বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণভাগ।
মলদা—মালদহ।
মল্লবর্তক—পুরুলিয়া এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লাগোয়া অঞ্চল।
ব্রহ্মোত্তর—মুর্শিদাবাদ অঞ্চল।
ভার্গবা—সিকিম-ভুটান অঞ্চল।
তাম্রলিপ্ত—তমলুক, দক্ষিণ-মেদিনীপুর ও হুগলী নদীর লাগোয়া ব-দ্বীপ অঞ্চল সমূহ।

প্রাঙ্গ— বাঁকুড়া

এছাড়া বাংলা লাগোয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্য কলিঙ্গ এবং প্রাগ্জ্যোতিষপুরের উল্লেখ পাই। এর দ্বারা বোঝা যায় যে ওড্রমাগধী নৃত্যধারা যথার্থই সারাবাংলা জুড়ে (বৃহৎবঙ্গ) ছড়িয়ে ছিল। দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত থেকে উত্তরের পৌন্ড্রবর্ধন তথা

১। ভরত নাট্যশাস্ত্র, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডঃ ছন্দা চক্রবর্ত্তী বঙ্গানুবাদ, চতুর্দশ অধ্যায়—'প্রবৃত্তি'—নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে মল্লভূম অর্থাৎ পুরুলিয়া ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত। এই নৃত্যের বৃত্তি বা style ভারতী ও কৈশিকী আশ্রিত।

"ভারতীং কৈশিকীং চৈব বৃত্তিমেষা সমাশ্রিতা।"[১]

ভারতী অর্থাৎ কথোপকথন সহযোগে উচ্চন্ড এবং কৈশিকী অর্থাৎ লাবণ্যমন্ডিত লাস্যাঙ্গ নৃত্য। এই ভারতী এবং কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ আমরা বহু বিবর্তনের মধ্যে ছৌ, কীর্তন, বিষহরা, নাচনী এবং বর্তমানে পুনপ্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়র মধ্যে দেখতে পাই।

ভারতবর্ষের যে কোন শাস্ত্রীয় নৃত্যই বর্তমানের শাস্ত্রীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে বিবিধ নৃত্যের বা নাট্যের প্রভাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাম্প্রতিককালের দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য ভরতনাট্যমের রূপরেখা তৈরীর পেছনে বহুবিধ গ্রামীণ নাট্যধারার অবদান আছে। তারমধ্যে—ভগবতমেলা নাটক, কুরুভাঞ্জী, কুচিপুড়ী গ্রামীণ নাট্য, সাদির এবং তেরুকুথুর (পথনাটক) প্রভাব ব্যাপক। এরকমভাবে কথাকলির রূপরেখার মূল উৎস দেখতে গেলে দেখা যাবে —অষ্টপদী আট্টম, (গীতগোবিন্দ), কুডিয়াট্টম, রামনাট্যম, কৃষ্ণনাট্যম, ইত্যাদি নাট্যধারার ওপর ভিত্তি করে কথাকলির উৎপত্তি হয়েছে। এরকমভাবে বর্তমান ভারতবর্ষে প্রচলিত সব কটি শাস্ত্রীয় নৃত্যেরই পটভূমি বহুবিধ নাট্য ও নৃত্যধারা। এ সম্পর্কে ডঃ কপিলা বাৎসায়নের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—"What we recognise the Orissi dance today, is an attempt at reconstruction of a dance form from all these fragments of the Mahari tradition of the Gotipua tradition, of the Bandhyanritya tradition of the martial arts and Chhau tradition known to Orissa, and the inspiration drawn from the sculptural relief and pictorial image. Thus on one level, Orissi is perhaps the oldest because of the sculptural evidence, on another level, it is youngest, because its revival or its neoclassical format emerged only in the 1950s of this century. After lying dormant or being fragmented or certainly underground for sixty years or may be hundred, it arose again as a new whole. The story of the reconstruction of the Orissi in Independent India is parallel to the story of the reconstruction of the Bharatanatyam is the 30's of this century. It is also parallel to the new lease of life which was given to Kathakali by the efforts of poet Vallathal in Kerala. In what is recognised as the art dance of Orissi, cognizance must be taken on this historical background. Often people mistake the full recital on

১। ভরত নাট্যশাস্ত্র, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডঃ ছন্দা চক্রবর্ত্তী বঙ্গানুবাদ, চতুর্দশ অধ্যায়—'প্রবৃত্তি'—নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

the stage as an authentic unbroken continuation of the ancient past. Infact, it is the reconstruction of the fragments available from different periods and millieus as also the immediate remote past.[১] (আমরা আজকে ওড়িশি বলে যে নৃত্যটিকে চিহ্নিত করি সেটি অনেকগুলি নৃত্য— মাহারী, গোটিপুও, বন্ধ্যানৃত্য [কসরৎ মূলক নাচ] উড়িষ্যার ছৌ ইত্যাদি নৃত্যগুলির অংশগুলির সংযোগে নতুন করে পুনঃনির্মিত হয়েছে। এর পাশাপাশি ভাস্কর্য থেকে, চিত্রকলা থেকেও সংযুক্ত হয়েছে। যদি ভাস্কর্য থেকে ওড়িশি নির্মিত হয়েছে ধরা হয় তাহলে এটি প্রাচীনতম নৃত্য কারণ উড়িষ্যার ভাস্কর্য প্রাচীনতম আবার অন্য দিকে যতগুলি শাস্ত্রীয় নৃত্য নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে নবীনতম। মাত্র ১৯৫০-এর পর এর পুনরুদ্ধারের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। বহুদিন সুপ্ত অবস্থায় বা ভগ্নদশা অবস্থায় থাকার পর এটি আবার নতুন করে নির্মিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে পুনঃনির্মাণের গল্প ঠিক পরাধীন ভারতের তিরিশের দশকে ভরতনাট্যমের পুনঃনির্মাণের সমান্তরাল এবং অবশ্যই কথাকলি পুনঃনির্মাণও পরাধীন ভারতে এই একই ভাবে হয়েছিল কবি ভাল্লাথোল দ্বারা। পুনঃনির্মাণের অতীত ইতিহাস অবশ্যই জানতে হবে। অনেকেই বর্তমানে ওড়িশি, ভরতনাট্যম, কথাকলি ইত্যাদির অনুষ্ঠান দেখে ভুল করেন যে এই নৃত্যগুলি হয়ত প্রাচীনকাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে এরকমই চলে আসছে তাই আমরা বর্তমান মঞ্চে দেখছি। সত্যি বলতে কি এগুলি বিভিন্ন যুগের নানা নৃত্যের অংশ এমনকি সদ্য অতীত হয়েছে সে সময়েরও অংশ সংযোগে তৈরী হয়েছে।)[১]

গৌড়ীয় নৃত্যে প্রাচীনকাল থেকে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে, বহুবিধ নাট্য-নৃত্যধারার ওপর আধার করে, মূলতঃ—কীর্তন, ছৌ, নাচনী ইত্যাদির ওপর আধার করে এর বর্তমান পরিকাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। কল্হণের রাজতরঙ্গিণী থেকে জানতে পারি খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ-অষ্টম শতকে গৌড়বঙ্গের মন্দিরে দেবদাসীরা নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে নৃত্য করতো—

"লাস্যং স দৃষ্টম্ বিশৎ কার্তিকেয় নিকেতনম্।
ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রবিৎ।।
ততো দেব গৃহদ্বার শিলামমধ্যস্ত স ক্ষণম্,
নর্তকী কমলা নাম কান্তিমন্তং দদর্শতম্।।"[২]

অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসারে বাংলার মন্দিরে নৃত্য হচ্ছে, দেবদাসী কমলা নাচছে। আমরা পূর্বেই জেনেছি বাংলায় নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসারে নৃত্য হতো তার

১। Indian Classical Dance by Kapila Vatsayan, Publication Division, Govt. of India, Second Reprint, 1997 (Saka 1999) Chapter — Odissi. Pg. 59

২। Kalhana's Rajatarangini, 4th Taranga Vol. III, M.A.Stein, Motilal Banarsidass.

বৃত্তি ছিল ভারতী ও কৈশিকী। যেহেতু এই নৃত্যটি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাই নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে বাংলার মন্দিরে দেবতার যশমহিমাসূচক অর্থাৎ লাস্য-কীর্তন নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান গৌড়ীয় নৃত্যের পূর্বরূপ শাস্ত্র অনুসৃত কীর্তন নৃত্য। বর্তমানে প্রচলিত বাংলার কীর্তনেও নাট্যশাস্ত্রে ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি অর্থাৎ কথোপকথন সহ উচ্চন্ড ও লাস্য বা মধুর নৃত্যের ঝংকার দেখা যায়। যা বর্তমানের বৈষ্ণবমন্দির-আখড়াগুলিতে খোল-করতাল সহযোগে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, সেবাদাস-সেবাদাসীরা পরিবেশন করে থাকেন। যদিও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নৃত্যের শাস্ত্রীয় রূপটি অনেকাংশে ক্ষয়িষ্ণু।

চৈতন্যদেবের সময় থেকে এই কীর্তন নবকলেবর ধারণ করে। নাট্যশাস্ত্রের কালে সাধারণত এই কথোপকথন সংস্কৃত প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষায় হতো, বর্তমানকালে তা সাধারণত বাংলায় হয়ে থাকে। মহাপ্রভু সংকীর্তনে নাচতেন এবং কোনও কোনও সময়ে ধুয়াপদও গাইতেন, নৃত্যের প্রকার ছিল দু রকম—উচ্চন্ড ও মধুর অর্থাৎ তান্ডব এবং লাস্য। 'ধুয়াগান' গাইতেন—মূল গায়েন হিসেবে নয়—পালি গায়েন বা 'দোহার' হিসেবে মধুর নৃত্যের সঙ্গে। মহাপ্রভুর সময়ে নৃত্যগীত সম্বলিত উত্তর প্রত্যুত্তরে (অর্থাৎ 'ভারতী' বৃত্তি অবলম্বনে) কৃষ্ণলীলা অভিনীত হতো — তার নাম ছিল নাটগীত বা নাট্যগীত। স্বয়ং চৈতন্যদেব 'রুক্মিনীহরণ' পালায় রুক্মিনীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গলে চৈতন্যদেবের নৃত্যের কথা আছে। সেখানে উল্লেখ আছে শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্য রাধারূপে, অদ্বৈত কৃষ্ণরূপে এবং নিত্যানন্দ বড়ায়িবুড়ি রূপে দানলীলা যুক্ত 'নৌকা বিলাস'-এ নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য চৈতন্যজীবনী থেকে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য ও অন্য দুই প্রভু দানলীলার নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। কিন্তু সে শান্তিপুরে নয়, নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে। আবার ভাবাবেশে চৈতন্যদেব সে অভিনয় শেষ করতে পারেননি।[১] চৈতন্য-ভাগবতে রামায়ণের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যাত্রা-অভিনয়ের কথা আছে।[২] গৃহাশ্রমেও চৈতন্যদেব কীর্তন করতেন। চৈতন্যদেব যে সংকীর্তন করতেন তাকে বলা যায় 'নৃত্য-সংকীর্তন'। সনাতন গোস্বামীর বর্ণনায় চৈতন্যদেবের নৃত্যরূপের বর্ণনা পাই—

'কীর্ত্তয়ন্তং মুহুঃ কৃষ্ণং জপধ্যানরতং ক্বচিৎ।
নৃত্যন্তং ক্বাপি গায়ন্তং ক্বাপি হাসপরং ক্বচিৎ।।[৩]

১। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খন্ড), গোপাল হালদার, মুক্তধারা, ১৯৮৬, পৃঃ ৮১।
২। বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খন্ড মধ্যযুগ), ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, জেনারেল, ১৩৮০, (বাংলা), পৃঃ ৩০৯।
৩। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, সত্যবতী গিরি, রত্নাবলী, পৃঃ ১৭৫।

সাম্প্রতিক গৌড়ীয় নৃত্যের পূর্বসূরী মধ্যযুগের রূপরেখার মূল প্রাণকেন্দ্র ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কীর্তন নৃত্য এবং প্রসিদ্ধ নর্তক ছিল চৈতন্যদেব। যিনি নাট্যশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। তাই তাঁর নৃত্যে-নাট্যে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবাবেশের কথা, তান্ডব-লাস্যের কথা, বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন রূপে নৃত্য-নৃত্ত ইত্যাদি উপস্থাপনার কথা পাই। নাট্যশাস্ত্রে যে বৃন্দগানের উল্লেখ পাওয়া যায়। গঠনগত বিশ্লেষণে গৌড়ীয় সংগীতের মূল সূরী কীর্তনের দলও ঠিক তাই। বৃন্দগানে মুখ্যগায়ন, সমগায়ন, মার্দঙ্গিক ইত্যাদি যে ভাষায় প্রয়োগ আছে ঠিক তার বাংলা পরিভাষা মূলগায়েন, দোহার এবং বায়ান কীর্তনে প্রচলিত। শুধু কীর্তনই নয়। বাংলার প্রায় যে কোনও গুরুপরম্পরা ধারাতেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় যেমন—কুশান, মনসাকীর্তন, বিষহরা ইত্যাদি। অধমবৃন্দে একজন মুখ্যগায়ন, চারজন সমগায়ন এবং দুজন মার্দঙ্গিক থাকে। কীর্তনে সাধারণ দলও ঠিক তাই। 'এলা' প্রবন্ধের যে রূপটির উল্লেখ শার্ঙ্গদেব করেছেন তার সঙ্গে কীর্তনের কিছু সাদৃশ্য বিচার করা যায়। সংগীত-রত্নাকরে সংগীতের স্বরূপভিত্তিক ভারতভূমিকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে—লাট, কর্ণাট, দ্রাবিড়, অন্ধ্র ও গৌড়। প্রতিটি অঞ্চলেই এলাপ্রবন্ধ প্রচলিত। তারমধ্যে গৌড় অর্থাৎ বঙ্গে প্রচলিত এলাকে 'গৌড়েলা' বলা হয়েছে। ওই এলায় গমক, অনুপ্রাস থাকবে এবং রসপ্রধান গীত হবে। গমক বলতে বাষ্পাকুল কণ্ঠ নির্গত স্বরের অস্ফুট স্বরবিন্যাস। কীর্তনে এই প্রকৃতির প্রয়োগ সর্বাধিক। অনুপ্রাস বলতে কাব্যিক অলঙ্কার বোঝায়। কীর্তনের প্রতিটি পদে ব্যাপক মাধুর্যপূর্ণ শব্দ সমন্বয় এবং অনুপ্রাস বহুলতা দেখা যায়। এছাড়া রসের প্রাধান্য এত যে, কীর্তনীয় পদগুলির রসবিশ্লেষণ দ্বারা সমৃদ্ধশালী রসশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। কিলকিঞ্চিৎ, প্রেমবৈচিত্ত্যাদি, অনুভাবাত্মক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রসের সন্ধান কেবলমাত্র কীর্তনেই পাওয়া যায়। স্বর, বিরুদ, পদ, পাট, তেনক ও তাল নামে প্রবন্ধের যে ছয়টি অঙ্গ এই সব কটি অঙ্গই গৌড়ীয় সংগীতে তথা কীর্তনে আছে এবং তা মেদিনী জাতীয় প্রবন্ধ।[১]

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য নাট্যশাস্ত্র আধারিত—এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মণ সেনের দরবারের সভাকবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দে। গীতগোবিন্দ গ্রন্থটি একাধারে অমূল্য সাহিত্য, অন্যদিকে নাট্যশাস্ত্রানুসারে নৃত্যের আঙ্গিক অভিনয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। এই গীতগোবিন্দের ভূমিকায় বলা আছে দ্বাদশ শতকে জয়দেব রচনা করেন এবং পরবর্তীকালে শিষ্য-প্রশিষ্য আঙ্গিক অভিনয় সমেত ব্যাখ্যা করে যান। অর্থাৎ রচনাটি দ্বাদশ-চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী

১। তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, ডঃ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, ফার্মা কে.এল.এম.প্রা.লি. ১৯৮৬, পৃঃ ১১৮-১২৩।

সময়কার। এই উদাহরণের দ্বারা তৎকালীন বাংলায় যে নাট্যশাস্ত্রানুসারে শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রচলিত ছিল তার পরিষ্কার চিত্র পাই। ছোট একটি উদাহরণ প্রদত্ত হল—

"শ্রিতকমলা কুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল।
শ্রিত - মিলিত সূচীমুখাভ্যাম্ (সূচীমুখ হস্তদ্বয় একত্রিত হওয়া)
(সূচীমুখ হস্তদ্বয় একত্রিত হওয়া)

কমলা—কমলাবর্তনয়া কর্ষিত অঞ্চল ঘটকামুখেন।
(বর্তিত করে পদ্ম এবং খটকামুখ দ্বারা আঁচল আকর্ষণ বোঝানো।)

কুচমণ্ডল—স্বস্তিকীকৃত পদ্মকোশাভ্যাম্ (পদ্মকোশ হস্তদ্বয় স্বস্তিকীকৃত)

ধৃতকুণ্ডল—কর্ণাধোদেশাচ্ছনৈরধস্তলীকৃত পতাকেন।
(কানের নীচের দিকে পতাকা হস্ত আস্তে আস্তে নাড়িয়ে কুন্ডল বোঝানো)।[১]

নাট্যশাস্ত্রানুসারী অসংযুত হস্ত, সংযুত হস্ত, হস্তকরণ শিরোভেদ সমস্তই বর্ণিত। অর্থাৎ দ্বাদশ-চতুর্দশ শতকে গৌড়বঙ্গের শাস্ত্রীয় নৃত্যে নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব ব্যাপক।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যায় বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই বহু নাট্যসাহিত্য রচিত চর্চিত ও প্রযোজিত হয়েছে। যেমন—তারা ও মঞ্জুশ্রী স্তোত্র এবং লোকানন্দ নাটক (চন্দ্রগোমিন্ রচিত, ৫ম-৬ষ্ঠ শতক), বাসবদত্তা (সুবন্ধু রচিত, ৬ষ্ঠ শতক), চর্যাপদ ও নাথসাহিত্যে তৎকালীন বৌদ্ধ সাধকদের সাধন-সংগীতে বাঙালীর নাট্যাভিনয়ের সঙ্কেত পাওয়া যায়। বজ্রাচার্য ও দেবী দুজনে মিলিত হয়ে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী নৃত্য-গীতের মাধ্যমে অভিনয় করেছিলেন।

"নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই। চর্যাপদ সং।১৭।[২]

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত থেকে জানা যায় যে সেই যুগে রাত জেগে লোক মনসার গান শুনতো, যোগীপাল-ভোগীপালের গীত শুনতো, চন্ডীবাসুলীর নাট্য হতো, শিবের নৃত্য-গীত হতো, কৃষ্ণলীলা খুব জনপ্রিয় ছিল অর্থাৎ প্রধান রূপ ছিল গীত ও পাঁচালী। পাঁচালী ছিল একধরণের গান—মৃদঙ্গ, মন্দিরা, চামর হস্তে নৃত্যগীত হতো। মূলগায়েন চামর হস্তে নাচতো এবং গাইতো,অন্যরা দোহার হিসেবে হতো তার সহযোগী। উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণলীলা অভিনীত হতো। তাকে বলা হতো নাট্যগীত বা নাটগীত।

১। Gita Govinda, edited by T.Vasudeva Shastri, Sarasvati Mahal Library, Tanjavur, 1988, Pg. 15-16.

২। বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ডঃ আশা দাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৯, পৃঃ ৫৩১।

অভিজাত সমাজে নাটগীত এবং অনভিজাত সমাজে লোকনাট্য প্রচলিত ছিল।[১] বড়ু চন্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' অভিনীত হতো। নৃত্য ও অভিনয়ের দ্বারাই কাব্যের রসকে ব্যঞ্জনা দেওয়া হত।[২] এরূপ নাট্যাভিনয় পদ্ধতি বহু প্রাচীন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কৃষ্ণলীলার প্রথম বাংলা কাব্য। প্রাচীন বাংলায় শুধুমাত্র নাট্যরচনা-প্রযোজনা-চর্চাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, নাট্য বিদ্যার চর্চাও যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল। যার ফলে প্রচুর শাস্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং সবগুলিই নাট্যশাস্ত্র আধারিত। গৌড়বঙ্গের সংগীত শাস্ত্রজ্ঞরাই লিখেছিলেন—

শাস্ত্রগ্রন্থ	রচনাকাল (আনুঃ)	রচয়িতা	অঞ্চল
১। সংগীতদামোদর	১৩শ-১৫শ শতাব্দী	পন্ডিত শুভঙ্কর	উত্তরবঙ্গ
২। শ্রীহস্তমুক্তাবলী	,,	,,	,,
৩। গোপালচম্পূ	১৫শ শতাব্দী	শ্রীজীব গোস্বামী	গৌড়বঙ্গ
৪। নাটকচন্দ্রিকা	১৫শ শতাব্দী	রূপগোস্বামী	,,
৫। উজ্জ্বলনীলমণি	,,	,,	,,
৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু	,,	,,	,,
৭। রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা	,,	,,	,,
৮। আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ	,,	কবিকর্ণপুর	,,
৯। অলঙ্কার কৌস্তভ	,,	,,	,,
১০। নারদপঞ্চমসার সংহিতা	১৬শ শতক	নারদ	,,
১১। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্	,,	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	বর্ধমান
১২। সংগীত দামোদর	,,	দামোদর সেন	বাংলা
১৩। নায়িকা রত্নমালা	১৭শ শতক	চন্দ্রশেখর-শশীশেখর	,,
১৪। রসমঞ্জরী	,,	পীতাম্বর দাস	,,
১৫। রসকল্পবল্লী	,,	রামগোপাল দাস	,,
১৬। ক্ষণদাগীত চিন্তামণি	,,	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,,
১৭। কৃষ্ণভাবানামৃতম	,,	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	বাংলা
১৮। শ্রীভক্তি রত্নাকর	১৮শ শতক	নরহরি চক্রবর্ত্তী	,,
১৯। রাগরত্নাকর	১৮শ শতক	নরহরি চক্রবর্ত্তী	বাংলা

১। বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক, ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (২৫শে বৈশাখ), পৃঃ ২১-২৯।

২। বাংলাসাহিত্য, ডঃ মনমোহন ঘোষ, ইন্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, পৃঃ ৪৯-৫০।

শাস্ত্রগ্রন্থ	রচনাকাল (আনুঃ)	রচয়িতা	অঞ্চল
২০। সংগীতসারসংগ্রহ	১৮শ শতক	নরহরি চক্রবর্ত্তী	বাংলা
২১। গীতচন্দ্রোদয়	”	”	”
২২। পদামৃতসমুদ্র	”	”	”

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে বর্তমানে প্রচলিত শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির বেশীর ভাগই নন্দীকেশ্বর বিরচিত 'অভিনয়দর্পণ' অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু নন্দীকেশ্বর কোন অঞ্চলের তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। কিন্তু বিংশ শতকের মধ্যভাগে এক একটি শাস্ত্রীয় নৃত্য পুনর্গঠিত হয়ে স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করলো; যেমন ১৯৩৬ সালে ভরতনাট্যম এবং রুক্মিণীদেবী। অরুন্ডেল 'অভিদয়দর্পণ'-কে ভরতনাট্যমের শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। (ভারতীয় যাদুঘর কোলকাতা আয়োজিত ১৯৯৮ সালে ২রা-৩রা ফেব্রুঃ ডঃ পদ্মা সুব্রহ্ম্যণিয়ম প্রদত্ত ভাষণ থেকে গৃহীত) এবং এরপর একটি একটি করে শাস্ত্রীয় নৃত্য স্বীকৃতি পেয়েছে আর উক্ত গ্রন্থটিকেই গ্রহণ করে নিয়েছে।

আঙ্গিক অভিনয়—এবার আঙ্গিক অভিনয়ে নাট্যশাস্ত্র ও গৌড়ীয় নৃত্য

হস্ত—আঙ্গিক অভিনয়ে 'হস্ত' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে নৃত্তহস্ত ও নৃত্যহস্ত মূল—এই দুইভাগে ভাগ করতে পারি। এছাড়া মিশ্রহস্ত, দেবহস্ত, বর্ণহস্ত, জাতি হস্ত, আত্মীয়হস্ত ইত্যাদি বহুবিধ হস্ত আছে।

নৃত্তহস্ত—যে হস্ত সৌন্দর্যবর্ধক এবং তালের নাচের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

নাট্যশাস্ত্রে নৃত্তহস্ত—৩১টি

শ্রীহস্তমুক্তাবলীতে—২৭টি

নাট্যশাস্ত্র	শ্রীহস্তমুক্তাবলী
১। চতুরস্র	চতুরস্র
২। উদবৃত্ত	উদ্‌বৃত্ত
৩। তলমুখ	নতমুখ
৪। স্বস্তিক	স্বস্তিক
৫। অরালখটকামুখ	অরালখটকামুখ
৬। আবিদ্ধব্রক্তক	আবিদ্ধবক্ত্রা
৭। সূচীমুখ (সূচাস্য)	সূচাস্য
৮। রেচিত	রেচিত
৯। অর্ধরেচিত	অর্ধরেচিত
১০। উত্তানবঞ্চিত	উত্তানরেচিত

নাট্যশাস্ত্র	শ্রীহস্তমুক্তাবলী
১১। পল্লব	পল্লব
১২। নিতম্ব	নিতম্ব
১৩। কেশবন্ধ	কেশবন্ধ
১৪। লতা	লতা
১৫। করীহস্ত	করীহস্ত
১৬। পক্ষবঞ্চিতক	পক্ষবঞ্চিত
১৭। পক্ষপ্রদ্যোতক	পক্ষ প্রদ্যোতক
১৮। দন্ডপক্ষক	দন্ডপক্ষক
১৯। উর্ধ্বমন্ডলী	উর্ধ্বমন্ডলী
২০। পার্শ্বমন্ডলী	পার্শ্ব মন্ডলী
২১। উরোমন্ডলী	উরোমন্ডলী
২২। উরঃপার্শ্বার্ধমন্ডলী	উরঃপার্শ্বমন্ডলী
২৩। মুষ্টিকস্বস্তিক	মুষ্টিকস্বস্তিক
২৪। নলিনীপদ্মকোশক	নলিনীপদ্মকোশক
২৫। অলপল্লব	অলপদ্মোন্নত
২৬। উল্বন	
২৭। বলিত	
২৮। বিপ্রকীর্ণ	বিপ্রকীর্ণ
২৯। গরুড়পক্ষ	গরুড়পক্ষ
৩০। ললিত	
৩১। হংসপক্ষ	

এই আলোচনায় নন্দীকেশ্বর রচিত 'অভিনয়দর্পণ' সম্পর্কে বলা যায় নৃত্তহস্ত বিষয়টি অনুচ্চারিত অর্থাৎ কোন উল্লেখ নেই। 'অভিনয়দর্পণ' ভরতনাট্যম, ওড়িশি, কুচিপুড়ি ও মোহিনীআট্টমের প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ।

নৃত্যহস্ত—প্রধানত দুই প্রকার—অসংযুত ও সংযুত।

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী অসংযুত — ২৪ প্রকার

শ্রীহস্তমুক্তাবলী অনুযায়ী — ৩০ প্রকার

অভিনয়দর্পণ অনুযায়ী — ২৮ প্রকার।

এছাড়াও আছে জাতিহস্ত, বর্ণহস্ত, আত্মীয়হস্ত, নবগ্রহহস্ত, দশাবতার হস্ত ইত্যাদি।

নাট্যশাস্ত্র	শ্রীহস্তমুক্তাবলী	অভিনয়দর্পণ
১। পতাক	১। পতাক	১। পতাক
২। ত্রিপতাক	২। পদ্মকোশ	২। ত্রিপতাক
৩। কর্তরীমুখ	৩। হংসাস্য	৩। অর্ধপতাক
৪। অর্ধচন্দ্র	৪। কর্তরীমুখ	৪। কর্তরীমুখ
৫। অরাল	৫। অলপদ্ম	৫। ময়ূর
৬। শুকতুন্ড	৬। ত্রিপতাক	৬। অর্ধচন্দ্র
৭। মুষ্টি	৭। মুষ্টিক	৭। অরাল
৮। শিখর	৮। শিখর	৮। শুকতুন্ড
৯। কপিত্থ	৯। অর্ধচন্দ্র	৯। মুষ্টি
১০। কটকামুখ	১০। সর্পশির	১০। শিখর
১১। সূচাস্য (সূচীমুখ)	১১। সূচাস্য	১১। কপিত্থ
১২। পদ্মকোশ	১২। খটকামুখ	১২। কটকামুখ
১৩। সর্পশীর্ষ	১৩। অরাল	১৩। সূচী
১৪। মৃগশীর্ষ	১৪। শুকতুন্ড	১৪। চন্দ্রকলা
১৫। কাঙ্গুল	১৫। সংন্দশ	১৫। পদ্মকোশ
১৬। অলপদ্ম (অলপল্লব)	১৬। কাঙ্গুল	১৬। সর্পশীর্ষ
১৭। চতুর	১৭। ঊর্ণনাভ	১৭। মৃগশীর্ষ
১৮। ভ্রমর	১৮। কপিত্থ	১৮। সিংহমুখ
১৯। হংসাস্য	১৯। মৃগশীর্ষক	১৯। কাঙ্গুল
২০। হংসপক্ষ	২০। হংসপক্ষ	২০। অলপদ্ম
২১। সন্দেশ	২১। তাম্রচূড়	২১। চতুর
২২। মুকুল	২২। চতুর	২২। ভ্রমর
২৩। ঊর্ণনাভ	২৩। মুকুল	২৩। হংসাস্য
২৪। তাম্রচূড়	২৪। ভ্রমর	২৪। হংসপক্ষ
	২৫। কদম্ব	২৫। সংন্দশ
	২৬। কৃষ্ণসার	২৬। মুকুল
	২৭। ঘ্রোণিক	২৭। তাম্রচূড়
	২৮। সিংহাস্য	২৮। ত্রিশূল
	২৯। অঙ্কুশ	
	৩০। তন্ত্রীমুখ	

নাট্যশাস্ত্রমতে সংযুক্ত হস্ত — ১৩টি
শ্রীহস্তমুক্তাবলী মতে — ১৪টি
অভিনয়দর্পণমতে — ২৩টি। পরবর্তীকালে ১টি সংযুক্ত হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্র	শ্রীহস্তমুক্তাবলী	অভিনয়দর্পণ
১। অঞ্জলি	১। গজদন্ত	১। অঞ্জলি
২। কপোত	২। কপোত	২। কপোত
৩। কর্কট	৩। বর্ধমান	৩। কর্কট
৪। স্বস্তিক	৪। অঞ্জলি	৪। স্বস্তিক
৫। কটকাবর্ধমান	৫। নিষধ	৫। দোল
৬। উৎসঙ্গ	৬। কর্কট	৬। পুষ্পপুট
৭। নিষধ	৭। উৎসঙ্গ	৭। উৎসঙ্গ
৮। দোল	৮। অবহিত্থ	৮। শিবলিঙ্গ
৯। পুষ্পপুট	৯। স্বস্তিক	৯। কটকাবর্ধন
১১। গজদন্ত	১১। মকর	১১। কর্তরীস্বস্তিক
১২। অবহিত্থ	১২। দোল	১২। শকট
১৩। বর্ধমান	১৩। পুষ্পপুট	১৩। শঙ্খ
	১৪। মরাল	১৪। চক্র
		১৫। পাশ
		১৬। কীলক
		১৭। মৎস্য
		১৮। কূর্ম
		১৯। বরাহ
		২০। গরুড়
		২১। নাগবন্ধ
		২২। খট্বা
		২৩। ভেরুন্ড

পাদভেদ—নাট্যশাস্ত্রে পাদভেদ পাঁচ প্রকার—উদ্‌ঘট্টিত, সম, অগ্রতলসঞ্চর, অঞ্চিত, কুঞ্চিত। গৌড়ীয় নৃত্যের পদভেদ ১৩ প্রকার—সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্য, অগ্রতালসঞ্চর, মর্দিত, ঘাটিত, অগ্রগ, পার্শ্বগ, পার্ষ্ণিগ, তাড়িত, উচ্ছেধ, উদ্‌ঘাটিত।

স্থানক—নাট্যশাস্ত্রমতে স্থানকভেদ ছয় প্রকার—বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মন্ডল, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়।

সংগীত দামোদর মতে স্থানক ৩৩ প্রকার—সংহত, সমপাদ, স্বস্তিক, বর্ধমান, নন্দ্যাবর্ত, চতুরস্র, পার্ষ্ণিবিদ্ধ, একপার্শ্বগত, একজানুগত, পরাবৃত্ত, পৃষ্ঠোত্তান, দলন, একপাদ, ব্রহ্ম, বৈষ্ণব, গরুড়, শৈব, বৃষভাসন, পার্ষ্ণিপার্শ্বগত, সমসূচী, বিষমসূচী, খন্ডসূচী, বিশাখ, বৈতান, সংকুন্ডল, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, অর্ধমন্ডল, উর্ধ্বাসন, কমলাসন, জানুবর্তিতক, মান্ডুক, দার্দুর। উপরোক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত ছয়টি স্থানক গৌড়ীয় নৃত্যেও প্রযুক্ত।

রস—নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী 'রস' আট প্রকার। পরবর্তীকালে রস নয়টি বলে স্বীকৃত হয়েছে। সংগীত দামোদর, শ্রীভক্তিরত্নাকর মতে রস নয় প্রকার এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রকারদের মতে মূলরস 'ভক্তিরস'। ভক্তিরস দুই প্রকার—মুখ্য ভক্তিরস ও গৌণ ভক্তিরস। মুখ্যভক্তি রস পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লেখিত —

"রতিভেদ ভক্তিবেদ পঞ্চপ্রকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর।।
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রসপঞ্চভেদ।।
শান্তদাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুররস নাম।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ শৃঙ্গার বা মধুর রসকে আরও বিস্তৃত করেছেন ৬৪ ভাগে ভাগ করেছেন। ৩২টি সম্ভোগ এবং ৩২টি বিপ্রলম্ভ এবং প্রত্যেকটিরই আলাদা গান আছে যা এখনও বাংলার কীর্তনীয়ারা নৃত্যের সঙ্গে সুন্দরভাবে পরিবেশন করে থাকেন। নাট্য শাস্ত্রের আটটি রস — শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত। গৌড়ীয় নৃত্যে এই আটটি রসই উল্লেখিত ও প্রযুক্ত হয়। তার সঙ্গে উপরোক্ত আরও বিস্তৃত রস ব্যবহৃত হয়।

করণ—নাট্যশাস্ত্রোক্ত করণ তৎকালে প্রচলিত শাস্ত্রীয় নৃত্যের আধার বা একক। সাধারণভাবে হস্তপদ সঞ্চালনসহ বিবিধ ভঙ্গি হল 'করণ'। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী করণ '১০৮'টি —শিবকরণ হিসেবে অভিহিত। গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রগ্রন্থ সংগীত দামোদরেও করণ ১০৮টি। এগুলি বিষ্ণুকরণ হিসেবে অভিহিত। একটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল চারটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের (ভরতনাট্যম, ওড়িশি, কুচিপুড়ি ও মোহিনী আট্টম) শাস্ত্রগ্রন্থ অভিনয়দর্পণ। অভিনয়দর্পণে করণের তথা অঙ্গহার ইত্যাদির কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। নাট্যশাস্ত্রোক্ত ১০৮টি করণের সঙ্গে সংগীত দামোদরে উল্লেখিত ১০৮টি করণের বহু মিল পাই, তার মধ্যে শুধু সংগীত দামোদরে উল্লেখিত মুকুল ও সূচীপাদ—এই দুটি করণ নাট্যশাস্ত্রে পাই না; আবার নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত মদস্খলিত ও অর্গল

সংগীত দামোদরে পাই না।[১] অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গ, করণ, অঙ্গহার, রস অর্থাৎ আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক ভাব ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গৌড়ীয় নৃত্য সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্রানুসারী এবং তার স্বকীয় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

আহার্য ও অভিনয়—নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে বাংলার নাট্যের বা নৃত্যের শিল্পীরা শ্যামবর্ণের অঙ্গরাগ করবেন।

'পাঞ্চালঃ শূরসেনাশ্চ তথা চৈবৌড্রমাগধঃ।
অঙ্গা বঙ্গা কলিঙ্গাস্তু শ্যামাঃ কার্য়াস্তু বর্ণতঃ।[২]

নাট্যশাস্ত্রে গৌড়বঙ্গের শিল্পীদের চুলবাঁধার রীতির উল্লেখ আছে—

"গৌড়ী নামলকং প্রায় সশিখা পাশবেণিকম।"[৩]

এই ধরণের চুলবাঁধার রীতি খৃঃ পূঃ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রাপ্ত ভাস্কর্যে, সাহিত্যে এবং গ্রামীণ গুরু পরম্পরা নৃত্যধারায় পাই। সংগীত দামোদরে পোশাক বেশভূষার বর্ণনা আছে—

'অঞ্জনং শুদ্ধসিন্দূরং পত্রাবল্যথ যাবকঃ।
তাম্বুলরাগোৎপ্যলকাঃ কেশান্তে পট্টগুচ্ছকঃ।।
পটবাসশ্চিত্রপটঃ কটকং রত্নমুদ্রিকা।
মুক্তাহারঃ কঙ্কণকং গ্রৈবেয়কমথাঙ্গদম্।।
সৈমন্তিকস্তুলাকোটিঃ কুন্ডলং কর্ণচুলিকা।
বিশেষকোঅবতংসশ্চ কাঞ্চীকপ্ঞ্চুলিকাদয়ঃ।
সন্তি যাবচ্চতুঃ ষষ্টিমপরাশ্চ সুবিস্তারাঃ।।[৪]

—অর্থাৎ কাজল, সিঁদুর, চন্দন, আলতা, ওষ্ঠরঞ্জিত করার জন্য তাম্বুল বা পান, বিনুনীর আগায় পট্টগুচ্ছ বা সিল্কের ট্রাসেল, রত্নখচিত সিল্কের বস্ত্র, পুষ্পের ডিজাইন করা পায়ের মল, মুক্তাহার, কঙ্কণ, গ্রীবাহার বা কণ্ঠহার, অঙ্গদ, সৈমন্তিক তুলাকোটি, টিক্‌লি ইত্যাদি, কুন্ডল, কর্ণচুলিকা বা পুরো কানঢাকা অলঙ্কার, কপালে তিলক, অবতংস বা মস্তকে কিরাট হার, কাঞ্চী পোশাক সামনে কুঁচি ঝোলানো অর্থাৎ বর্তমানে সেলাই

১। সর্বভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ ও প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রগ্রন্থে করণ—বনানী চক্রবর্ত্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংগীত আকাদেমী পত্রিকা (৪র্থ সংখ্যা), ১৯৯৯, পৃঃ ৮৬।
২। ভরত নাট্যশাস্ত্র (৩য় খন্ড), সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ ছন্দা চক্রবর্ত্তী, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২, পৃঃ ১০৩-১০৪।
৩। ঐ, পৃঃ ৯৫।
৪। পন্ডিত শুভঙ্কর বিরচিত সংগীত দামোদর, সম্পাদনা গৌরীনাথ শাস্ত্রী এবং গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬০, পৃঃ ৫১।

করা পাজামা মত পোশাক সামনে কুঁচি ঝোলানো। এই পোশাক অলঙ্কার দেখতে পাই বাংলার ভাস্কর্যে চিত্রকলায়, সাহিত্যে বর্ণনা পাই। যেমন—গোবর্ধন আচার্যের আর্যা সপ্তশতী (১২ শতক), জয়দেবের গীতগোবিন্দ (১২ শতক), রূপ গোস্বামীর (রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা), মঙ্গলকাব্যে, নাথগীতিকায়। যেমন নাথ সাহিত্যে বর্ণনা আছে—

"গায়েতে কাঞ্চলি দিল
কোমর কাছটি" বা

চন্ডীমঙ্গলকাব্যে বর্ণনা পাই—

পরিদিব্য পাটশাড়ী কনকরচিত চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ
হীরামোতি নীলা পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবর মলয়জপঙ্ক।
অথবা
কপালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাতে ভানুর ছটা
চৌদিকে চন্দনবিন্দু শোভা।

চরণরঞ্জক বা পা রাঙানোর জন্য লাক্ষা, যাবক অলক্ত বা আলতা ব্যবহৃত হতো। এই আলতার ব্যবহার বাংলা থেকেই দক্ষিণ ভারতের ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পীরা গ্রহণ করেছেন।[১] নাট্যশাস্ত্রে কুন্ডল, কর্ণবলয়, শিখাপাশ, পত্রলেখা, মুক্তাবলী, অঙ্গদ, কাঞ্চী ইত্যাদি বর্ণিত আছে।[২] অর্থাৎ আহার্য অভিনয়েও গৌড়ীয় নৃত্য নাট্যশাস্ত্রানুসারী এবং বাংলার নৃত্যশৈলী এতই সমৃদ্ধ ছিল যে নাট্যশাস্ত্রে রূপসজ্জা বেশভূষাতেও তার উল্লেখ আছে।

বাদ্যযন্ত্র—নাট্যশাস্ত্রে আনদ্ধবাদ্যযন্ত্র হিসেবে বহু ধরণের বাদ্যযন্ত্র ছিল; তার মধ্যে পুষ্কর, পণব ইত্যাদি ঢাক জাতীয়, মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল এবং দুন্দুভি ছিল। ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র উৎসব, রাজকীয় শোভাযাত্রা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, শুভ ও সুখকর উপলক্ষ, বিবাহ, পুত্রাদি জন্ম, বহু যোদ্ধাগণযুক্ত যুদ্ধ—এইরূপ নানা ব্যাপারে ব্যবহৃত হতো।[৩] সংগীত দামোদরেও ঢাকের কথা পাই—

'মুরজপটই ঢক্কা বিম্বকোদর্পবাদ্যং'[৪]

১। Bharatanatyam : An Indepth Study, Saroja Vaidyanathan, Ganesha Natyalaya, 1996, Pg. 144.
২। নাট্যশাস্ত্র (৩য় খন্ড).....পৃঃ ৮১-১২০।
৩। ঐ (৪র্থ খন্ড), ১৯৯৫, পৃঃ ১৬৩।
৪। সংগীত দামোদর .... পৃঃ ৫৫।

বাংলায় এখনও উপরোক্ত উৎসব অনুষ্ঠানে ঢাক একটি জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। মৃদঙ্গ অর্থাৎ মাটি দিয়ে যার অঙ্গ নির্মিত অর্থাৎ 'মৃৎ + অঙ্গ'। বাংলার শ্রীখোলই একমাত্র মৃদঙ্গ নামের সঠিক বাদ্যযন্ত্র। দুন্দুভির চলতি বা কথ্য নাম 'ধাম্সা'। রাঢ় বঙ্গে ধাম্সা অত্যন্ত জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। অভিনয়দর্পণে গীত অধ্যায় বাদ্য অধ্যায় বর্জিত পক্ষান্তরে সংগীত দামোদরে সংগীতের গীত-বাদ্য-নৃত্য—তিনটি অধ্যায়ই বিদ্যমান। অভিনয় দর্পণের তুলনায় সংগীত দামোদর অনেক বেশী নাট্যশাস্ত্র অনুসারী।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে প্রাচীনকাল থেকে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও নাট্যশাস্ত্র আধারিত। এছাড়াও বাংলার গুরুপরম্পরা ধারাগুলির মধ্যেও নাট্যশাস্ত্রের বিবিধ প্রকরণগুলি নানাভাবে বিন্যস্ত থাকে। বিশেষত রঙ্গদেবতাপূজা এবং পূর্বরঙ্গবিধান ইত্যাদি পদ্ধতিগুলি নানারূপে এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান। তাই গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রগ্রন্থ 'সংগীত দামোদর' বারংবার পূর্বসূরী হিসেবে ভরতমুনিকে স্মরণ করেছেন—

"মদ্ যচ্চ সারং ভরতোদিতেষু
তত্তত্ সমাকৃষ্য রসাঙ্কুরাভম্।"[১]

১। সংগীত দামোদর, পৃঃ ১।

তান্ডব ও লাস্য

ব্রহ্মা নাট্যবেদ মর্তে প্রয়োগের জন্য ভরত মুনিকে নির্দেশ দেন। ভরতমুনি ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে তার শতপুত্রকে ভারতী সাত্ত্বতী আরভটী বৃত্তিতে শিক্ষা দেন। তার পরে ব্রহ্মা কৈশিকী বৃত্তিতে এর প্রয়োগ করতে বলায় ভরত মুনি জানান যে নারী ব্যতীত কেবল পুরুষদের দ্বারা এর প্রয়োগ অসম্ভব। তখন ব্রহ্মার মানসে অপ্সরাদের সৃষ্টি হয়। ভরত মুনি তখন গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের মাধ্যমে নাট্যবেদের সাহায্যে নাট্য, নৃত্ত, ও নৃত্য প্রয়োগ করেন। প্রয়োগ কালে মহাদেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে মহেশ্বর নিজ ভক্ত তন্ডুর মাধ্যমে তান্ডব নৃত্য ভরত মুনিকে শিক্ষা দেন। গান ও ভান্ডবাদ্যের তালে তালে মুনি তন্ডু তান্ডব নৃত্য প্রদর্শন করেন। নাট্যশাস্ত্র মতে তান্ডব শৃঙ্গার রস থেকে সৃষ্টি এবং প্রয়োগ সুকুমার ও লীলায়িত গতি বিশিষ্ট। শিবকে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের কর্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি কঠোর তপস্বী (তাই যজ্ঞেশ্বর), তিনি স্বর্গীয় সঙ্গীতজ্ঞ (তাই বীণাধর), তিনি ভিক্ষা জীবি (তাই ভিক্ষুক), তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তক (তাই নটরাজ), বাংলায় অপর নাম নর্তেশ্বর। তিনি সমস্ত পশুদের দেবতা (তাই পশুপতি), তিনি সর্ব জ্ঞানী (তাই ত্রিকালজ্ঞ)।

নটরাজের নৃত্য পঞ্চ কৃত্যকে যুক্ত করে (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ, তিরোভাব)। পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা, স্থিতির দেবতা বিষ্ণু, সংহারের দেবতা রুদ্র, অনুগ্রহের দেবতা মহেশ্বর, তিরোভাবের দেবতা মহান্ত এবং সদাশিব।

চোল রাজাদের সময়কালীন নটরাজ মূর্তিটি ভারতীয় নৃত্যের দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রতীক। নটরাজ হল নটের রাজা। তিনি তান্ডব নৃত্য করেন অপস্মর নামে এক বামন অসুরের ওপর। দৈত্য অপস্মর হচ্ছে মায়া, শিব মায়াকে বিনষ্ট করে জীবকুলকে রক্ষা করছেন। বরাভয় দান করছেন দক্ষিণ হস্তে, বাম হস্তে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কুণ্ড, মুক্ত জটাজাল ধ্বংসের প্রতীক, বাম পদ উচ্চে উত্থিত ও অঙ্গুলির অগ্র ভাগ নমিত। এর অর্থ তিনি অনুগ্রহ করছেন। ডান হাতে তিনি ডমরু বাজিয়ে আহত ও অনাহত পাদের সৃষ্টি করেন। কখন তার তান্ডব রূপ, কখন সংহার, কখন শান্ত রূপ। তার এই রূপের ছটা প্রকৃতির ভেতর ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মূর্তিটি আনন্দ তান্ডব নৃত্যের প্রতিমূর্তি। বাংলায় তথা সারা উত্তর ভারতে পাই বীণাধর নটরাজের মূর্তি। বাংলায় এই নটরাজের নাম নর্তেশ্বর। এর দশটি বা বারোটি হাত। বারো হাতের দুই হাতে মাথার উপরে তাল রাখছেন, নিচে নন্দী ষাঁড়। নন্দী ষাঁড়ের পিঠের ওপর তিনি তান্ডব নৃত্য করছেন। এই তান্ডব নৃত্যটি

ললিত আনন্দ তান্ডব ভঙ্গিমা যুক্ত। নাটশাস্ত্রে আছে শিব তন্ডুকে বলেছেন তান্ডব পূর্বক গীতকে আশ্রয় করে এই নৃত্য হোক। তান্ডব নৃত্য দেবস্তুতি আশ্রিত হওয়া চাই। শৃঙ্গার রস সম্ভবা হলে সুকুমার প্রয়োগ চাই, সুতরাং ভরতের মতে তান্ডবে যে সব সময় উদ্ধত অঙ্গ হার হবে এর কোন মানে নেই। তান্ডব নৃত্যে বর্ধমানক (কলা, লয়, অক্ষর বৃদ্ধি) ও আসারিত (সঙ্গীতের তাল রক্ষা করার নাম আসারিত) নৃত্য প্রয়োগ হবে। শুদ্ধ প্রহারে আনদ্ধ বাদ্যের প্রয়োগ হবে। তান্ডব নৃত্যে করণ, অঙ্গহার ইত্যাদির প্রয়োগ হয়। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে তান্ডবের তিনটি ভেদ—বিষম, বিকট ও লঘু। ঋজু ভ্রমণাদিকে তিনি বিষম বলেছেন। বিরুদ্ধ রূপবেশ অবয়ব ক্রিয়াদি যুক্ত হলে বিকট হয়। অল্প করণ যুক্ত হলে লঘু হয়। শারদাতনয় বলেছেন তান্ডবের অঙ্গহার করণ উদ্ধত, বৃত্তি আরভটী। লাস্যের অঙ্গহার কোমল ও সুকুমার, বৃত্তি কৈশিকী। শারদাতনয়ের মতে মধুর ও উদ্ধত ভেদে লাস্য ও তান্ডবের ভেদ নির্ণীত।

শারদাতনয়ের মতে তান্ডব ত্রিবিধ এবং লাস্য চতুর্বিধ। চন্ড, প্রচন্ড, উচ্চন্ড হচ্ছে তান্ডব। লতা, পিন্ডী, ভেদ্যক ও শৃংখলক হচ্ছে লাস্য। পন্ডিত শুভঙ্কর রচিত সঙ্গীত দামোদরের মতে তান্ডব হচ্ছে দুই প্রকার—পেবলি ও বহুরূপ। পেবলি বলতে অভিনয় শূন্য অঙ্গবিক্ষেপকে বোঝায়। বহুরূপে উদ্ধত ভাবের প্রকাশ থাকে। সঙ্গীত দামোদরের মতে লাস্যও দুই প্রকার—স্ফুরিত ও যৌবত। নায়িকার ভেতর ভাব রসের বিকাশকে স্ফুরিত বলা হয়। নর্তক নর্তকীদের লীলাময় মধুর নৃত্য যৌবত বলে অভিহিত হয়। অনেক শাস্ত্রকারদের মতে তান্ডব সাত প্রকার যথা—আনন্দ, ত্রিপুর, সন্ধ্যা, গৌরী, কালিকা, উর্দ্ধ ও সংহার।

তামিল সঙ্গীত গ্রন্থ নটনাদীবাদ্যরঞ্জনম গ্রন্থে বারো রকম তান্ডবের উল্লেখ করা আছে। আনন্দ, সন্ধ্যা, শৃঙ্গার, উর্দ্ধ, মণি. সংহার, উগ্র, ভূত, প্রলয়, ভুজঙ্গ, শুদ্ধ।

ভরত মুনি দশ রকম লাস্যাঙ্গের উল্লেখ করেছেন, যথা— গেয়পদ, স্থিতপাঠ্য, আসীন, পুষ্পগন্ডিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিমূঢ়, সৈন্ধব, দ্বিমূঢ়ক, উত্তমোত্তম ও উক্তপ্রত্যুক্ত। উপবিষ্ট হয়ে গীত পরিবেশনকে গেয়পদ বলা হয়েছে। স্থিতপাঠ্য প্রাকৃত ভাষায় আবৃত্তিমূলক গান হতে হবে। চারটি পদ এ্যস্র তালে গীত হলে আসীন। পুষ্পগন্ডিকাতে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগিতা থাকবে এবং সুন্দর অঙ্গহারে তা নিষ্পন্ন করতে হবে। প্রচ্ছেদকে নৃত্যই প্রধান থাকে। ত্রিমূঢ়কে সুন্দর ললিত শব্দযুক্ত গীত থাকবে, এতে অঙ্গ হার থাকবে না। সৈন্ধবে কোন সুচারু অঙ্গহার অথবা রেচক থাকবে না তবে বাদ্য যন্ত্র থাকবে। দ্বিমূঢ়কে চঞ্চুপুট তালে মুখ প্রতিমুখ থাকবে। উত্তমোত্তমে হেলার প্রয়োগ হবে। উক্তপ্রত্যুক্তে সুন্দর বাক্যালাপ থাকবে, এবং ক্রোধ ও ক্রোধের প্রশমিত রূপ থাকবে।

ধনঞ্জয়ের কাব্যে সৃষ্টির সমস্ত পদ্ধতি বিবৃত আছে হর পার্বতীর তান্ডব ও লাস্য নৃত্যের বর্ণনায়। কালিদাসের বর্ণনায় শিব ও পার্বতীর নৃত্য উদ্ধত ও সুকুমার রূপে বর্ণিত। হর পার্বতীর নৃত্যের বাদ্য যন্ত্র হল মৃদঙ্গ, পটহ, ভান্ড, ভেরী, দার্দুর ইত্যাদি। হর পার্বতীর তান্ডব লাস্য নৃত্য সাহিত্যে অর্ধনারীশ্বর রূপে বিবৃত আছে। যা বর্ণিত হয় প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে।

গৌড়ীয় নৃত্যে তান্ডব-লাস্য উভয়ের প্রভাব গভীর। নৃত্যের বোলের মধ্যে তান্ডব-লাস্যের যুগপৎ প্রভাব রয়েছে। গৌড়ীয় নৃত্যের বোলকে গুরু এবং লঘু উভয় ভেদে চিহ্নিত করা যায়। গুরুবোল = ঝা খি না

লঘু বোল = তা খি না। অর্থাৎ মহাপ্রাণ বর্ণগুলি দিয়ে গুরু বোলগুলি হবে এবং অল্পপ্রাণ বোলগুলি দিয়ে লঘু বোলগুলি হবে। তান্ডবাঙ্গের নৃত্যগুলির ক্ষেত্রে সাধারণত বিশাখ, মন্ডল ইত্যাদি স্থানকের প্রয়োগ এবং লাস্যাঙ্গের ক্ষেত্রে আভঙ্গ-ত্রিভঙ্গ। এছাড়া একপার্শ্বগত, বৈতান, জানুবর্তিতক ইত্যাদি স্থানক প্রয়োগ অধিক হবে। তান্ডবাঙ্গ অধিক উৎপ্লাবন যুক্ত এবং চৌক ভ্রমরী, আকাশ ভ্রমরী ইত্যাদির প্রয়োগ বেশী পরিমাণে হবে। লাস্যাঙ্গের ক্ষেত্রে 'রেচিত কটি' প্রয়োগ দেখা যাবে, পক্ষান্তরে তান্ডবাঙ্গের ক্ষেত্রে 'সম কটি'-র প্রয়োগ অধিক হবে। তান্ডব-লাস্যভেদে হস্ত-দৃষ্টি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই বিবিধপ্রকার হবে। এই তান্ডব-লাস্যের ভেদ বাংলার ভাস্কর্যগুলিতেও প্রতিফলিত হয়েছে।

গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রগ্রন্থ সংগীত দামোদরে তান্ডব-লাস্য বর্ণিত আছে।

সংগীত দামোদরে আমরা ১০৮ প্রকার করণ এবং ৩২ প্রকার অঙ্গহারের কথা জানতে পারি। সংগীত দামোদরের করণ বিক্ষুকরণ। গৌড়ীয় নৃত্যে তান্ডবাঙ্গের নৃত্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ—শিব নামাবলী, লাস্যাঙ্গের প্রকৃষ্ট উদাহরণ অভিসারিকা নায়িকা এবং তান্ডব-লাস্য যুগপৎ উদাহরণ—অর্ধনারীশ্বর, দশমহাবিদ্যা ইত্যাদি।

তান্ডব দীপ আরাধনা

তান্ডব দীপ আরাধনা বা আরতি নৃত্য বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় নৃত্য। এটি মূলত প্রধান পুরোহিত করে থাকেন অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গে তান্ডবনৃত্যের সঙ্গে হতো, এখনও এই নৃত্যটি ক্ষয়িষ্ণুভাবে টিঁকে আছে। মন্দিরে নিত্য পূজায় হতোই। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে শাক্ত-শৈব ক্ষেত্রে ঢাক, বাংলা ঢোল, শঙ্খ, মন্দিরা, কাঁসর, ঝাঁঝ এবং বৈষ্ণব মন্দিরে শ্রীখোল বা মৃদঙ্গ ব্যবহৃত হয়। দুর্গা পূজার সময় সাড়ম্বরে ঢাকের তালে আরতি করা হয়। আরতির সময় প্রত্যেক ক্ষেত্রের বোল অত্যন্ত জটিল ও আলাদা আলাদা। যদিও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।

বাংলার দেবদাসী

ভারতবর্ষের বেশীরভাগ নৃত্যই দেবতাকেন্দ্রিক। 'দেবতার দাসী' এই অর্থে দেবদাসী কথাটির প্রচলন হয়েছে। মন্দিরে-মন্দিরে নৃত্যের মাধ্যমে দেবসেবায় এরা নিজেদের উৎসর্গ করত। দেবায়তনে নর্তকী নিয়োগের প্রথাটি ভারত ছাড়াও প্রাচীনকালে বেশ কিছু দেশে ছিল। মিশরের বিভিন্ন মন্দিরে, গ্রীসের কোরিস্থ মন্দিরে, হিব্রু-ব্যাবিলনের মন্দিরে নর্তকী ছিল।[১] ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই মন্দিরে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হত।

কিন্তু 'দেবদাসী' শব্দটি সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রথম পাই।[২] ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই দেবদাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। সামাজিক বিভিন্ন কারণে—কখনও বা চরম দারিদ্রতায়, কখনও বা বিয়ে না হওয়ার ফলে সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে কিংবা শুধুমাত্র ধর্মীয় কুসংস্কারের বশে স্বেচ্ছায় অথবা পুরোহিত বা রাজার নির্দেশে এবং বিভিন্ন ধরনের উৎপীড়নের ফলে দেবদাসী শ্রেণী তৈরী হয়। প্রথমদিকে দেবদাসীরা শুধুমাত্র মন্দিরে দেবতার সামনে নৃত্য প্রদর্শন করতেন। ক্রমে এই ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে এবং ধর্মীয় বন্ধন বহুলাংশে লোপ পায়। দেবদাসীরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বিভিন্নভাবে আহরিত হত। এই আহরণের বিন্যাস হিসেবে দেবদাসী প্রথার বিভিন্ন ধরনের বিভাগ করা যায়—

দত্তা—কোনও পুণ্যলোভী গৃহস্থ স্বেচ্ছায় মন্দিরে কন্যা দান করলে সে হত 'দত্তা' দেবদাসী।

হৃতা— যেসব মেয়েদের হরণ করে নিয়ে এসে মন্দিরে উপহার দেওয়া হত।

বিক্রীতা—মন্দিরে কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কন্যাকে বিক্রয় করলে সে বিক্রীতা দেবদাসীরূপে গণ্য হত।

১। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, রমলাদেবী ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৩৯২ (বাং) পৃঃ ৩১১।

২। কৌটিলিয় অর্থশাস্ত্র—Vol-1. রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, ২/২৩, জেনারেল প্রিন্টার্স পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৪।

ভৃত্যা—যে দেবদাসী মন্দিরের কাজে ভৃত্য রূপে আত্মোৎসর্গ করার জন্য স্বেচ্ছায় মন্দিরবাসিনী হত সে ভৃত্যা।

ভক্তা—স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিণী সন্ন্যাসিনীকে ভক্তা বলা হত। এদের সেবাদাসীও বলা হত।

অলংকারা বা সালংকারা—নৃত্যগীত ও কল্যাবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হবার পরে যে নারীকে অলংকৃত করে দেবমন্দিরে অর্পণ করা হত সে সালংকারা। রাজকন্যারাও এভাবে মন্দিরে অর্পিত হতেন।

গোপিকা বা রুদ্রগণিকা—এরা নির্দিষ্ট সময়ে নৃত্যগীত করার জন্য মন্দিরের বেতনভোগী দেবদাসী সম্প্রদায়রূপে পরিচিতা।[১]

ব্যবহারিক কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়নের মানদণ্ডে দেবদাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—দেবদাসী, রাজদাসী ও স্বদাসী। দেবদাসীরা শুধুমাত্র মন্দিরে দেবতার সামনে নৃত্যপ্রদর্শন করত। এছাড়া এরা পুরোহিত ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সামনেও নৃত্য প্রদর্শন করত। রাজদাসীরা মন্দিরের চত্বরে রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাগমে বা রাজদরবারে নৃত্য প্রদর্শন করত। আর স্বদাসীরা সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য করত এবং বিশেষ কোনও উৎসবে বৎসরে এক-দু'বার মন্দিরের বাইরের চত্বরে নৃত্য প্রদর্শনের সুযোগ পেত।[২]

যদিও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের দেবদাসীদের কথাই উচ্চারিত হয় সব থেকে বেশী কিন্তু বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়। রাজদাসী ও স্বদাসীদের গৌড়বঙ্গে 'নটী' বলা হত। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন নামে বাংলায় এদের অভিহিত করা হয়েছে। যেমন—জনপদকল্যাণী, দেববাসিনী বা দেয়াসিনী, দেউলবাসিনী, বাররামা, দেববারবণিতা ইত্যাদি। প্রাচীনকালে নৃত্যগীতচর্চায় কবি পণ্ডিতরা বিমুখ ছিলেন না। যাঁরা নটবৃত্তি করতেন সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ছিল। 'নটগাঙ্গো' ('গাঙ্গোক') রচিত বেশ কয়েকটি শ্লোক 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। নট গাঙ্গোর পুত্র 'জয়নট'।[৩] অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় নৃত্যগুরুদের নট, অধ্যাপক, আচার্য, গুরু, এবং পরবর্তীকালে গীদাল, রসিক ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন কবি কর্ণপুরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে' পাই অধ্যাপক অর্থাৎ

১। প্রসঙ্গ দেবদাসী, আরতি গঙ্গোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ১৯৮২, পৃঃ ২২-২৩।

২। সংগীত, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৭৭।

৩। Shekhsubhadaya of Halayudha Misra, edited by Sukumar Sen, Asiatic Society, Cal, 1963, Pg, 263 .

গুরুদের কথা—"তথা সতি নৃত্য-গীত-বাদ্যাধ্যায়োপাসিত চরণস্তঃ।' এর অর্থ হল—'নৃত্যগীত-বাদ্য অধ্যয়নের অধ্যাপকগণের' উপাসিত চরণ।[১]

সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় দেবদাসী প্রথা প্রচলিত। বৌদ্ধ এবং জৈন মন্দিরেও দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় দেবদাসী প্রথা প্রচলিত। বৌদ্ধ এবং জৈন মন্দিরেও দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।। এই সময়ে নগরনটী বা নগরবধূ অর্থাৎ রাজদাসী স্বদাসীরও ব্যাপক প্রচলন ছিল। জৈনদের 'রায়পসেনীয়' সূত্রে নৃত্যকলাভিজ্ঞ নর্তক-নর্তকীর উল্লেখ আছে। মহাবীরের সমক্ষে নটনটীরা বত্রিশ প্রকার ভঙ্গীতে নৃত্য করেছিলেন বলে লিখিত আছে। তাদের বেশভূষার বর্ণনা আছে।[২] বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় জৈনমত প্রসারলাভ করেছিল। জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে সর্বমোট চব্বিশজন তীর্থঙ্কর অবতীর্ণ হন। চব্বিশ জনের মধ্যে কথিত আছে যে একুশ জনের সঙ্গে রাঢ় বাংলার সংস্রব ছিল। বেশীর ভাগ তীর্থঙ্করই রাঢ়ের নানাস্থানের জনসাধারণের মধ্যে স্ব-স্ব- মত প্রচার করে মানভূম জেলার 'পার্শ্বনাথ' পাহাড়ে নির্বাণ লাভ করেন। পূর্বে 'পার্শ্বনাথ' পাহাড়, 'সমেত শিখর' নামে পরিচিত ছিল। তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামানুসারে সমেত শিখর পরবর্তীকালে 'পরেশনাথ' পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। জৈনধর্ম শাস্ত্র 'কল্পসূত্র' মতে পার্শ্বনাথ খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৭ অব্দে নির্বাণ লাভ করেন।[৩] জৈনগ্রন্থ 'বসুদেবহিণ্ডী' থেকে জানা যায়—উদ্যানযাত্রায় নৃত্যগীতরতা মদ্যপানে মত্তা গণিকা অর্থাৎ 'নটী' বা রাজদাসী বা স্বদাসীর কথা।[৪] এই বৃত্তি বৌদ্ধযুগে অতি ব্যাপক ছিল। তার অন্যতম প্রমাণ পালিতে গণিকাবাচক বেশ কয়েকটি শব্দের প্রয়োগে—বেসী, নারিয়ো, গামনিয়ো, নগরসোভিনী, বন্নদাসী, কুম্ভদাসী।[৫] বৌদ্ধসাহিত্যে নগরবধূ অর্থাৎ রাজদাসীদের কথা পাই। অনেক নায়িকার নাম পাই।—মগধবতী, শালবতী, বাসবদত্তা, অম্বপালি বা আম্রপালি এবং বিমলা। বাংলায় অনেক বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির ছিল যা বলে শেষ করা যায় না— তাম্রলিপ্ত, বিক্রমশীলা মহাবিহার, জগজীবনপুর, ভাসুবিহার।

১। শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূ, কবি কর্ণপুর রচিত, শ্রী মনীন্দ্রগুহ সম্পাদিত, প্রকাশিকা—শ্রীরাধারমণ মন্দির, বৃন্দাবন, পৃঃ ৮৫৫।
২। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৮২, পৃঃ ১৪৭, ২৩৫।
৩। হাওড়া ও হুগলীর ইতিহাস, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও বাণীকুমার ভট্টাচার্য, অশোক পুস্তকালয়, পৃঃ ৪৯।
৪। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, পৃঃ ১৯৫।
৫। ঐ, পৃঃ ১৪৩।

এ ছাড়া বর্তমান বিহার রাজ্যের নালন্দা ইত্যাদি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলার পাল রাজাদের অবদান ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক) পাই বারাঙ্গনা গণিকা বা দাসীরা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। ভারতের গণিকারা পড়াশোনা ও নৃত্যগীতের সুযোগ পেত। বারনারীদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ছিল—নৃত্য, গীত, বাদ্য, পঠন, লিখন, চিত্রকলা, পরমর্মজ্ঞতা, সংবাহন, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা ও মালা গাঁথা। ভাবী গণিকাকে আট বৎসর বয়স থেকে সংগীত অর্থাৎ গীত, বাদ্য, নৃত্য অভ্যাস করতে হত।[১] পরবর্তীকালে নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যগীত পটীয়সী গণিকাদের উল্লেখ আছে। গণিকাদের নামের অন্তে সাধারণত এই শব্দগুলি থাকত, যথা—দত্তা, মিত্রা, সেনা।[২] "দত্তা মিত্রা চ সেনেতি বেশ্যানামানি যোজয়েৎ।।"[৩] ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে গৌড়ীয় রীতিতে বাংলার কবি সুবন্ধু রচিত 'বাসবদত্তা'[৪] নামের শেষে 'দত্তা' শব্দটি লক্ষণীয় এবং সে রাজদাসী, নৃত্য গীত পটীয়সী। পরবর্তীকালে গুপ্ত, পাল, সেন আমলে বাংলায় (বৃহত্তরবঙ্গে) নৃত্যগীতির স্বচ্ছল অনুশীলন ছিল। লোকগীতি ও লোকনৃত্যের পাশাপাশি করণ, অঙ্গহার, চারী, রস সম্বলিত নৃত্যকলা—নাট্যাভিনয়ের অনুশীলন তখন অব্যাহত ছিল রাজ অন্তঃপুরে, রাজদরবারে, রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন নাট্যগৃহে বা রঙ্গমঞ্চে, দেবায়তনে ও বিভিন্ন পার্বণ-উৎসবাদিতে।

মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী'-র (খৃঃ ৫ম অন্য মতে খৃঃ ৭ম-৮ম শতক) গীতাধ্যায়ে গৌড়কৈশিক, গৌড় পঞ্চমা রাগের সঙ্গে বিভিন্ন রসযুক্ত নৃত্যাভিনয় তথা নাট্যাভিনয়ের কথা পাই।[৫] অর্থাৎ তৎকালীন বাংলায় অভিজাত নৃত্য তথা সংগীতের আঙ্গিক ও বিকাশ ভরতমুনি রচিত নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ করত। বাংলায় পাল ও সেন রাজাদের আমলে শিব কিংবা কার্তিকের মন্দিরে দেবদাসীদের সংগীত (গীত-বাদ্য-নৃত্য) পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। একথা কল্হনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে পাই। শ্রদ্ধেয় G.S.Ghurye তাঁর Bharatanatyam and its Costume' (Poona

১। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, পৃঃ ৬৬, ২৪৫।

২। ঐ, পৃঃ ১৬৪।

৩। ভরতনাট্যশাস্ত্র, (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদনা ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্ত্তী, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২, পৃঃ ৬, শ্লোক সংখ্যা ৩২।

৪। *History of Bengal*, R.C. Majumdar, G. Bharadwaj & Co, 1971, Pg. 354.

৫। *Brihaddesi of Matanga Muni*, Vol II. edited by Premlata Sharma, IGNCA & Motilal Banarsidass Pub. Pvt. Ltd., 1994. Pg. 104-107 .

1950) গ্রন্থে বাংলায় শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রসঙ্গে লিখেছেন "Jayapida (A.D. 751—782) while he was in the town of Paundra Vardhana in Gauda Bengal, once saw in the temple of Kartikeya a dance 'Lasya' being performed. The dancer 'Nartaki' was one 'KAMALA' by name."[১] নৃত্যপদ্ধতি ছিল ভরতনাট্যশাস্ত্রানুসারী অর্থাৎ এর থেকে জানা যায় খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে উত্তরবঙ্গের পৌণ্ড্রবর্ধন নগরে কার্তিক মন্দিরে দেবদাসীদের শাস্ত্রানুসারী নৃত্য অনুষ্ঠিত হত।

"মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পয়োদানামিবার্যমা
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভূজা।।

প্রবিবেশ ক্রমে নাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্ধনম্।

....

লাস্য স দৃষ্টম্ বিশৎ কার্তিকেয় নিকেতনম্
ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রবিৎ।।
ততো দেবগৃহদ্বার শিলামধ্যস্ত স ক্ষণম্
তেজো বিশেষ চকিতৈর্জনৈঃ পরিহৃতান্তিকম্
নর্তকী কমলা নাম কান্তিমন্তং দদর্শতম্।।[২]

গল্পটি হল এই রকম—'কমলা' নামে সুন্দরী দেবদাসী ভরতনাট্যশাস্ত্রানুসারে লাস্যাঙ্গ নৃত্য পরিবেশন করছিলেন। এই নৃত্য কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় ছদ্মবেশে যখন গৌড়ে তথা পৌণ্ড্রবর্ধনে প্রবেশ করে কার্তিকের মন্দিরে দেখতে পান। দেখে অভিভূত হন। জয়াপীড় কমলাকে বিয়ে করে কাশ্মীর নিয়ে যান। সেই মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় আছে। গল্পটি থেকে বোঝা যায় বাংলার শিল্পকলার প্রতি কাশ্মীরের অনুরাগ এবং বাংলার সংগীতধারার সঙ্গে কাশ্মীরের আদান-প্রদান। পালযুগের কবি রাজপ্রশস্তিতে রাজার কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ গর্বভরে বলেছেন, রাজপ্রাসাদে, (অথবা রাজধানীতে) প্রতি সন্ধ্যায় 'বেশ বিলাসিনী জনের—মঞ্জরী মঞ্জুস্বনে আকাশ প্রতিধ্বনিত হয়' অর্থাৎ রাজদাসীদের কথা পাই। সে যুগের কবি মন্দিরের একশত দেবদাসীদের

১। পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস (প্রথম ভাগ)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৭০, পৃঃ ৭৪-৭৮।

২। *Kalhana's Rajtarangini,* by Ranjit Sitaram Pandit, Sahitya Academi, New Delhi-1990, Fourth Taranga, Verse 423.

রূপযৌবনের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন যে—"ইহারা কামিজনের কারাগার ও সংগীত কেলিশ্রীর সঙ্গমগৃহ এবং ইহাদের দৃষ্টিমাত্রেই ভস্মীভূত কাম পুনরুজ্জীবিত হয়।" সে যুগের কবি বিষ্ণুমন্দিরে লীলাকমল হস্তে দেবদাসীগণকে লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করতেও দ্বিধা করেননি।[১]

নয়পালদেবের রাজত্বকালে মূর্তি শিবের বাণগড় প্রশস্তিতে জানতে পারি মন্দিরে সহস্র দেবদাসীদের কথা—

"হিমগিরিমিব শুভ্রং রম্য-রত্নাশু-জাল-
প্রতিফলিত-সকেলি-প্রৌঢ়-রামা-সহস্রম"[২]

মন্দিরটি হিমগিরির ন্যায় শুভ্র সেখানে সহস্র দেবদাসী।[২]

রামপালের সময়ে গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত কাব্য'-এ পাই—

"পরমার বিকারাবির্যুবতিভিরপি
দেববারবণিতাভিঃ।
ক্বণিতমণি কিঙ্কিনীকং কৃত নেপথ্যদ্ভটং নটন্তীভিঃ।[৩]

—যুবতী দেবদাসীগণ মণিময় কিঙ্কিনীসহ উদ্ধতভাবে নৃত্য করছিলেন। অর্থাৎ দেবদাসী সম্প্রদায়ের নৃত্যের একটি বর্ণনা পাই রামপালের সময়ে।

উপরোক্ত উদাহরণগুলি থেকে বুঝতে পারি নৃত্যগীত ছিল দেবপূজার অঙ্গ। বিষ্ণু ও শিবের দেউলে দেবদাসী বা দেববাসিনীর নৃত্য-গীত-হত। দক্ষিণ রাঢ়ে সেনরাজাদের কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের উল্লেখ করে ধোয়ী বলেছেন ঃ

"তস্মিন সেনান্বয় নৃপতিনা দেবরাজ্যভিষিক্তো
দেবঃসুহ্মে বসতি কমলা কেলিকারো মুরারিঃ।
পানৌ লীলা কমলমসকৃৎ যৎ সমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতি সুভগাঃ কুর্বতে বাররামাঃ।।[৪]

সেই সুহ্মদেশে সেনবংশীয় ভূপতি কর্তৃক দেবরাজ্যে অভিষিক্ত কমলাপতি

১। বাংলা দেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স ও পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৩৬৪ (বাং) পৃঃ ১৯৩-১৯৫।
২। শিলালেখ — তাম্রশাসনাদি প্রসঙ্গ — ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, সাহিত্যলোক/ ১৯৮২, পৃঃ ৯২, অনুবাদ পৃঃ ৯৬।
৩। গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্য — ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক প্রণীত, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১৯০৩, পৃঃ ৯৭।
৪। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী, ১৯৭২, পৃঃ ৪৮-৫৪।

দেবমুরারী বাস করতেন, যাঁর কাছে সর্বদা লীলাকমল-ধারিণী স্বভাব সুন্দর বারনারীরা অবস্থান করে লোকের মনে লক্ষ্মীভ্রম উৎপাদন করে।[১] সেনরাজা বিজয় সেন যে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (অধুনা বাংলাদেশে) তাতেও একশ সুন্দরী অলঙ্কৃতা দেবদাসী দেবসেবায় নিযুক্ত ছিল একথা পাই—
"অর্ধাঙ্গস্বামিনোরত্নালঙ্কৃতিভির্বিশিষিতবপুঃ শোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।"[২]

সেকশুভোদয়ায় আছে একদা লক্ষ্মণ সেন দেবের দরবারে নৃত্যগীত হচ্ছিল, শিল্পী ছিলেন গঙ্গোনটের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা অর্থাৎ 'রাজদাসী'—নটী— "বিদ্যুৎপ্রভানাম্নী নর্তকী বিশেষ তামানয়লা নর্তয়তু লোকঃ পশ্যন্তু"[৩]। সেকশুভোদয়ায় ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গে নৃত্যশিল্পী শশীকলার পরিচয়ও পাই।—"তামানয়ামাস শশীকলয়া সহ।" সেকশুভোদয়ার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বিশেষ করে পদ্মাবতী ও জয়দেবের সংগীত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।[৪] স্বয়ং জয়দেব সংগীতকলায় পারঙ্গম ছিলেন এবং পত্নী পদ্মাবতীও নৃত্যগীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জয়দেবের পত্নী প্রথম জীবনে দেবদাসী নটী ছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে। শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' সংগীত কুশলাবারাঙ্গনাদের উল্লেখ আছে। গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী'তে গৌড়বঙ্গে নৃত্যগীতের কথা পাই। মহিলারাই নৃত্য করতেন। রুচিসম্পন্না, গণিকা-কন্যা কলানিপুণ নৃত্যাচার্যের কাছে নৃত্য শিক্ষা করতেন। বারাঙ্গনাভবনে বারবধূদের নৃত্যের সঙ্গে মদন চঞ্চল যুবকেরা নৃত্যের সঙ্গতে 'হস্ততাল' দ্বারা তালরক্ষা করতেন—'কৃতহসিত হস্ততালং।[৫] অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে বাংলার দেবালয়ে দেবদাসী ব্যবস্থা ছিল। রাজা-রাজড়া প্রতিষ্ঠিত অথবা রাজপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যমতের বড় দেবকুলগুলিতে পূজার ব্যবস্থা রাজকীয় ছিল। রাজার মতো দেবতারও সেবাদাসী থাকত— চামরধারিণী, ধূপদীপ প্রজ্বালিনী আলিম্পনকারিণী, নৃত্যগীতে আনন্দবর্ধিনী। রাজা হরিদেব বর্মার মন্ত্রী ভট্ট ভবদেব রাঢ় বাংলার স্মার্তপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে সেবার জন্য একশত দেবদাসীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

"এতস্মৈ হরিমেধসে বসুমতী বিশ্রান্ত বিদ্যাধরী—
বিভ্রান্তিং দধতি শতং স হি দদৌ শারঙ্গশাবীদৃশঃ।

১। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী, ১৯৭২, পৃঃ ৪৮-৫৪।
২। বঙ্গভূমিকা, শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৪, পৃঃ ১৯৫।
৩। Shekhsubhadaya 13 Chapter Pg, 65-67
৪। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, পৃঃ ১০৬।
৫। আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, গোবর্ধন আচার্য জাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী, বঙ্গানুবাদ, সান্যাল এণ্ড কোং, ১৯৩৮ (বাং), পৃঃ ৯৫।

দগ্ধাস্যোগ্রদৃশা দৃশৈবঃদিশতীঃ কামস্যসঞ্জীবনং
কারাঃ কামিজনস্য সঙ্গমগৃহ সঙ্গীত কেলিশ্রিয়াঃ।।৩০।।[১]

"ভট্ট ভবদেব ইন্দ্রিয় ভোগবিলাসোপযোগী বাসুদেবকে ধরাপৃষ্ঠে বিশ্রামার্থ অবতীর্ণ স্বর্গবিদ্যাধরী সদৃশ শত সংখ্যক মৃগনয়না ললনা তাঁহার পরিচর্যার জন্য দান করিয়াছিলেন। ইহার কটাক্ষপাতে হরক্রোধাগ্নিদ্বারা ভস্মীকৃত মদনকেও উজ্জীবিত করিতে সক্ষম, কামুকগণের কারাগার স্বরূপ ও মনোহর সঙ্গীত ক্রীড়ার আধার তুল্য।।" অর্থাৎ ভবদেব ভট্টের (৮০০-১০০০ খৃঃ) লিপিতে আছে দেবদাসীদের বিলাসকলা ও রূপের কবিত্বময় সালঙ্কার বর্ণনা। অন্যদিকে, বিজয়সেনের দেওপাড়ার প্রশস্তি (রাজত্বকাল ১০৯৫ খৃঃ) বঙ্গদেশে দেবদাসী প্রথার ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ।[২] চোলযুগে দক্ষিণভারতের শৈবমন্দিরে গৌড়ীয় সংগীত পরিবেশিত হতো। ত্রয়োদশ শতকে অন্ধ্রপ্রদেশে কাকতীয় রাজবংশের রাজগুরু ছিলেন বিশ্বেশ্বর শম্ভু শিবাচার্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শৈবমন্দিরে দশজন নর্তকী, আটজন বাদ্যকর এবং মঠে ও অন্নসত্রে চোদ্দজন গায়িকা ও ছ'জন নর্তকী নিযুক্ত ছিল।[৩]

পাল সেন যুগের পর তুর্কী বিজয়ের যুগ। সে সময়ের ইতিহাস ধ্বংস পর্বের, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মতে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। এরপর প্রাক্‌চৈতন্য এবং চৈতন্যযুগ, পাশাপাশি তন্ত্রসাধনারও ব্যাপ্তি প্রবল। এরই সাথে চলেছে মঙ্গলকাব্যের ধারা। বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা। এই মঙ্গলকাব্যগুলিও নৃত্যগীতের বর্ণনায় প্রাঞ্জল। কাব্যগুলিতে নটীদের কথাও পাই। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে আছে নটী রত্নমালার রূপ, বেশভূষা, আহার্য-অলঙ্কার, শাড়ী এবং নৃত্যাভিনয়ের বর্ণনা। ধর্মমঙ্গল কাব্যে সুরিক্ষা হচ্ছে নটী বেশ্যা। গোপীচন্দ্রের গানে নটীদের কথা পাই। 'মানিকচন্দ্র রাজার গান', 'ময়নামতীর গান', প্রভৃতি নাথ সাহিত্যের গ্রন্থে হীরা নটিনীকে দেখা যায়। বিভিন্ন রচয়িতা দ্বারা রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেবসভায় বেহুলার নৃত্য দেবদাসীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ছাড়া নটিনী চরিত্র এবং তাদের আচার আচরণেরও বহু উল্লেখ আছে। (মঙ্গলকাব্যগুলির রচনাকাল একাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক, বিশেষত পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক)।[৪] রূপরামের ধর্মমঙ্গলে 'নটীর' নৃত্যের বর্ণনা আছে—

১। শ্রী অনন্তবাসুদেব শিলালিপি, রাধাকৃষ্ণ বসু কর্তৃক অনুমোদিত, ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রনিবাসী পণ্ডিত শ্রীরত্নাকর গর্গবটু কর্তৃক প্রকাশিত, Printed at the Union Printing Works, by Purna Chandra Mandal, Cuttack, 1917, Pg. 12, Sloka-30.
২। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, পৃঃ ৬৬ ও ২৪৫।
৩। সময় অসময়, পাক্ষিক, ১-১৫ জুলাই, ২০০৩, পৃ: ৭, কৃতি বাঙালি সেকালে, সঞ্জিত দাস।
৪। সঙ্গীত বার্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজন্য সঙ্গীত আকাদেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯৯৫, পৃঃ ২০৬-২০৮।

'সনকা নটিনী নাম গৌড়-নিবাসী
দেবকন্যা সমতুল্য সাক্ষাৎ উর্বশী।
চিন্তামণি পরিপাটি বেউশ্যার ঠাট
রাজদরবারে গিয়া উসারিল নাট।
সনকা বেউশ্যা নাচে নৃপতির মাঝে
ঘন ঘন সঘনে ঘুঙুর বাদ্যবাজে।
তাধিনিতা ধিনি ধিনি বাজয়ে মাদল
মৃদঙ্গ মন্দিরা শব্দ উঠে সুসরল।
রুনু ঝুনু চরণে নূপুর ঘন চলে
ঝন ঝন করতাল মকরন্দ বোলে।
ডাকে পাকে চলন বলন সাবধান
শূন্য ভরে ওঠে বৈসে রাখে পঞ্চতান।
কোকিল-মধুর ভাষে মনোহর গীত
রাধার মহিম গায় রাধার চরিত।[১]

মধ্যযুগে দাসদাসী কেনাবেচা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। নবাব সুলতান ও বাদশাহদের হারেমে হাজার হাজার দাসী থাকতো। সাধারণত এ সকল দাসীদের হাট থেকে কেনা হত, তবে ক্ষেত্র বিশেষে দলিল পত্রও তৈরি করে নেওয়া হত। এরূপ দলিল পত্রকে গৌড়ীয়-শতিকাপত্র, বহীখাতা-অকরার পত্র বলা হতো।[২] ১৬২১ থেকে ১৬২৪খৃঃ-র মধ্যে পর্তুগীজরা ৪২০০০ দাসদাসী ধরে নিয়ে গিয়েছিল বাংলা থেকে[৩]। 'গুপ্তসাধন তন্ত্রানুসারে' বাঙালি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের (১৫শতক) তন্ত্রসার, রামতোষণের প্রাণতোষিণী প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে গণিকা সম্বন্ধে নানা উল্লেখ আছে। তান্ত্রিক সাধনায় এই শক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এরা যথাক্রমে — রাজবেশ্যা (রাজদাসী বা নটী), নাগরী (শহরের গণিকা), গুপ্তবেশ্যা (সম্মানিত পরিবারের যে কুলবধূ গোপনে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেন), দেববেশ্যা (দেবদাসী) ও ব্রহ্মবেশ্যা (তীর্থস্থানে দেখা যায়)।[৪] বাংলাদেশে তন্ত্রসাধনায় যে কুৎসিত আচার অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, তার একজন বিশিষ্ট সাক্ষী 'চৈতন্যভাগবত' -কার শ্রীবৃন্দাবন দাস (জন্ম ১৫০৭ খৃঃ)। তিনি লিখেছেন—

১। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি, সুকুমার সেন, পৃঃ ৫৬-৫৭।
২। বাংলার সামাজিক ইতিহাস, ডঃ অতুল সুর, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬,পৃঃ ৯৯-১০০।
৩। বিহান, বইমেলা ১৪০৫, সম্পাদক জগন্নাথ ঘোষ, কলিকাতা, পৃঃ ৪৩।
৪। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, পৃঃ ১৩৭-১৩৮।

"রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনি।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিধি বসন।
খাইয়া করে সবাসঙ্গে বিবিধ রমণ।"

বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিন সম্প্রদায়ের উপরই তন্ত্র অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১]

কালক্রমে এই বৈষ্ণবধর্মে গ্লানি দেখা দিয়েছিল। নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা কদাচার, এমন কি ব্যভিচার ও সমাজকে কলুষিত করেছিল। যারা বৈষ্ণব বৈরাগীদের আখড়ায় বাহ্যত নেচে নেচে কীর্তন করত, তাদের মধ্যে অনেকে অবৈধ জীবনযাপন করত। সপ্তদশ শতকের পর থেকে বৈষ্ণব আখড়াগুলিতে কিশোরী নৃত্য ও ভজন প্রথা লক্ষিত হয়। কুমারী সংগ্রহ ছিল এই প্রথার মুখ্যকর্ম। এই বালিকাদের দেবদাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করা হত। বৈষ্ণবগণ কণ্ঠীবদল করে সঙ্গিণী সংগ্রহ করতেন। সেবাদাসী সংগ্রহও চলত। সেবাদাসী সংগ্রহেরও বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল টাকা দিয়ে কিনে অথবা বলপ্রয়োগ করে নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের ভেক দিয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন আখড়াতেও নিযুক্ত করা হত। 'দেবদাসী'-রা সাধারণ লোকের ভোগ্যা নয়, আখড়ার প্রধান বৈষ্ণবের শুধু পরিচর্যা পরায়ণা। দরিদ্রভেকধারী বা জাত বৈষ্ণব ঘরের মেয়েরা নানা ঘটনাচক্রে এসে পড়েন বাউল আশ্রমে। কখনও মা-বাবাও কন্যা সন্তানকে তুলে দেন বাউলের হাতে। বাংলার গ্রামে গ্রামে যত গুরু, তত আশ্রম আর তত সেবাদাসী-বৈষ্ণব। খুব স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখলে সেবাদাসী, বৈষ্ণব, সাধনসঙ্গিণীদের অসহায়ত্ব ধরা পড়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। দেহ সাধনা যেখানে পারের তরী, সেখানে ভরাডুবির আশঙ্কা থাকেই। বাউলদের মধ্যে যে ব্যভিচার তা এসেছে দেহসাধনার পথ ধরে। বাউল অবক্ষয়ের এটা বোধ হয় অন্যতম কারণ। আর ব্যভিচারের শিকার মহিলা বাউলেরা। গুরুগিরির অজস্র আশ্রমে খোলাখুলি চলে বিকিকিনির ব্যবসা। ধর্মের মোড়কে থাকে পণ্যের বেসাতি। আর ব্যভিচারিদের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন প্রকৃত বাউল।[২]

রাঢ়বঙ্গের মল্লভূমে প্রসিদ্ধ মল্লরাজদের রাজধানী বিষ্ণুপুর। এখানে দেবদাসী নটীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এঁরা নৃত্যগীতবাদ্যে পারদর্শী ছিলেন। যার নিদর্শন এখনও দেখা যায় বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সব মন্দিরগুলির ভাস্কর্যে—শ্যামরায়, কৃষ্ণ

১। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, পৃঃ ২৬৭-২৮৩।
২। লোকশ্রুতি (১২), বিষয়—ননীবালা ও বৈষ্ণবী মহিলা বাউলরা, লীনা চাকী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পঃ বঃ সরকার-১৯৯৬, পৃঃ ৮২-৮৫।

রায়, জোড় বাংলা প্রভৃতি। বিষ্ণুপুরে দেবদাসী বা নটী পাড়া ছিল। রাজারা এই 'নটীপাড়া' করে দিয়েছিলেন—ইঁদকুড়ি, রাণার পুকুর, রাঙ্গামাটি, প্রভৃতি পাড়ায় এঁরা থাকতেন এবং রাজা-শ্রেষ্ঠী-বণিকদের মনোরঞ্জন করতেন। এই দেবদাসীদের নাম পাওয়া যায়—যোগীদাসী, ভৈরবদাসী, কুমুদদাসী, লক্ষ্মীদাসী, পদ্মদাসী, পণ্ডারিণীদাসী, প্রভৃতি। এঁদের শেষ দেবদাসী ৩০/৪০ বছর আগে মারা গেছেন, তাঁর নাম উষারাণী দাসী। তিনি বিষ্ণুপুরের বাসন্তীদেবী মন্দিরের উন্নতিকল্পে ২০ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন। এই দেবদাসীরা কৃষ্ণবাঁধের কাছে ইঁদকুড়িতে ইন্দ্রপূজার সময়ে রাজা এবং সভাসদদের সামনে নৃত্যগীত করতেন—হোরী গান ও নাচ ছাড়া বাংলার লোকনৃত্য টুসু ভাদু ইত্যাদিও করতেন। রাজা তাঁদের অর্থ-জমি দিতেন। দুর্গাপূজার সময়ে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মৃন্ময়দেবীর মন্দিরে আগমনী থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত নৃত্যগীত করতেন।[১] দুর্গাপূজায় দেবীকে স্নান করানোর সময়ে অষ্টপ্রহরে আটটি রাগে গান গাইতেন এই দেবদাসীরা—

(১) প্রথম ঘটে থাকত গঙ্গার জল। এই ঘটের জলে স্নান করানোর সময় মালব রাগ গাওয়া হত।

(২) দ্বিতীয় ঘটে থাকত বৃষ্টির জল—ললিত রাগ গাওয়া হত।

(৩) তৃতীয় ঘটে প্রভাস তীর্থের সরস্বতী নদীর জল—বিভাষ রাগ গাওয়া হত।

(৪) চতুর্থ ঘটে থাকত সমুদ্রের জল—ভৈরবী রাগিনী গাওয়া হত।

(৫) পঞ্চম ঘটে পদ্মরাগ মিশ্রিত জল—গৌড় রাগিনী গাওয়া হত।

(৬) ষষ্ঠ ঘটে ঝর্ণার জল—বরাড়ী রাগ।

(৭) ১০১টি তীর্থের সব তীর্থের জল দিয়ে স্নান করানো হত বসন্তরাগের সঙ্গে।

(৮) নানাতীর্থের জল (এর সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়)—ধানসী রাগের সঙ্গে। এই গানের সঙ্গে দেবদাসীরা চামর হাতে, নানা উপচার হাতে নৃত্য করত। যার নিদর্শন শ্যামরায় মন্দির ভাস্কর্যে দেখা যায়।[২] মল্লরাজারা পরমবৈষ্ণব ছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ মল্লরাজ বীর হাম্বীর চৈতন্য অনুগামী শ্রীনিবাস দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন এবং এর ফলে মদনমোহনের পূজা বিষ্ণুপুরে শুরু হয়।

১। *Devadasi in Indian Ancient Poems, Literature, Purans, Music and the Temples,* Dr. Debabrata Singha Thakur, Gopeswar Dhrupad Research Centre, 1990. Pg. 13-14.

২। ডঃ দেবব্রত সিংহ ঠাকুরের (বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের বংশধর, পরিচালক গোপেশ্বর ধ্রুপদ রিসার্চ সেন্টার), সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত।

বিভিন্ন বৈষ্ণবমন্দির, এবং সর্ব বৃহৎ রাসমঞ্চ ইত্যাদি তাঁর সময়ে নির্মিত হয়।[১] যেখানে বিখ্যাত রাস উৎসব হত এবং সেবাদাসী-দেবদাসীরা যোগদান করতেন। রঘুনাথ সিংহ (সপ্তদশ শতক) বিখ্যাত শ্যামরায় (১৬৮৩ খৃঃ) কালাচাঁদ এবং জোড়বাংলা মন্দির তৈরি করেন। সে মন্দিরগুলিতে দেবদাসী সুরসুন্দরীদের নৃত্যভঙ্গিমা ভাস্কর্যে বিধৃত আছে।

প্রচলিত ধারণা বাংলায় দেবদাসী প্রথা ছিল না— নেই। কিন্তু পূর্বোক্ত তথ্যগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে যুগযুগ ধরে বাংলায় নানা ধরনের দেবদাসী, রাজদাসী, স্বদাসীর প্রথা চলে আসছে। এর নিদর্শনস্বরূপ দেখা যায় মন্দিরগুলিতে নাটমন্দিরের অবস্থান, যেখানে নৃত্য-গীত-বাদ্য-নাট্য পরিবেশিত হত। যেমন, দেখা যায় আদিনা মসজিদে। মসজিদে মন্দিরের ধংসাবশেষের প্রস্তরখণ্ড, দরজা, রাজার সিংহাসন দেখা যায়।[২] জনশ্রুতি এটি রাজা গোপালের সময় নির্মিত — আদ্যানাথের মন্দির ছিল; এখানে বৃহৎ নাটমন্দির দেখা যায়। রাজা জয়ন্ত নির্মিত জটার দেউল মন্দিরে (৯৭৫ খৃঃ) ও বাংলার বিভিন্ন মন্দিরগুলিতে, বিশেষত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতেও নাটমন্দির আছে। পরবর্তীকালে সেই ধারা বজায় রেখে আধুনিক মন্দিরগুলিতেও নাটমন্দির দেখা যায়। যেখানে বর্তমানে লীলাকীর্তন, আরতি নৃত্য ইত্যাদি হয়ে থাকে। আধুনিক বাংলায় বিশেষত পশ্চিমবাংলাতে এখনও দেবদাসীপ্রথার ক্ষয়িষ্ণু ধারা বর্তমান। রাঢ়বঙ্গের মালভূমিময় অঞ্চলে স্থানীয় রাজাদের রাজদাসী-নটী, কথ্যভাষায় 'নাচনী' আজকের স্বদাসীতে পরিণত। এই নাচনী সম্প্রদায় জোতদার রাজাদের বিবাহিতা স্ত্রী নন এবং যিনি নাচনী রাখতেন তাঁকে রসিক নামে অভিহিত করা হত। রসিকের সংগীতে অর্থাৎ গীত-বাদ্য-নৃত্যে ব্যুৎপত্তি থাকত, তিনি নাচনীকে কলাবিদ্যায় শিক্ষা দিতেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শ্রীকৃষ্ণ রসের সাগর, 'রসিক' বলা হয় তাঁকেই, তিনি গীত-বাদ্য-নৃত্যে পারদর্শী—এই থেকেই সম্ভবতঃ রসিক কথাটি এসেছে। নাচনী সম্প্রদায়ের রসিকের সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি থাকত এবং সে কলারসিক ও কলাভিজ্ঞ হত। রাঢ়অঞ্চলের বিভিন্ন রাজারা রসিক হতেন, 'নাচনী'দের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

জামতাড়ার মহারাজ শ্যামলাল সিং নিজে পাখোয়াজ বাজাতেন, তাঁর

১। Bishnupur by S.S.Biswas, Archaeological Survey of India. 1992. Pg. 5-6 & 22.

২। Memories of Gaur and Pandua, by Khan Sahib Mr Abid Ali Khan, edited H.E. Stapleton, Dept. of Information and Culture, Govt. of W.B., 1986, Pg. 115-119.

নাচনী ছিল—রাধিয়া, মাধিয়া, ফুলমণি, ফুটকি। জামতাড়া রাজপ্রাসাদের উত্তর প্রান্তে পুকুরপাড়ে নাচনী মাধিয়ার বসতি ছিল। রাজা শ্যামলাল সিংহের বেশির ভাগ নাচনীই থাকত মাহারডাল নামক রেল ফটকের কাছে। দক্ষিণভারতেও এরকম আঞ্চলিক রাজাদের নিদর্শন পাই যাঁরা গানবাজনা জানতেন, রাজদাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যেমন—ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা স্বাতী তিরুনাল (উনবিংশ শতক)। যিনি তাঞ্জোরের 'দাসী আট্টম' থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে মোহিনী আট্টম নৃত্যের সূত্রপাত ঘটান ও তার কলেবর বৃদ্ধি করেন। পঞ্চাশটির মত নৃত্যোপযোগী পদম ও বর্ণম লেখেন।[১] এইরকমই রাঢ় অঞ্চলের রাজা-জোতদাররা নাচনী নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, গান লেখেন, গীত-বাদ্য-নৃত্যের উন্নতি ঘটান। আজ রাজা-জোতদার-ভূ-স্বামীরা নেই কিন্তু রসিক নাচনী সম্প্রদায় এখনও আছে। সেই নাচনী আজ স্বদাসী—সাধারণ জনসমক্ষে নেচে গেয়ে বেড়ায়, রসিক ধরে তাল এবং দাসীদের মতোই নাচনীর উপার্জিত অর্থে রসিকের সংসার চলে। যেমন চলত দাসীদের উপার্জিত অর্থে নাট্টুবানদের (দাক্ষিণাত্যের) সংসার।[২] এই নাচনী নৃত্যধারার রীতি অনুসারে নাচনী প্রথমে আসর বন্দনা করে (বিশেষত হয়ে থাকে গণেশবন্দনা এবং অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা), তারপর মঙ্গলাচরণ এবং তার পথ ধরে আদিরসাত্মক বা শৃঙ্গাররসাত্মক অভিনয় সংপৃক্ত ঝুমুর নাচ ও গান। গানগুলির সুর মূলতঃ কীর্তনের। এককালে হয়ত ছিল ঝুমুরী কীর্তন, বেশির ভাগই রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়—দুন্দুভি বা ধাম্‌সা, রেট্‌কি, ছোটমৃদঙ্গ বা মাদল, সানাই, বাঁশী, মন্দিরা, পায়ে থাকে ঘুঙুর। আজকাল তবলা এবং হারমোনিয়ামও ব্যবহৃত হচ্ছে। পদকর্তারা নাচনীদের নৃত্যোপযোগী বহু সুন্দর সুন্দর ঝুমুর পদ লিখে গেছেন এবং পদকর্তারা হলেন বিখ্যাত রসিক সম্প্রদায়, কবিগণ। এঁদের মধ্যে ভবপৃথানন্দ ওঝা বা কবি বিখ্যাত। এই নাচনী নামের পেছনে 'দাসী' শব্দটি লক্ষণীয়। যেহেতু তাঁরা বিবর্তনের ফলে রাজদাসী থেকে স্বদাসীতে রূপান্তরিত। বর্তমানের বিখ্যাত কতিপয় নাচনীদের নাম—বিমলাবালা দাসী, পোস্তবালা দাসী, রজোবালা দাসী। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যিনি তাঁর নাম সিন্ধুবালা দাসী। বর্ধমান জেলার সীমান্ত বরাবর আমার গুরু রসিক শশী মাহাতোর নাচনীদের মধ্যে বিখ্যাত আকাশী দাসী, চঞ্চলিয়া দাসী,

১। Mohiniyattom, Prof. C.K.Moosad, Dept. of Public Relations, Govt. of Kerala, 1986, Pages 54-60.

২। ভারতের নৃত্যকলা, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ২৩৬।

তারামণি দাসী প্রমুখ। বাংলায় দেবদাসীধারার একটি শাখাকে 'নাচনী' বলা প্রথাটি নতুন নয়। প্রাচীনকাল থেকে বাংলা সাহিত্যের 'মনসামঙ্গল' কাব্যেও এর নিদর্শন পাই।

'দেবতা সভায় গিয়া মৃদঙ্গমন্দিরা লইয়া
নৃত্য করে বেহুলা নাচনী।"

অথবা

"লখাই বাজায় খোল বেহুলা নাচনী
মনসার কাছে রঙ্গে নাচেন আপনি।।"[১]

এছাড়া বর্তমানেও দেখা যায় যেসব বৈষ্ণবী সেবাদাসী কীর্তনীয়া গৃহী নন তাঁরা বৈষ্ণব সেবাদাসের সঙ্গে সঙ্গে দল নিয়ে নানা উৎসবে দেবালয়গুলিতে এখনও নেচে গেয়ে বেড়ান। বিশেষতঃ উৎসবে—মাঘী পূর্ণিমা, রাস উৎসব, ঝুলন উৎসব, হোলি উৎসব ইত্যাদি নানা ধরণের উৎসবে নৃত্যগীত করেন। এঁরা 'ভক্তা' সম্প্রদায়ের দেবদাসী। এখানে এঁরা প্রথমে করেন বন্দনা, তারপর মঙ্গলাচরণ, তারপর করেন মহাজনপদ ও বিভিন্ন ধরনের পালা-সংগীত অর্থাৎ গীত-বাদ্য-নৃত্য। সঙ্গে দল অর্থাৎ দোহার বা পালি গায়েন। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় জোড়া শ্রীখোল, করতাল, মন্দিরা, বাঁশী বর্তমানে হারমোনিয়াম। চলে নানারকম পালাগীত ও নৃত্য। শ্রীখোল নিয়ে পালার মাঝে মাঝে বাদকশিল্পীর বোলের সাথে চলে নৃত্ত। অভিনয় প্রধান নৃত্যপালাগুলি—কৃষ্ণলীলা, চৌষট্টি রসের কীর্তন, অষ্টনায়িকা তথা চৌষট্টি নায়িকা, কীর্তন, মাথুর, দানলীলা, নৌকাবিলাস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কীর্তন নৃত্য ও গীত পরিবেশিত হয়। দেবায়তনে নর্তকী প্রয়োগের ক্ষীণ ধারাটি বর্তমান বাংলাতে এখনও অন্যভাবে অন্যরূপে বিরাজমান।

উপরি উক্ত আলোচনার পাশাপাশি আরও একটি আলোচনা না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উনবিংশ শতকের বাংলায় বিশেষত কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলায় আর একটি নৃত্যধারার প্রচলন হয়েছিল—সেটি হল 'বাঈনাচ'। এর আমদানী করেছিলেন মূলতঃ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ মেটিয়াব্রুজে বন্দী হয়ে আসেন এবং কলকাতায় ছিলেন দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর (১৮৫৬-১৮৮৭), শহরে বাঙালীর উত্তর ভারতীয়

১। মনসা মঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, শ্রীবিজন বিহারী ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত। সাহিত্য একাডেমী, নিউ দিল্লী, পৃঃ ২৩ ও ২৪।

সংগীতপ্রীতি এবং বাঈনাচের অন্যতম প্রেরণা তিনিই।[১] ১২৭১ বঙ্গাব্দের ২১শে বৈশাখ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি থেকে জানা যায় যে, রাসমেলা উপলক্ষে রাত্রিবেলা খেম্‌টা নাচ হত।[২]

মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত কিন্তু এর বিরুদ্ধাচরণ বা প্রতিবাদও আমরা জানতে পারি বিভিন্ন পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের লেখা দলিল ইত্যাদি থেকে। যেমন আরবীয় পর্যটক অলবেরুণীর বিবরণ (৯৭৩-১০৪৮ খৃঃ) থেকে জানা যায় যে, সমাজের সুস্থ পরিবেশ ও নৈতিক শুদ্ধকামী ব্রাহ্মণ ও তাপসেরা দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিবাদ কার্যকর হয়নি ; কারণ রাজা এবং প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায় এই প্রথা সমর্থন করতেন। রাজপুতনার একটি লেখে (১০ম শতক) অলবেরুণীর এই কথার সমর্থন আছে। এতে লিপিবদ্ধ আছে যে একজন সেনানায়ক তাঁর উত্তরাধিকারীগণকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন, "বিভিন্ন মন্দিরে আমার নিযুক্ত দেবদাসীগণের সেবায় কোন ব্রাহ্মণ বা তাপস হস্তক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ বাধা দিতে হবে।" এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে উল্লিখিত শতকে এই প্রথার এমন তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল যে, প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও একে উপেক্ষা করতে পারেন নি। অবশ্য স্বভাবতই রাজার অভিপ্রায়ই বলবৎ হয়েছিল। বঙ্গদেশেও এই প্রথার সাক্ষ্য বহন করে সাহিত্য গ্রন্থরাজী-উৎকীর্ণলিপি, ভাস্কর্য ও জীবন্তধারা।[৩]

এক নজরে বাংলার দেবদাসী ঃ—

(ক) খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতক— ৬ষ্ঠ শতক

(১) মৃৎফলকে নটী বা নর্তকীর ভাস্কর্য।

(২) বাৎসায়নের কামসূত্রে মৃদুভাষী দেবদাসী।

(৩) সুবন্ধু রচিত — "বাসবসত্তা" নটীর ওপর রচিত সাহিত্য।

(খ) মধ্যযুগ—৬০০-১২০০ খৃষ্টাব্দ—

(১) কলহনের রাজতরঙ্গিণীতে বাংলার দেবদাসীদের উল্লেখ।

(২) পালরাজাদের সময়ে দেববারবণিতা বা দেবদাসীদের উল্লেখ।

(৩) সেনরাজাদের সময়ে সাহিত্যে লেখমালায় দেববাসিনী বা দেয়াসিনী, দেবদাসী, নটীদের উল্লেখ।

১। মেটিয়াবুরুজের নবাব, শ্রীপান্থ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃঃ ৩০৭-৩১১,

২। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী..., পৃ: ২৬৭-২৮৩।

৩। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী..., পৃ: ৩০৭-৩১১।

(গ) তুর্কী অনুপ্রবেশ — ১২০০-১৪০০ খৃষ্টাব্দ

(১) পূর্বে প্রচলিত ধারাগুলিই প্রবহমান। যার ফলে পরবর্তীকালে নটীদের উল্লেখ।

(ঘ) ১৪০০-১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ

(১) মঙ্গলকাব্যে নটীদের উল্লেখ।

(২) বিষ্ণুপুর, জামতাড়া ও অন্যান্য রাজাদের মন্দিরে ও দরবারে দেবদাসী, রাজদাসী, সেবাদাসী, নাচনী, নটী ও বাঈদের উল্লেখ।

(ঙ) আধুনিক— নাচনী ও সেবাদাসী কীর্তনীয়া।

আধুনিক যুগে এই প্রথার প্রতি জনসাধারণ বিরূপ হয়ে ওঠে। কারণ এই প্রথার আবরণে মানুষ হীনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পথ পেয়েছিল, তাই রুচিবান লোকের কাছে এই প্রথাটি ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সামাজিক নিপীড়নের ফলস্বরূপ দেবদাসীদের গ্লানিময় দুর্বিষহ জীবন, কিন্তু তবুও আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ তারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক শিল্পকলাকে সযত্নে লালন করে এসেছে—চর্চা করে এসেছে। যার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি আমাদের ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রীয় নৃত্যকলাগুলি—ভরতনাট্যম্, মোহিনীআট্টম, কুচিপুড়ী, ওড়িশি, কথক, গৌড়ীয় ইত্যাদি। অর্থাৎ এই প্রথার ধনাত্মক দিকটি হল—ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে ধরে রাখা। তাইতো রবীন্দ্রনাথ 'বসন্তসেনা' সম্বন্ধে বলেছেন— "বসন্তসেনায় যে চরিত্র বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব নেই বটে, কিন্তু রমণীর দায়িত্ব আছে। তাকে অশ্রদ্ধা করার জো নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় তখন এই রকম নারীরা সতর্কভাবে আপন সম্ভ্রম রক্ষা করার চেষ্টা করত, নইলে তাদের যেটি আসল কাজ সেটাই ব্যর্থ হত।"

বাঙলার নৃত্যে ধর্মীয় প্রভাব

বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক থেকে বাঙলাদেশ গঠিত হয়ে গেছিল প্লাওসিন যুগে (প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর আগে।)। এর পরের যুগকে বলা হয় প্লাইস্টোনিক যুগ, এই যুগেই মানুষের আবির্ভাব ঘটে। সেই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ যে বাঙলা দেশে বসবাস করতো তার প্রমাণ পাই বাঙলায় প্রাপ্ত সেই সময়কার মানুষদের ব্যবহৃত আয়ুধসমূহ থেকে। এই আয়ুধগুলি পাওয়া গেছে বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে। প্লাইস্টোসিন বা প্রত্নপলীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আনুমানিক দশহাজার বছর আগে। তারপর শুরু হয় নবপ্রস্তর বা নবপলিয় যুগ। এই যুগের শিল্পচেতনার আভাস পাই সেই সময়কার মানুষের রঙের ব্যবহারের নিদর্শনে। বহু যাদুঘরে যেমন, বেহালা স্টেট মিউজিয়াম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (বিষ্ণুপুর) ইত্যাদি স্থানে মাটির পাত্রের ওপর শৈল্পিক নিদর্শনগুলি রয়ে গেছে। নবপলীয় যুগের পর অভ্যুদয় হয় তাম্রাশ্ম যুগের। তাম্রাশ্ম যুগের ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়। বাঙলায় এই সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে পাণ্ডুরাজার ঢিবি।[১] প্রাগ্ যুগের আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে বহু কিছু আমরা পেয়েছি যা এখনও চলছে, যেমন — পূজা ও শবরোৎসব, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি, ষষ্ঠীপূজা, যাত্রা জাতীয় পর্বাদি, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, পৌষপার্বণ, নবান্ন ইত্যাদি।[২]

জৈনধর্ম—এই প্রাক্‌আর্য ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্ম। জৈনদের 'ষোড়শ জনপদ'-এর তালিকায় অঙ্গ, বঙ্গ, লাঢ় (রাঢ়) ইত্যাদি দেশসমূহের উল্লেখ থেকে মনে হয় জৈনরা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। জৈন 'কল্পসূত্র' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে 'গোদাস' প্রমুখ জৈন অধুনা চারটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন—তামলিত্তিয়

১। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, অতুল সুর, সাহিত্যলোক, ১৯৮৬, পৃঃ ২০-২১,

২। ঐ, পৃঃ ১০২-১০৪।

(তাম্রলিপ্তীয়), কোটিবর্ষীয় (কোটিবর্ষীয়), পুণ্ড্রবর্ধনীয়া (পুণ্ড্রবর্ধনীয়) ও খব্বডীয় (কর্বটীয়)। জৈনযুগের নৃত্যচর্চার কথা অন্যত্র অর্থাৎ দেবদাসী পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজগুরু ছিলেন 'ভদ্রবাহু'। তিনি বাণগড় অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি মৌর্যসম্রাটকে সমস্ত জনগণসহ দক্ষিণভারতে নিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন এবং সম্রাট তা পালন করেন। এর ফলে দক্ষিণ ভারতে পাটলিপুত্র-বাংলা থেকে বৃহৎ জনসমাগম হয় এবং দক্ষিণভারতে জৈনধর্ম ও বঙ্গসংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। (সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ততথ্য : প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ প্রয়াত অধ্যাপক অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বালুরঘাট)।

বৌদ্ধধর্ম ও নৃত্যকলা—বৌদ্ধধর্মও বাঙলাদেশে খুব প্রাচীনকাল থেকেই বিস্তার লাভ করেছিল। 'সংযুক্ত নিকা' অনুযায়ী স্বয়ং বুদ্ধ কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গের শেতক নগরে বাস করেছিলেন। 'বোধিসত্ত্ব কল্পলতা'-তেও উল্লিখিত হয়েছে যে, ধর্মপ্রচারার্থে বুদ্ধ ছয়মাস কাল পুণ্ড্রবর্ধনে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে বাস করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন বাঙলাদেশে এসেছিলেন তখন তিনি তাম্রলিপ্তিতে বাইশটি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। এসব থেকে বুঝতে পারা যায় যে বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উয়াং-চুয়াং ভারতে আসেন, তখন তিনি কজঙ্গল, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য দেখতে পান, পালবংশের দ্বিতীয় সম্রাট ধর্মপাল বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে অনুশীলনের জন্য ন্যূনতম পঞ্চাশটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—ত্রৈকূট বিহার, দেবীকোট বিহার, পণ্ডিত বিহার, সন্নগর বিহার, ফুল্লরী বিহার, পট্টিকেরেক বিহার, বিক্রমপুরী বিহার ও জগদ্দল বিহার। এই সকল বিহারের অধিকাংশই বাংলায় ছিল। এই সকল বিহারে শতসহস্র ছাত্র নানাদেশ থেকে এসে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুশীলন করতেন এবং তারা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশীলা মহাবিহারে একান্ন জন পণ্ডিত ছিলেন।

বজ্রযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের এই সময়েই অভ্যুত্থান ঘটে এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বজ্রযানকে সহজযান বা সহজিয়া ধর্মও বলা হয়। এই সহজিয়া চিন্তাধারাই আমাদের চর্যাপদ-সমূহের মধ্যে দেখা যায়। চর্যাপদে গীত-বাদ্য-নৃত্যনাট্যের কথা পাই। অর্থাৎ তৎকালীন বাংলায় তারের বাদ্যযন্ত্রের সুর বাজানো, বিবাহের বাদ্যভাণ্ড ও উৎসব, নৃত্যগীত-নাটিকাভিনয়, অভিনয়সজ্জার পোশাক-পরিচ্ছদের পেটিকা ও বুদ্ধ নাটক বা বুদ্ধলীলা সম্পর্কীয় নাট্যগীতের

প্রচলন সম্বন্ধেও উল্লেখ আমরা চর্যাপদে পাই।[১] বৌদ্ধদেবমণ্ডলীতে অসংখ্য দেবতা আছেন। অমিতাভকুলের দেবদেবী সমূহ, রত্নসম্ভবকুলের দেবদেবীগণ, অমোভকুলের দেবদেবীগণ, দশদিগ্‌দেবতা, ছয়দিগ্ দেবী, পঞ্চরক্ষাদেবী, চারলাস্যাদি দেবী, চার দ্বারদেবী, চার রশ্মিদেবী, দ্বাদশভূমিদেবী ইত্যাদি। এই বৌদ্ধ দেবদেবীমূর্তি বাংলায় প্রাচীনকাল থেকে পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলি স্থানক, মুদ্রা ইত্যাদি বিভিন্ন নৃত্যের ভঙ্গিমাযুক্ত।

নাথধর্মে নৃত্য—বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি আরেকটি ধর্মেরও খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষাংশে ও দ্বিতীয় সহস্রকের সূচনায় অভ্যুত্থান হয়। তার নাম 'নাথধর্ম'। এটি শৈবধর্মেরই শাখাবিশেষ। তবে এর ওপর বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্মেরও প্রভাব ছিল। কথিত আছে শিব যখন দুর্গাকে গুহ্যতত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন নাথ ধর্মাবলম্বীদের আদিপুরুষ মীননাথ গোপনে তা শুনেছিলেন। 'কায়া' সাধনা নাথদের চরম লক্ষ্য[২] —এই ধর্মকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তাতে নৃত্যের সুন্দর বর্ণনা পাই। এই নৃত্যের আলোচনা অন্যত্র আছে। এই প্রসঙ্গেই ধর্ম ঠাকুরের নাম স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করলেও তিনি স্পষ্টতঃ পরবর্তী যুগের বৌদ্ধধর্মের আদিদেবতা ও তাঁর পূজাপদ্ধতি বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। ধর্মঠাকুর আধারিত মঙ্গলকাব্য 'ধর্মমঙ্গলকাব্য' নামে সর্বজনবিদিত। প্রায় প্রতি ধর্মমঙ্গলের ঘটনায় কাল নির্দেশকরূপে ধর্মপাল ও তাঁর পুত্রের নাম উল্লিখিত। তাই বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বে ধর্মমঙ্গলকাব্য সম্ভবত সর্বাপেক্ষা পূর্বগামী। মৃদঙ্গ-মন্দিরা-চামর সহযোগে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ধর্মমঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনারাম চক্রবর্ত্তীর আনুমানিক রচনাকাল ১৭১১ খৃষ্টাব্দ।[৩]

শাক্তধর্ম ও নৃত্য—বাঙলা মূলতঃ অনার্য অধ্যুষিত দেশ এবং বাঙালী জাতি মিশ্রজাতি। তাদের নিজেদের লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীর মিশ্রণ ঘটেছে। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান দেবতা নারীরূপা এবং তন্ত্রের পীঠস্থান বাঙলাদেশ। এই নারীদেবীরা সমগ্র বাঙালী জাতির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। যার প্রভাব পূজা-নৃত্য-গীতে পড়েছে। শাক্তপদাবলী ও মঙ্গলকাব্য বাঙালীর ভক্তিময় সংগীতপ্রিয় মানসিকতারই প্রকাশ। বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবতন্ত্র একসময়ে প্রবল ছিল। তার মধ্যে বৈষ্ণবতন্ত্রে অনেকটা বৌদ্ধভাব ঢুকেছে এবং সহজিয়াদের

১। চর্যাপদ—শ্রী মনীন্দ্র মোহন বসু সম্পাদিত, কমলা বুক ডিপো, পৃঃ ৮৭।
২। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃঃ ১১১-১১২।
৩। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৬৭, পৃঃ ৫৬-৬৮।

মধ্যেই বিশেষ প্রচলিত ছিল। শাক্ততন্ত্রের প্রধান গ্রন্থ 'কুলার্ণবতন্ত্র'। এছাড়া সারদাতিলক।[১] শৈব ও শাক্ততন্ত্রের মধ্যে খুব বেশী বিভিন্নতা নেই। অর্ধনারীশ্বর মূর্তির শিবের দিকটি শৈবতান্ত্রিকের এবং গৌরীর দিকটি শাক্ততান্ত্রিকের উপাস্য। শক্তিসাধনার লীলাকেন্দ্র হিসেবে বীরভূম প্রসিদ্ধ। বীরভূমের প্রায় প্রতি শহরের কাছেই সতীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি করে 'শাক্ত পীঠ' আছে। যথা—বক্রেশ্বর, কঙ্কালীতলা, লাভপুর, ফুলবেড়িয়া, নলহাটি, বৈদ্যনাথধাম (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।), তারাপীঠ ইত্যাদি। বীরভূমে যত শাক্তমহাপীঠ আছে বাঙলা তো দূরের কথা ভারতের আর কোথাও নেই। বক্রেশ্বরে আছেন দেবী মহিষমর্দিনী, লাভপুরে ফুল্লরাদেবী, নানুরে বিশালাক্ষী, তারাপীঠে তারাদেবী ও নলহাটীতে দেবী ললাটেশ্বরী।[২] শাক্তদেবী—কালী, তারা, চণ্ডী, রঙ্কিনী প্রভৃতি দেবীদের নৃত্য বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। ভাস্কর্যে, সাহিত্যে, চিত্রকলায় এর নিদর্শন পাই। এই শাক্ত ধর্ম প্রভাবান্বিত বিভিন্ন ধরনের কালীনৃত্য বাংলায় প্রচলিত—

(ক) কালীকাচ ও কালী নাচ—কালীকাচ একটি মুখোশ নৃত্য যা রাতেই অনুষ্ঠেয়। এর সঙ্গে অন্যান্য দেবতাও নৃত্য করেন, যেমন—কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি। শাবরী মন্ত্রপূত কালীর মুখোশ নর্তকের মুখে বাঁধা হয়। ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে হাতে নরমুণ্ড ও খাঁড়া নিয়ে কালীনৃত্য চলে। অগ্রতলসঞ্চর পাদকর্মে কালী আসরে অবতীর্ণা হয়ে চক্রাকারে ঘুরে এসে দাঁড়ান আলীঢ়া বা প্রত্যালীঢ়া স্থানকে—বিভিন্ন ধরনের ভ্রমরী সংপৃক্ত অতি জনপ্রিয় নৃত্য এটি। ঢাকাতে এই নৃত্য বহুল প্রচলিত ছিল। এই নৃত্যটি গাজন উৎসবের অঙ্গ। ঢাকের তাল বিলম্বিত লয়ে শুরু হয়ে নর্তকের ভাবাবেশের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য-দ্রুত লয়ে হতে থাকে। কালীনৃত্যে কালীর বিভিন্ন ধ্যানরূপ, বিভিন্ন রসের প্রচলনও দৃষ্ট হয়। তবে মূলতঃ—বীর, বীভৎস ও ভয়ানক রস প্রধান। এক এক অঞ্চলে এক এক নামে কালীর বিভিন্ন নৃত্য দেখা যায়। যেমন—পুরুলিয়ার ছৌতে কালীর নৃত্য, দক্ষিণ-২৪-পরগণায় বহুরূপী নৃত্যে কালীর নাচ, উত্তরবঙ্গে বিশেষত কোচবিহারের ধাইচণ্ডী-কালিকাচণ্ডী নৃত্য। ধাইচণ্ডীর নৃত্যে তন্ত্রোক্ত ভদ্রকালীর ধ্যানরূপের প্রচ্ছন্ন আভাস দেখা যায়।[৩]

১। বৃহৎবঙ্গ, দীনেশচন্দ্র সেন (১ম খণ্ড), দে'জ পাব্লিকেশন, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৮১-৫৮২।
২। বাংলার ধর্মীয় যাদুঘর—ডঃ অতুল সুর, প্রতিদিন পত্রিকা, রবিবার, ১৫ই মার্চ, ১৯৯৮।
৩। বাঙলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, নৃত্যবিদ্ শ্রীমণিবর্ধন, স্বরাষ্ট্র (প্রচার) পঃ বঃ সরকার, ১৯৬১, পৃঃ ৮৯।

নৃত্যের ব্যঞ্জনায় মনে হয় যেন দেবীচণ্ডী সমগ্র জগতকে একগ্রাসে গিলতে চান। প্রচণ্ড রূপিণী শক্তির প্রচণ্ড জাগরণ। কখনও মাণ্ডুকীগতি, কখনও কূর্মালগ উৎপ্লবন, কখনও বিদ্যুৎভ্রান্তচারী দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় 'ঢাক'। মুখে কালীর ন্যায় রূপসজ্জা ও পরণে থাকে ঘাঘরা। সাধারণত মহিলা শিল্পীই নৃত্যটি করে থাকেন—একটি গাছের পাতাকে লাল রঙ করে জিহ্বা বানিয়ে অপূর্ব শাস্ত্রীয় তালে বিলম্বিত লয় থেকে দ্রুত লয়ে শেষ করেন। সঙ্গের বাদক ঢাকী পুরুষ শিল্পীও নৃত্যপটু হন। তিনিও কালী নৃত্য শিল্পীর সঙ্গে নেচে নেচে সংগত করেন।

গম্ভীরা উৎসবের কালী নাচ—গম্ভীরা উৎসবের কালী নৃত্য বিভিন্ন নামে হয়ে থাকে—ঝাঁটাকালী, রক্ষাকালী ইত্যাদি। ঝাঁটাকালীর হাতে থাকে রুধির পাত্র। ক্ষুধায় কাতর হয়ে যেন তিনি ভ্রাম্যমানা-নৃত্যপরায়ণা। গতিবেগ অন্যান্য অঞ্চলের কালীনৃত্য অপেক্ষা ধীর। দক্ষিণা-কালীর মুখোশ কালীঘাটের কালীর অনুকরণে তৈরী। মুখোশ, নর্তকের মুখে বেঁধে পোড়ান ধূপের গন্ধ শোঁকানো হয়—নর্তক শুয়ে পড়ে ধীরে ধীরে ঢাকের বিলম্বিত বোলের ছন্দে নৃত্য শুরু করেন—দ্রুত লয়ে উদ্দাম গতিতে নৃত্য শেষ হয়।

(খ) ডাইনি নাচ—দার্জিলিং জেলায় তিব্বতীয়দের গুম্ফায় বিশেষ তিথিতে ধর্মীয় আচরণের অন্যতম অঙ্গরূপে মুখোশ পরে ডাইনি পিশাচ নৃত্যের প্রচলন আছে। বীর, ভয়ানক ও বীভৎস রসেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অপদেবতার বিচিত্র পোশাকে নৃত্যটি অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) রঙ্কিনী পাতা, কালীপাতা ও দুর্গাপাতা—মেদিনীপুর জেলার জাম্বনী থানার চিল্কীগড়ে গাজন উৎসব উপলক্ষে পাঁচরকম পাতা বের হয় (পংক্তি থেকে পাতা কথাটি এসেছে)। এর মধ্যে রঙ্কিনীপাতা, কালীপাতা, দুর্গাপাতা এই পর্যায়ভুক্ত। রঙ্কিনী ভক্ত্যার মাথায় কাঁচা মাটির তৈরী একটি নরমুণ্ড (যাকে বারা বলা হয়) তুলে দেওয়া হয় এবং তার হাতে দেওয়া হয় তলোয়ার। এই বারাটিকে মাথায় নিয়ে রঙ্কিনী ভক্ত্যা উদ্দাম গতিতে দ্রুত লয়ে নৃত্য করতে করতে রঙ্কিনী থানে পৌঁছান। যাত্রাপথটি মশালের আলোয়, বাদ্যের গাম্ভীর্যে, নৃত্যের উদ্দামতায় এক আদিম ভয়ানক গা ছম্‌ছমে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কালিকাথানেও ওইদিন অনুরূপ বারাছাড়া অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। চিল্কীগড়ে গাজন উৎসবের শেষদিনকে 'জাগরণ' ও তার আগের দিনকে বলা হয় 'মেল'।[১] গাজন উৎসবের শুরু থেকে

ছৌ ঃ ইন্দ্রানী দত্ত শতপথী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯, পৃঃ ৪৯-৫০।

জাগরণের দিন পর্যন্ত প্রতিদিন শিবমন্দিরের সামনে উন্মুক্ত আসরে একের পর এক মুখোশযুক্ত ছৌনৃত্য বাজনার তালে তালে অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে 'কালিকা', 'জামডালি' ইত্যাদি নাচগুলি প্রতিদিন প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়।[১]

(ঘ) মহিষাসুরমর্দিনী—এটি দুর্গাকর্তৃক মহিষাসুর নিধনের ওপর আধারিত। পুরুলিয়ার ছৌনৃত্যের এটি একটি জনপ্রিয় পালা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে হয়ে থাকে। কোথাও মহিষাসুরমর্দিনী, কোথাও মহিষাসুরবধ, কোথাও দুর্গানৃত্য। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে কোথাও বাজে ঢাক। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া অঞ্চলে বাজে বাংলা ঢোল ও ধাম্‌সা। এছাড়াও দুর্গার আরও বহু ধরনের নৃত্য আছে—পার্বতী নৃত্য, হরগৌরী নৃত্য, হরপার্বতী নৃত্য, আগমনী নৃত্য ইত্যাদি। পুরুলিয়ায় মহিষাসুর বধ পালায় সানাইয়ে যে সুরটি বাজে তার কথা হল—

কে বামা ! কেশরীপরে
দশ করে অস্ত্র ধরে
নাচিছেন ঘোর সমরে
রূপে যিনি চপলা মহেশ প্রেমে পাগলা।

শাক্ত ধর্মের ওপর ভিত্তি করে অপূর্ব সাহিত্য রচিত হয়েছে—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, শাক্ত পদাবলী সমূহ। চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্ত। মধ্যযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নাট্যরূপে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-চামর সহযোগে গ্রামবাংলায় ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয়তার সঙ্গে পরিবেশিত হয়ে আসছে। চণ্ডীমঙ্গলের পাশাপাশি আরেকটি শাক্ত ধর্মীয় মঙ্গলকাব্য নৃত্যগীত সহযোগে পরিবেশিত হয়। সেটি হল 'অন্নদামঙ্গল'। অন্নদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শাক্তধর্ম বাংলার সাহিত্যকলাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। যার ফলে 'শাক্ত' আশ্রিত নৃত্য-নাট্য ইত্যাদি রচিত ও পরিবেশিত হয়ে চলেছে। চণ্ডীমঙ্গল ছাড়াও আছে গৌরীমঙ্গল কাব্য—এটি শাক্তধর্মাবলম্বী।

(ঙ) শাক্ত পদাবলী—শাক্ত পদাবলীর সৃষ্টি অষ্টাদশ শতাব্দীতে। গীত প্রবণতা পদাবলীর মূলসুর। রামপ্রসাদ সেন এই শাক্ত পদসাহিত্যের আদিকবি। শ্যামাসংগীত, আগমনী ও বিজয়গান রচনা করে রামপ্রসাদ সেন বাংলা সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। এটি ঐ পূর্বোক্ত শাক্ত ধর্মকে ভিত্তি করেই

১। ছৌ : ইন্দ্রানী দত্ত শতপথী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯, পৃঃ ৪৯-৫০।

জন্মলাভ করেছে। পরবর্তী অনেক কবিই এই ধারার অনুসরণ করে খ্যাতিমান হয়ে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দেওয়ান রঘুনাথ, কবিয়াল রামবসু, দাশরথি রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালের কবি মধুসূদন, নবীনচন্দ্র সেন, গিরীশ ঘোষও এই গীতিকবিতার ধারাটিকে অনুসরণ করে গেছেন। শাক্ত পদাবলীর মূল বিষয়বস্তু ভক্তি।

বৈষ্ণবধর্ম—বাংলার নৃত্যশৈলীতে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব অত্যন্ত গভীর এবং তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। শিলালিপি, মন্দিরচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসটি আমরা জানতে পারি। বাংলার বিষ্ণু উপাসনার প্রাচীনতম ভাস্কর্যের নিদর্শন সম্ভবতঃ চতুর্ভূজ বিষ্ণু মালদহ জেলার হাঁকরাইল গ্রামের এবং অপরটি বোগরা জেলার নরহট্ট গ্রামের। দু'টি মূর্তিই রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটীতে রক্ষিত আছে। এর দ্বারা প্রমাণিত যে উত্তরবঙ্গে তৃতীয় শতকে বৈষ্ণবধর্ম তথা কৃষ্ণ ভাবনার প্রচার ছিল। কারণ প্রথমটি কুশান যুগের এবং পরেরটি চতুর্থ শতক।[১] বাঁকুড়ার নিকটবর্তী শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহালিপি ও গুহার গাত্রে অঙ্কিত বিষ্ণুচক্র পাওয়া গেছে। আনুমানিক চতুর্থ খৃস্টাব্দে মহারাজ চন্দ্রবর্মার এই লিপিতে চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসনার পরিচয় আছে। পঞ্চম শতকের প্রথমদিকে বগুড়া জেলার বালিগ্রামে গোবিন্দস্বামীর মন্দির, এই শতকেরই দ্বিতীয়পাদে উত্তরবঙ্গে শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকমুখস্বামীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠিত হয়—বিষয়টি এই শতকে পরমবৈষ্ণব ও পুরুষোত্তম উপাসক শ্রীধারণরাতের বিবরণ থেকে জানা যায়। এ ছাড়াও প্রাপ্ত অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তি থেকে বিষ্ণু উপাসনার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পাহাড়পুরে (অষ্টম শতক) কৃষ্ণলীলার চিত্র এর প্রমাণ।[২] গুপ্ত, পাল ও সেনরাজাদের আমলে বঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। গুপ্তরাজগণ বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন। পাল নৃপতিবর্গ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। খালিমপুর লিপিতে ধর্মপালদেবের নন্দদুলাল মন্দিরের উল্লেখ আছে। নারায়ণপালের রাজত্বকালে দিনাজপুরে গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া এযুগে যত দেবমূর্তি পাওয়া গেছে তাদের অধিকাংশই বিষ্ণুমূর্তি। দ্বাদশ শতকে জয়দেব ও বড়ুচণ্ডীদাসের পূর্বসুরি হিসেবে ভোজবর্মদেবের বেলাবো অনুশাসনে ব্রজলীলার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—

১। বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়, সনাতন গোস্বামী, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃঃ ৮।

২। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৬৭, পৃঃ ১৪-১৫।

"সো'পীহ্ গোপীশতকেলিকারঃ
কৃষ্ণোমহাভারতসূত্রধারঃ।[১]

হরিদেববর্মার মন্ত্রী ভবদেব বড় পণ্ডিত ছিলেন (আনুঃ ১০২৫-১১৫০ খৃঃ) তিনি বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করেছিলেন। যেখানে—নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহ— তিনমূর্তি অধিষ্ঠিত করে দেবদাসী নিয়োগ করেছিলেন।

ভারতীয় নৃত্যকলায় বাংলার সবচেয়ে বড় যে অবদান তা হল পরকীয়া রাধাবাদের প্রচার ও প্রসার। 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' গ্রন্থে কৃষ্ণের জীবনলীলা চিত্র-উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হয়েছে। এতে রাধার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালের পুরাণসমূহে বিশেষত বাংলার ব্রহ্মবৈবর্ত, এছাড়া পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণই পরবর্তীকালে পরকীয়া শ্রীরাধাতত্ত্ব বিস্তারিত ও জনপ্রিয় করেছেন।

সেনরাজাদের রাজত্বকালে সংকলিত শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা চিত্রিত হয়েছে। এসব পদে রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব রঞ্জিত হয়েছে। এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। তাঁর 'গীতগোবিন্দ'-এ রাধাকৃষ্ণলীলার চূড়ান্ত পরিচয় পাই। যেহেতু ভাগবতে শ্রীরাধার উল্লেখ নাই তাই সম্ভবত বলা যায় জয়দেবের পরকীয়া রাধাতত্ত্বভিত্তিক গীতগোবিন্দের প্রেরণা বাংলারই 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'।[২] এরপরে চতুর্দশ শতকে সঙ্কলিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গলের' অনেক পদ রাধাকৃষ্ণলীলা রসের পুষ্টি সাধন করেছে। বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধাকৃষ্ণলীলা বৈচিত্র্য বাঙ্‌ময় রসরূপ পেয়েছে। কৃষ্ণের সম্ভোগলীলা ও ঐশ্বর্যের চিত্র গীতগোবিন্দে আছে। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে সম্ভোগশৃঙ্গার রসের প্রাধান্য বেশি পাই। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের প্রাধান্য চৈতন্য পরবর্ত্তী যুগ। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণলীলারসাত্মক পদ রচনায় বিদ্যাপতির অবদান অনস্বীকার্য।[৩] ভারতীয় নৃত্যকলার একটি মুল 'রাধাকৃষ্ণ পরকীয়াতত্ত্ব' এবং এটি আজ সর্বজনস্বীকৃত যে এই তত্ত্বের প্রচারে প্রসারে বাংলার প্রাক্‌চৈতন্য পদকর্তা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অবদান ব্যাপক।

১। The Life of Krishna In Indian Art, P. Banerjee, Publication Division (Govt. of India), 19[illegible], pp. 93-102.
২। শ্রীঅনন্তবাসুদেব শিলালিপি, রাধাকৃষ্ণ বসু কর্তৃক অনুমোদিত ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রনিবাসী, পণ্ডিত রত্নাকর গর্গবটু কর্তৃক প্রকাশিত, Printed at the Union Printing Works By Purna Ch. Mandal, Cuttack, 1917, P. 12. Sloka-32.
৩। বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৬।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতে রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণতম বিকাশ। কৃষ্ণ অংশী রাধা অংশ। মৃগমদ ও তার গন্ধ, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির যেমন ভেদ নাই, রাধাকৃষ্ণও তেমনি অবিচ্ছেদ্য। তাই চৈতন্যচারিতামৃতে পরিস্ফুট হয়েছে

—"রাধাপূর্ণশক্তি কৃষ্ণপূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।।
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নিজ্বালাতে যৈছে না হি কোন ভেদ।।"

গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম তথা গীতগোবিন্দের এই রাধাতত্ত্ব ভিত্তিক নৃত্য এবং দশাবতার নৃত্য সারা ভারতব্যাপী আজও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ভারতীয় অনেক ধ্রুপদী নৃত্যকলার জন্মসূত্র তথা জন্মান্তর ঘটিয়েছে বলা যায়। অবতার প্রসঙ্গ আমরা ভাগবতে, হরিবংশ পুরাণে পাই। কিন্তু যে দশাবতার সমস্ত নৃত্য কলাগুলির মাধ্যমে সর্বজনবিদিত ও অত্যন্ত আদরণীয় সেটি হল জয়দেবের গীতগোবিন্দস্থ দশাবতার স্তোত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রভাবিত হয়ে বিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বীর মল্ল (১৫৯১-১৬১৬) বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ 'রাসমঞ্চ' প্রস্তুত করেন ষোড়শ শতকে। এরপর একে একে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গীত ও নৃত্য পরিবেশনার উপযোগী মঞ্চ তথা নাটমন্দির বা নাটমণ্ডপসহ বিষ্ণুপুরে অনেক মন্দির তৈরী হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মন্দির—জোড়বাংলা, কৃষ্ণ রায় বা কেষ্টরায়, মদনমোহন, শ্যামরায়, রাধামাধব, রাধাগোবিন্দ, রাধাশ্যাম, কালাচাঁদ ইত্যাদি। এই মন্দিরগুলিতে জয়দেবের দশাবতার সহ কৃষ্ণের রাসমণ্ডলী অর্থাৎ হল্লীসক নৃত্য, রাসনৃত্য ও অন্যান্য নৃত্যভঙ্গিমার টেরাকোটা তথা পোড়ামাটির ল্যাটেরাইট তথা মাকড়া পাথরের ভাস্কর্য পাই। শুধু বিষ্ণুপুরই নয় হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ইত্যাদি সহ বাংলার সমস্ত জেলায় বিশেষত বিষ্ণুর মন্দিরগুলিতে জয়দেব বর্ণিত দশাবতার মূর্তি দেখতে পাই।

চৈতন্যপূর্ববর্তী আর একজন কবি শ্রীমালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৪৭৩-১৪৮০ খৃঃ) কৃষ্ণলীলা বিষয়কএকটি অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থের জন্য নবাব হুসেন শাহ তাঁকে গুণরাজ খান উপাধি দেন। শ্রী চৈতন্যদেব এই গ্রন্থটি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে বৈষ্ণবধর্মকে জনপ্রিয় করবার জন্য মালাধর বসুর অবদান অনস্বীকার্য। সেই সময় সারা বাংলায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নৃত্যগীত ব্যাপক ছিল। কৃষ্ণলীলা বাংলায় এত জনপ্রিয় যে বর্তমানেও 'নাচনী' নৃত্যে তার প্রভাব দেখতেপাই। পুরুলিয়ার ছৌতে বহু পালা পাই যেমন—কৃষ্ণের রাস, বলরামের রাস, শঙ্খচূড়ের দর্পভঞ্জন ইত্যাদি অত্যন্ত জনপ্রিয়। শ্রীহট্ট জেলার রাখালের আই

নৃত্যে, ধামাইল নৃত্যে, বৈষ্ণবপন্থী বাউলদের নৃত্য-গীতে, নৃসিংহ নৃত্যে, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের ছৌ বা পাইক নাচে, রাসনৃত্যে, কৃষ্ণযাত্রায়, খেমটা নৃত্যে, ঘাটু নৃত্যে, নাচনী নৃত্যে, কীর্তন নৃত্যে—বিশেষত কীর্তনের বসন্তরাস ও অন্যান্য রাসের বর্ণনায়, নবরস ও বিভিন্ন নায়িকাভেদের বর্ণনায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ব্যাপক। অর্থাৎ বাংলার তথা ভারতবর্ষের নৃত্যগীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অবদান সুমহান। এ বিষয়ে গ্রন্থের অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলার নৃত্যে শৈব প্রভাব

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে নৃত্যের দেবতা হিসেবে শিব বা নটরাজ সুপরিচিত, বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। শৈব তন্ত্র বাংলার গভীরে প্রোথিত, শিবের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরের সংখ্যা বাংলায় সুপ্রচুর। বাংলার প্রায় সমস্ত গ্রামেই শৈব-শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। সেকারণেই শৈবমন্দিরের সংখ্যাও বাংলায় প্রচুর। এমন কী যখন বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের প্লাবনে বঙ্গদেশ ভেসে যাচ্ছে তখনও শিব এবং শক্তির পূজা বিলুপ্ত হয়নি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হরপার্বতীর মহিমাব্যঞ্জক গানে, পদ্যে, লোকগাথায়, গল্পে ভরপুর। বয়ঃসন্ধিক্ষণে কুমারী মেয়েরা শিবের মতো স্বামী পাওয়ার কথা মনে মনে কল্পনা করে। প্রাচীনাদের কাছ থেকে গল্প শুনে; মনের মতো স্বামী পাওয়ার জন্য শিবরাত্রি ব্রত পালন করে। শিবপূজা পদ্ধতি ব্যাখ্যা সমন্বিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ যেমন—লিঙ্গ পুরাণ, শিব পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ প্রভৃতি বাংলায় গদ্য-পদ্য রূপে অনূদিত হয়েছে। বাংলার নরনারী নির্বিশেষে উপাস্য দেবতা হিসেবে শিবকে বরণ করে নিয়েছে, শিবের কাহিনী গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা পাঠ করে শোনান।[১] শৈবধর্মের উৎপত্তি পূর্বভারত থেকে হোক বা না হোক এটি বাংলার প্রধান ধর্মমতগুলির অন্যতম মূল ধর্ম। তার সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে অসংখ্য শিবলিঙ্গ বাংলার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। অন্যান্য অঞ্চলের মতোই বাংলাতেও শিবের তিনটি রূপ কল্পনা করা হয়—মহাযোগী, মহাজ্ঞানী বা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং সঙ্গীতজ্ঞ। বৈষ্ণবদের কাছে বিষ্ণু যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, তেমনই শৈবদের কাছে শিব অর্থাৎ মহেশ্বর বা মহাদেব সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর দ্বারাই জাগতিক সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে (ভূপতি, ভূতনাথ, পশুপতি)। বিষ্ণুর মতো শিবেরও সহস্র নাম বাংলা সাহিত্যে, শাস্ত্রে এবং উৎকীর্ণ লিপিতে ছড়িয়ে আছে।[২] বাংলার নটরাজ বা নর্ত্যেশ্বরের অস্তিত্ব পাই বিভিন্ন ভাবে।

১। Temples and Legends of Bengal by P.C.Roy Chowdhury, Bharatiya Vidya Bhavan, 1998, Pg. 117.

২। Saivism in Bengal - An Icono-Historical Survey, Kalyan Kr. Dasgupta, Culture Indica - Editor in Chief, Prof. Dr. Biswanath Banerjee, 1994, Pg. 285.

ক) নটরাজ বাংলার সাহিত্যে।

খ) নটরাজ বা শিবের অবস্থান বাংলার লোক নৃত্যে এবং সংস্কৃতিতে।

গ) বাংলার লেখমালা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নটরাজ।

ঘ) বাংলার নৃত্যশাস্ত্রে নটরাজ।

শিবের বিভিন্ন নাম—ভৈরব, অঘোর, কঙ্কাল, বীরভদ্র, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি।[১] শিব যখন সন্ধ্যাতাণ্ডব নাচেন, রত্নাকর সেই নৃত্য কল্পনা করে রূপ বর্ণনা করেছেন—সূর্য এবং চন্দ্র হল মন্দিরা যাঁদের দ্বারা দেবী তাল রক্ষা করছেন, গোধূলীগগনে অষ্টগিরি পর্বতের কাছে সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে এবং জটার মাঝখান থেকে পূর্ণচন্দ্র বেরিয়ে আসছে।[২] শিবের নৃত্যানুরাগের কথা পাই শিবসহস্রনামে। তিনি নৃত্যপ্রিয়, নর্তন, সর্বসাধক ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত।[৩] গন্ধর্ব কলায় শিবের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ।[৪] তাঁর নর্ত্যেশ্বর নামটি পাই ঢাকা জেলার ভরেল্লা থেকে প্রাপ্ত পাল যুগের একটি নৃত্যপরা মূর্তির পাদদেশে খোদিত লিপি থেকে। নর্ত্যেশ্বর—যিনি তাণ্ডব ও লাস্য উভয় নৃত্যেই সমান দক্ষ। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে প্রাচীনকাল থেকে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের বৃত্তি ভারতী এবং কৈশিকী। 'কৈশিকী' অর্থাৎ লাবণ্য মণ্ডিত লাস্যাঙ্গ নৃত্য, 'ভারতী' অর্থাৎ কথোপকথন সহযোগে উচ্চণ্ডনৃত্য, শিব বা নটরাজ তাই উভয়লিঙ্গ। একদিকে তিনি তাণ্ডব করেন, অপরদিকে করেন লাস্য এবং সমস্ত রসের আধার।[৫] তাই প্রয়োজনানুসারে কখনও তিনি শৃঙ্গার রসে নৃত্য করেন কখনও করেন রৌদ্ররসে। এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ পাই অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনায়। এটি গৌড়ের পালবংশের নরপতি ধর্মপালের সময়ে তাম্রফলকে প্রাগজ্যোতিষপুর থেকে প্রাপ্ত—অর্ধেকটি নীলপদ্ম দিয়ে সজ্জিত নারী মূর্তি, অপর অর্ধেক সর্পসজ্জায় সজ্জিত। নর্ত্যেশ্বর শুধু তাণ্ডব ও লাস্যেই পারদর্শী নন, তিনি নৃত্ত এবং নৃত্য উভয় নর্তন পদ্ধতিতেই বিশারদ।[৬]

১। *Development of Hindu Iconography,* Jitendra Nath Banerjea, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1985, Pg. 465.

২। *Nataraja in Art Thought & Literature,* C. Sivaramamurthy, Publication Division, Govt. of India, 1974, Pg. 2.

৩। Ibid., Pg. - 3.

৪। *The Natyashastra,* Bharata Muni, Vol. I., Translated and edited by Dr. Manomohan Ghosh, Manisha, 1995, Pg. 199.

৫। *Nataraja in Art Thought & Literature,* C. Sivaramamurthty, Publication Division, Govt. of India, 1974, Pg. 3-4.

৬। Ibid., Pg. 21-38.

শিবের নৃত্যের তাৎপর্য্য ঃ

ক) নৃত্য সর্বজ্ঞ (Dance of Omniscience)—পালযুগে প্রাপ্ত গৌড়বঙ্গের বীণাধর নটরাজ শিবের সর্বজ্ঞানী রূপের প্রতিমূর্তি। শিব বীণা হাতে নন্দী ষাঁড়ের ওপর ললিত আনন্দ তাণ্ডব নৃত্য করছেন। দক্ষিণামূর্তি (ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত) এবং বীণাধর নটরাজ মূর্তি জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক।

খ) সর্বকালের সর্বসময়ের নৃত্য (Dance of Time and Eternity)—মহাকালের নৃত্য অর্থাৎ সর্বকাল ও সময়ের নৃত্য—'কালান্তক'। গৌড়ীয় ভাস্কর্য রীতিতে পালযুগের নৃত্যপরা শিবের বারোহাতের মূর্তি দেখা যায়। যাঁর দুইহাত মাথার ওপরে তালি দিয়ে অপর দুই হাতে বীণা নিয়ে নন্দীষাঁড়ের ওপর নৃত্য করছেন। কবি গুরুর ভাষায় বলতে হয়—"দুইহাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে।"

গ) শিবের নন্দীষাঁড়ের ওপর তথা অপস্মরের ওপর নৃত্যের সারমর্ম Significance of Siva dancing on Bull as an Apasmara)—শিবের অপস্মরের ওপর নৃত্য অজ্ঞানতা দূর করা, যাব ফলশ্রুতি স্বরূপ জ্ঞানের জন্ম এবং যার ফলে অর্দ্ধচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয় এবং সর্বজ্ঞতা বা সর্বজ্ঞানী গূঢ়ার্থ প্রকাশ করে, শিবের ষাঁড়ের ওপর নৃত্য যা পূর্বভারতে বিশেষত বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও নেপালে প্রাপ্ত নটরাজ মূর্তির এই গূঢ়ার্থই প্রকাশ করে। এই অঞ্চলের প্রাচীন নটরাজ মূর্তিগুলি প্রধানত পালযুগের।

ঘ) জীবনের চিহ্ন বা লক্ষণ (Symbol of Life)—বহুভূজ শিবের নৃত্যপরা রূপ যেন বৃক্ষসমাচ্ছন্ন ব্যাপৃত বনভূমি। নৃত্যকালীন ভ্রমরীর সঙ্গে সঙ্গে জটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। গঙ্গা এবং গৌরী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় শিবের পাশে দাঁড়িয়ে। দশম শতকে বাংলা থেকে নর্তেশ্বরের অপূর্ব এই নৃত্যমূর্তিটি পাওয়া যায়।

ঙ) তিনটে দুর্দশা থেকে ভয় দূরকারী (Destroy Fear from the Three Miseries)—অধুনা বাংলাদেশে শংকরবন্ধ (ঢাকা) থেকে প্রাপ্ত তরবারী ধৃত হস্তে নটরাজ মূর্তি পাওয়া গেছে। যেটি পালশৈলীর ভাস্কর্য রূপে প্রসিদ্ধ। তরবারিহস্তে দশভূজমূর্তি অত্যন্ত মূল্যবান। শিলা লেখমালায় প্রাপ্ত শিব ত্রিদুর্দশা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দূর করেন। অজ্ঞানতা—অন্ধকার ভয়ের মায়াজাল তরবারি দিয়ে ছিন্ন করে জ্ঞানের শিখা প্রজ্জ্বলিত করেন।

এবার আসি একে একে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে নটরাজের আলোচনায়।

১। বাংলা সাহিত্যে নটরাজ—বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের স্থান স্বাতন্ত্রসূচক, শিবমঙ্গল বা 'শিবায়ন' তার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে শিব আধারিত মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য-

গুলি নৃত্যের মাধ্যমে প্রচারিত হতো। নৃত্যগীত চলতো কথোপকথনের মাধ্যমে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-চামর সহযোগে।[১] সংগীতরত্নাকরের রচয়িতা শার্ঙ্গদেব মঙ্গলাচার-প্রবন্ধগীতির উল্লেখ করেছেন।[২]

তিনটি মূল মঙ্গল কাব্যের পাশাপাশি—(মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল) শিবমঙ্গল বা শিবায়ন বাংলার চারু কলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। প্রসঙ্গক্রমে, শিবমঙ্গলে আমরা শিবকে সাধারণ কৃষক এবং পার্বতীকে গ্রাম্যবধূ হিসেবে পাই।

এছাড়া মনসামঙ্গল কাব্যেও শিবের নৃত্যের বর্ণনা পাই। প্রথম বর্ণনা হল শিব আনন্দের উচ্ছ্বাসে মনসাকে নিয়ে নাচছে—

'পদ্মারে লইয়া কাঁখে নাচে শিব ঘনপাকে'

—এই ঘনপাক কথাটির দ্বারা বাংলার নাচের বিশেষত্ব অর্থাৎ 'ভ্রমরী' অনুধাবন করতে পারি। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে (পঞ্চদশ শতক) শিব-পার্বতীর তাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনা আছে।

জগতমোহন শিবের নাচ।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ।।
রঙ্গে নেহালী গৌরীর মুখ।
নাচে গঙ্গাধর মনের কৌতুক।।
হাসিতে খেলিতে চলিতে রঙ্গ।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গ।।
শিবাই নাচেরে মুখেতে গীত গাহে।
হাতে তালি দিয়া কিঙ্করে গীত গাহে।।
বিকট দশনে ভ্রূকুটি ভাল সাজে।
ডুমু ডুমু বলি ডমরু বাজে।।
মরিয়াছিল চণ্ডিকা জীল আরবার।
ডাকিনী যোগিনী দিল জয়জোকার।।
কার্তিক গণপতি দাঁড়াইয়া কাছে।
গৌরীমুখ নেহালিয়া ত্রিলোচন নাচে।।

১। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার, প্রথম খণ্ড।

২। সংগীত রত্নাকর (শার্ঙ্গদেবকৃত) অনুবাদক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭৯ (বাং), পৃঃ ১৬৬।

দেখি কৌতুক দেব-সমাজে।
পুষ্প বরিষণ করে ধুমধুমি বাজে।।
ডাহিনেতে গৌরী বামে পদ্মাবতী।
হাসিয়া চলিল দেব পশুপতি।।

নৃত্যরত শিবের বহু নাম পাই এখানে—শিব, গঙ্গাধর, শিবাই, ত্রিলোচন, পশুপতি প্রমুখ। তার সঙ্গে শিবের নৃত্যের বর্ণনা, বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা, সহযোগী শিল্পীদের বর্ণনা, বাদকের বর্ণনা, তথা আনন্দতাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনা পাই। শিবের সৌন্দর্য, শিবের রূপসজ্জা, অজ্ঞানতা দূরকারী নৃত্যপরা মহাদেবের অপূর্ব বর্ণনা পাই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে—

শঙ্করায় নমো নমঃ গিরিসুতা প্রিয়তম
বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র-সূর্য-হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন।
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি।।
গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধানে বাঘ ছাল
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন
সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়।।
অতিদীর্ঘ জটাজুট কণ্ঠে শোভে কালকূট
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত
ফণীবালা ফণীহার ফণীময় অলঙ্কার
শিরে ফণী ফণী উপবীত।।
যোগীর অগম্য হয়ে সদা থাক যোগালয়ে
কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্তমায়া দেহ্যারে পদচ্ছায়া
সেই পায় চতুর্বর্গ দান।।
মায়া মুক্ত তুমি শিব মায়া মুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়
যারে তুমি দেহ পদচ্ছায়া।।

২। **বাংলার লোকনৃত্যে নটরাজ**—চৈত্রসংক্রান্তিতে অবিভক্ত বৃহৎবঙ্গের গ্রামবাসীরা ত্রিপুরা থেকে বারিপদা (বর্তমানের উড়িষ্যা) পর্যন্ত 'গাজন উৎসবে' মেতে ওঠে। গাজন উৎসব গ্রাম বাংলার নিজস্ব জাতীয় উৎসব। এই উপলক্ষে

শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের নৃত্যের উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে মুখোশ নৃত্যের প্রচলন অধিক। ধর্মীয় ও সামাজিক মেলবন্ধনে জাতপাত নির্বিশেষে এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে।

ক) মহাদেব নৃত্য—শিল্পী খুব একটা রূপসজ্জা করেন না, ঢাকের উচ্চনাদে নৃত্যের স্বরূপ ফুটে ওঠে। এটি ময়মনসিংহ জেলায় বিশেষ প্রচলিত ছিল। এখন দেশভাগের পর প্রায় অবলুপ্ত। শিল্পী যিনি মহাদেব সাজতেন কোমরে লাল কাপড় জড়াতেন, এছাড়া হাত পা উর্দ্ধাঙ্গ থাকতো অনাবৃত, ছাই বা সাদা চকের গুঁড়ো মাখতেন। গলায় পরতেন রুদ্রাক্ষ, জটা থাকতো মাথায় তা নেবে আসতো প্রায় হাঁটু অবধি, মুখোশ পরে ডান হাতে ত্রিশূল নিয়ে হাতটি উর্দ্ধে তুলে এবং বাম হাতে ছোট শংখ নিয়ে নৃত্য করতেন। মুখোশে তিন থেকে পাঁচটি সাপের মুকুট থাকতো। এর দ্বারা বাংলার শিবের প্রতিমূর্তি উদ্ভাসিত হয়। ডানহাতে ত্রিশূল যোগীর প্রতিমূর্তি, বামহাতে শঙ্খ—বাংলার ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি হয়—বাংলার বধূর মঙ্গল চিহ্ন হচ্ছে হাতে শাঁখা, মস্তকে সর্পচ্ছত্র মানবতার প্রতীক। মহাদেবের ব্যক্তিগত-মানবিক ধারণাগুলি একান্তই গ্রামবাংলার নিজস্ব চিত্রণ যা বারে বারে ফুটে ওঠে বিভিন্ন গানে, নাচে, নাট্যে, পটের গানে, প্রবাদে। মহাদেব নৃত্য শুরু হয় ঢিমালয়ে এবং ধীরে ধীরে লয় বাড়তে বাড়তে দ্রুত লয়ে শেষ হয়।

খ) কিরাত অর্জুন পালা—গাজন বিশেষত পুরুলিয়া ছৌয়ের বিখ্যাত পালা কিরাত অর্জুন, কাহিনীটি মহাভারতের। এটি বাংলায় এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে পাল পূর্বযুগের এই কিরাত অর্জুন পালার ভাস্কর্যও নির্মিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে কোলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত।

গ) ধর্ম পূজার মিছিলে নৃত্য রাঢ়— বাংলায় ধর্মপূজা প্রচলিত। ধর্মপূজা সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে এটি বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের তান্ত্রিকতা তথা সূর্য এবং শৈব পূজার সংমিশ্রণ। ধর্মরাজ হিসেবে পূজিত হয় একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড যেটি বাণেশ্বর (শিব) নামে অভিহিত এবং সিন্দুর দ্বারা সজ্জিত থাকে। বাণেশ্বর আবার মালদহের গম্ভীরায় পাটাঠাকুর নামে অভিহিত। ত্রয়োদশীর দিন 'বাণেশ্বর'কে সমবেত ভাবে মিছিল করে পল্লীতে বাড়ী বাড়ী ঘোরানো হয়। শেষে নিয়ে যাওয়া হয় ঘাট অর্থাৎ দীঘির ধারে, সঙ্গে চলে গীত-বাদ্য-নৃত্য। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাজে ঢাক। চতুর্দশীর দিন ভক্ত্যারা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো বা কাঠকয়লা ধর্মঠাকুরের আঙ্গিনায় অর্থাৎ ধর্মরাজ তলায় ছড়িয়ে দেয় এবং সেই জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর ঢাকের তালে তালে তাণ্ডব নৃত্য করে। জ্বলন্ত কাঠের টুকরোগুলি হাতে নিয়ে ঢাকের তালে মধ্যলয় থেকে দ্রুত অতি দ্রুতলয়ে লোফালুফি করতে করতে

ধর্মরাজ তলা প্রদক্ষিণ করে। সন্ধ্যার অন্ধকারে দ্রুত লয়ে জ্বলন্ত লাল অঙ্গার-গুলি লোফালুফি করায় তুবড়ির মত ফিন্‌কি দিয়ে হল্কা ছুটতে থাকে। একে বলে "ফুলখেলা"। চড়ক-গম্ভীরাতেও এরকম "ফুলসন্ন্যাস" নৃত্য দেখা যায়।

ঘ) চড়ক—গম্ভীরা উৎসব—এটি চৈত্র মাসের উৎসব এবং সর্ব্বোচ্চ তুঙ্গে পৌঁছায় চৈত্র সংক্রান্তির দিন। চৈত্রমাসটি শিবপূজার জন্য উৎসর্গীকৃত মাস এবং চড়ক-গম্ভীরা শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বাঙ্গালীর কাছে শিব হল নিরাসক্ততা, সাহস ও সহিষ্ণুতার প্রতীক। যার জন্য ভক্ত্যা সন্ন্যাসীরা ভয় দূর করতে, সাহস, সহিষ্ণুতা, নিরাসক্ততা প্রমাণ করতে শরীরকে নানাপ্রকার কষ্ট দেয়, নানারকম কৃচ্ছ্র সাধন পদ্ধতির আশ্রয় নেয়—লৌহ শলাকা শরীরে বিদ্ধ করে এফোঁড় ওফোঁড় করে বের করে, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর নৃত্য করে, কাঁটা গাছের ওপর ঝাঁপ মারে, নেচে নেচে গড়াগড়ি যায় ইত্যাদি বহুবিধ আচার পালন করে। প্রতি সন্ধ্যায় উপবাস ভঙ্গের পূর্বেই দশাবতার নৃত্য করে। প্রথমে ধূপ-ধুনো ফুল প্রভৃতি দিয়ে বন্দনা-মঙ্গলাচরণ নৃত্য, তারপর ঢাকের তালে বিবিধ নৃত্তপ্রধান নৃত্যাংশ যেমন—'ফুলসন্ন্যাস' নৃত্য ইত্যাদি করে। বালা বা পাটভক্ত্যা বা মূল ভক্ত্যা বাংলার পরম্পরাগত ভাবে চলে আসা শিবের উদ্দেশ্যে বিবিধ স্তব পাঠ করে আর ঢাকের তালে ঘুরে ঘুরে নৃত্য চলে। চড়ক শব্দের অর্থ হলো চক্রাকারে ঘূর্ণন বা পাক খাওয়া—এটি বাংলার নৃত্যের বিশেষত্ব।[১]

এছাড়া আরও বহুবিধ শিবের নৃত্য গ্রামবাংলায় স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার দু'একটির রূপরেখা মেলে ধরা হলো মাত্র।

বাংলার লেখমালা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নটরাজ—অবিভক্ত বৃহৎবঙ্গ শিবের মন্দির ভাস্কর্যে পরিপূর্ণ। উৎকীর্ণলিপি ও সাহিত্য বাংলার শৈবতন্ত্রের নীরব সাক্ষী। গৌড়রাজ শশাঙ্কের তাম্রলেখ (তারিখ G.S.300) থেকে জানা যায় তিনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর শিবের পরমভক্ত ছিলেন। তাঁর শিবভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায় সুবর্ণ মুদ্রায়।[২] পাহাড়পুরে এবং অন্যান্য স্থানে (৭ম - ১১শ শতক) শিবের বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া যায়।

৩। বাংলার নৃত্যশাস্ত্রে নটরাজ—ইতিমধ্যেই উল্লিখিত যে দশম শতকের নটরাজ মূর্তির পাদমূলে বেদীতে নটরাজের আরেকটি নাম পাওয়া গেছে যেটি বাংলায় বহুল প্রচলিত। সেটি হল নর্তেশ্বর। এটি অধুনা বাংলাদেশে প্রাপ্ত। টিপ্পেরা

১। *The Folk Dance of Bengal,* Gurusaday Dutta, Ed. by Ashok Mitra, 1954, Pg. 99-102.

২। *History of Saivism,* Pranabananda Jash, Roy and Chowdhuri, 1954, Pg. 46.

অর্থাৎ বর্তমানের কুম্মিলা জেলার 'নাটঘর' নামক স্থানে নর্তেশ্বরের প্রত্যহ পুজো হয়। স্থানের নাম নাটঘর থেকে বোঝা যায় নৃত্যরত নটরাজ বাংলার কত আপন কত প্রিয়। (ভরেল্লা নর্তেশ্বর মূর্তির লেখ)।[১]

গৌড়ীয় নৃত্যশাস্ত্র গ্রন্থে বারেবারে ঘুরে ফিরে নৃত্যপরা শিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার দু'একটি উদাহরণ রাখছি। ত্রয়োদশ শতকের পণ্ডিত শুভঙ্কর রচিত সংগীত দামোদর গ্রন্থে স্থানক ৩৩ প্রকার, তার মধ্যে দুটি শিবকে আধার করে নামাঙ্কিত, যেমন—'শৈব' ও 'বৃষভাসনম', যেমন বহু প্রকার উৎপ্লবনের মধ্যে 'ভৈরব' একটি বিশেষ প্রকার।

বাংলার শিবকেন্দ্রিক নৃত্যগীত চর্চা বহুপ্রাচীন এবং যা ভারতবর্ষ ও তার বাইরেও ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। দক্ষিণ ভারত শিবকেন্দ্রিক। সেই দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের মন্দিরে 'নিত্যপূজা'য় প্রতিদিন প্রথমে সামবেদ গাওয়া হতো। তারপর গৌড়সংগীত, গৌড়সংগীতের পর দ্রাবিড় সংগীত এবং সবশেষে বাজতো বীণা। তারপর সব অঞ্চলের নৃত্য হতো। অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে নিত্যপূজায় গৌড়সংগীত অবশ্য পালনীয় ছিল।[২] চিদাম্বরম, যেটি নটরাজের মূলস্থান—দক্ষিণ ভারতের বহু নৃত্য নির্মিত হয়েছে এই চিদাম্বরম মন্দিরকে কেন্দ্র করে। চিদাম্বরমে নটরাজ মন্দির তৈরী করেছেন বাঙালী রাজা সিংহবর্মন বা হিরণ্যবর্মন; চতুর্দশ শতকে উমাপতি শিব রচিত তামিল গ্রন্থে এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে এটি পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে গৌড়দেশের সঙ্গে চিদাম্বরমের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[৩] চোলরাজাদের বহু রাজগুরুরা ছিলেন শিবাচার্য। তাঁরা ছিলেন গৌড়দেশের—

চোলনৃপতিবর্গ	রাজগুরুদের নাম	আধিবাসী	সময়	পরবর্তীবাসিন্দা
১) কুলোত্তুঙ্গ	শ্রীকণ্ঠশিব	গৌড়দেশী	১১২০ খৃ.	তিরমঙ্গলক্কুড়ি
২) বিক্রম	,,	,,	১১২১ ,,	,,
৩) কুলোত্তুঙ্গ ২	ধ্যানশিব	,,	১১৫০ ,,	চিদাম্বরম
৪) রাজাধিরাজ ২	উমাপতিশিব	,,	১১৭০ ,,	অর্পক্কম
৫) কুলোত্তুঙ্গ ৩	ঈশ্বরশিব	,,	১২০০ ,,	ত্রিভুবনম

১। *Nataraja In Art Thought & Literature,* C. Sivaramamurti, Publication Division, Govt. of India. 1994, Pg. 289.

২। *Eastern Indian Contact with Tamil Nad,* R. Nagaswamy. Journal of Bengal Art, Vol-3. ICSBA, 1998, Pg. 17.

৩। Ibid., Pg. 18.

দ্বাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকোণ্ডা পালযুগের নর্তেশ্বর মূর্তি বাংলার ললিত আনন্দ তাণ্ডব ভঙ্গিমার নটরাজ দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যান এবং তাঞ্জাবুর জেলার চিদাম্বরমের পাশে মেলক্কাডম্বুরে অমৃতঘটেশ্বর মন্দিরে বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলারসিক শিল্পপ্রেমী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলার নৃত্যের এই মাধুর্যপূর্ণ ভঙ্গিমাটি দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ুক, তাই তিনি চিদাম্বরমের নটরাজ মন্দিরের নিকটবর্তী স্থানে বিগ্রহটি স্থাপন করেন। এর দ্বারা বাংলার নটরাজের নৃত্যভঙ্গিমার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের নৃত্যভঙ্গিমার অপূর্ব মেলবন্ধন হয়।[১] যার ফলে বাংলার ধর্ম, দর্শন, শিল্প, ললিতকলা, নৃত্য, সাহিত্য সমস্ত কিছুর ব্যাপক প্রভাব পড়ে তামিলনাড়ু রাজ্যের শিল্পে।[১] ঠিক এরকমই প্রভাব দেখা যায় অন্ধ্রপ্রদেশে। ত্রয়োদশ শতকে কাকতীয় রাজবংশের রাজগুরু ছিলেন বাঙালি আচার্য বিশ্বেশ্বর শম্ভু শিবাচার্য। কাকতীয় রাজা গণপতি তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ গাত্রের লেখমালায় নিজেকে বিশ্বেশ্বর পুত্র বলে চিহ্নিত করে গেছেন। শিবাচার্য কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরে শিবমন্দির, শৈবমঠ ও অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছাত্রদের বেদ, সাহিত্য এবং আগমশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য আটজন অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ছাত্রদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিকিৎসক, হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবালয় মন্দিরে দশজন নর্তকী, আটজন বাদ্যকর এবং মঠ ও অন্নসত্রে একজন কাশ্মীরদেশীয় গায়ক, চৌদ্দজন গায়িকা, ছ'জন নর্তকী, স্বর্ণকার, তাম্রকার, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, বাস্তুকার, স্থপতি এবং সূক্ষ্মশিল্পকর্মে দক্ষ এরকম শিল্পীদের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করেন। নিজ অধিকারভুক্ত সীমানার বাইরেও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে বিশ্বেশ্বর মঠ, অন্নসত্র ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। 'বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ' নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি। দক্ষিণ প্রবাসী এই বঙ্গসন্তানের অপ্রতিহত প্রভাব একদিকে যেমন তাঁকে রাজগুরুর পদে অধিষ্ঠিত করেছিল অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃতি প্রেমী দক্ষিণ ভারতে প্রকৃত মানবতাবাদী, বাঙালির জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠায় এবং শৈবধর্ম প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।[২]

১। *Eastern Indian Contact with Tamil Nad,* R. Nagaswamy, Journal of Bengal Art, Vol. 3, ICSBA, 1998, Pg. 46.

২। সময় অসময় (পাক্ষিক), ১-১৫ জুলাই, ২০০৩, পৃ: ৭।

গৌড়ীয় নৃত্যের সংগীত

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমাবেশকে সংগীত বলে। অতএব গৌড়ীয় নৃত্যের আলোচনায় গীত ও বাদ্যের এক বিরাট ভূমিকা আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের মত গৌড়ীয় নৃত্যের বিকাশও ধর্মভিত্তিক ও দেবতাকেন্দ্রিক। অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই এর গীতও ধর্মাশ্রিত। কীর্তন ভাবসংগীত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধগীত গৌড়ীয় নৃত্যের আত্মার সঙ্গে অবিমিশ্রভাবে মিশে গেছে।

গৌড়ীয় নৃত্যের মূল আধারই কীর্তনাঙ্গ। এছাড়া ভাবসংগীতগুলো ধ্রুপদাঙ্গের। অবশ্য ধ্রুপদের বীজও লুকিয়ে আছে কীর্তনের মধ্যেই। নাট্যশাস্ত্রে যে বৃন্দগানের উল্লেখ পাওয়া যায়, সাংগঠনিক বিশ্লেষণে কীর্তনের দলও ঠিক তাই। বৃন্দগানে মুখ্য গায়ন, সমগায়ন, মার্দ্দঙ্গিক ইত্যাদি যে ভাষা আছে ঠিক তার বাংলা পরিভাষা মূলগায়ন, দোহার এবং বায়ান কীর্তনে প্রচলিত। এলা প্রবন্ধের যে রূপটির উল্লেখ শার্ঙ্গদেব করেছেন তার সঙ্গে কীর্তনের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সংগীত রত্নাকরে সঙ্গীতের স্বরূপভিত্তিক ভারতভূমিকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে—লাট, কর্ণাট, দ্রাবিড়, অন্ধ্র ও গৌড়। প্রতিটি অঞ্চলেই এলা প্রবন্ধ প্রচলিত। তার মধ্যে গৌড় অর্থাৎ বাংলাদেশ তথা ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত এলাকে 'গৌড়েলা' বলা হয়েছে। ঐ এলায় গমক, অনুপ্রাস থাকবে এবং রসপ্রধান সঙ্গীত হবে। গমক অর্থাৎ বাষ্পাকুল কণ্ঠ নির্গত স্বরের অস্ফুট স্বরবিন্যাস, অনুপ্রাস অর্থাৎ কাব্যিক অলঙ্কার এবং রস এই তিনটিই কীর্তনে সর্বাধিক প্রয়োগ হয়। কীর্তনের প্রতিটি পদে মাধুর্যপূর্ণ শব্দ সমন্বয় এবং অনুপ্রাস বহুলতা, রসের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে প্রবন্ধের ছয়টি অঙ্গই কীর্তনে বর্তমান, কীর্তন মেদিনী জাতীয় প্রবন্ধ। কীর্তনগান উন্নততর প্রবন্ধগীতিরই একটি রূপ। জয়দেব বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম বলে গণ্য। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অর্থাৎ অষ্টপদী—এগুলো সবই প্রবন্ধগীতির অন্তর্গত।

গৌড়ীয় নৃত্যের গীতগুলিতে সংস্কৃত, প্রাচীন বাংলা, মৈথিলী, ব্রজবুলি ইত্যাদি ভাষা সমূহের প্রয়োগ হয়।

সংস্কৃত—জয়দেবের গীতগোবিন্দ, কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলা—চর্যাপদের গান, বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস, রায়শেখর, শশীশেখর, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনা, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি।

মৈথিলী—বিদ্যাপতি রচিত পদগুলি কীর্তনে ব্যবহৃত হয়।

ব্রজবুলি—বৈষ্ণব কবিদের সৃষ্ট এই ভাষায় রচিত সংগীত।

নাট্যশাস্ত্রের সময় থেকেই এই শাস্ত্রানুসারী নৃত্যপদ্ধতির বর্ণনা পাই। অর্থাৎ এই নৃত্যধারা প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন রাগরাগিনীর ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব গতিপ্রবাহে চলেছে। আঞ্চলিক রাগরাগিনীগুলি আজ স্বমহিমায় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে বিশেষ স্থান ক'রে নিয়েছে। 'মতঙ্গের বৃহদ্দেশী'তে (আনুমানিক খৃঃ ৫ম-৮ম শতক) গৌড় রাগের ব্যাখ্যা পাই, যেমন—গৌড়কৈশিকী, গৌড়পঞ্চমা। এই রাগরাগিনীগুলির সঙ্গে কিভাবে বিভিন্ন রসের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশিত হত তার বর্ণনা আছে।[১] রামপালের সময়ে বিভিন্ন রাগরাগিনীর চর্চার উল্লেখ পাই যথা—বঙ্গাল, তিরোতাধানেশ্রী, গডবা, গৌড়ী এবং বিশেষ ধরনের সংগীতের কথা জানতে পারি যা শুধু বাংলাতেই উদ্ভব—বাউল, গাম্ভীরা ইত্যাদি।[২] পাল-সেন যুগ বঙ্গ-সংস্কৃতির সুবর্ণময় যুগ। জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাগ রাগিনীর উল্লেখ পাই। ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে গীতের প্রচুর শাস্ত্র গ্রন্থ, রাগ-রাগিনী পাওয়া যায়। নারদ কৃত পঞ্চমসার সংহিতা, দামোদর সেন কৃত সংগীত দামোদর, পণ্ডিত শুভঙ্কর কৃত সংগীত দামোদর, নরহরি চক্রবর্ত্তী কৃত গীত চন্দ্রোদয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য শাস্ত্রগ্রন্থ।

প্রবন্ধ গীতি

গৌড়ীয় নৃত্যের সঙ্গে প্রবন্ধগীতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। প্রবন্ধগীতির আলোচনা নাট্যশাস্ত্র থেকে পাই। মধ্যযুগ প্রবন্ধগীতির গৌরবময় যুগ। কবি জয়দেবের অষ্টপদী প্রবন্ধগীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বঙ্গদেশের সংগীতচর্চায় প্রবন্ধগীতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। 'প্রবন্ধ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধ' অর্থাৎ সুন্দর রচনা।[৩] বিশেষ ভাবে আবদ্ধ অর্থাৎ বিশেষ নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ

১। *Brihaddesi of Sri Matanga Muni*-edited by Prem Lata Sharma, IGNCA, 1994, Pg. 105-107.

২। Music of Eastern India—Sukumar Ray, Chap III. Pg. 69. K.L.Mukherjee 1973.

৩। শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্তন, কলাবতী দেবী ও দর্শনা ঝাবেরী, মণিপুরী নর্তনালয়। ১৯ পৃঃ ৭৪।

এই অর্থে প্রবন্ধ কথাটি ব্যবহৃত।[১] নরহরি চক্রবর্ত্তীর গীতচন্দ্রোদয় থেকে পাই প্রবন্ধে ৬টি অঙ্গ—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল।

স্বর—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি স্বরের প্রয়োগ। অর্থাৎ গীতপ্রবন্ধ স্বরযুক্ত হবে।

বিরুদ—কবির নাম, গুণ বা স্তুতি থাকে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে গীত প্রবন্ধে গুণবাচক বা স্তুতিবাচক শব্দের ব্যবহার থাকবে।

পদ—পদ বলতে গানের বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।

তেন বা তেনক—মঙ্গলবাচক শব্দ। প্রবন্ধগীতিতে মঙ্গলসূচক শব্দের ব্যবহার থাকবে।

পাট—পাট বলতে বোঝায় আনদ্ধ বাদ্যের বোল। আদি আনদ্ধ বাদ্যরূপে কথিত পটহ্ থেকে পাট কথাটি এসেছে। পাট অঙ্গ যোজনার ফলে আনদ্ধ বাদ্যের বোল প্রবন্ধে প্রযুক্ত হয়।

তাল—প্রবন্ধগীতি অনিবদ্ধ নয় তাই এটি তাল সংপৃক্ত হয়।

প্রবন্ধের জাতি পাঁচ প্রকার—মেদিনী, আনন্দিনী, দীপনী, পাবনী ও তারাবলী।[২]

মেদিনী—ছয় অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধগীতির নাম মেদিনী।

আনন্দিনী—পাঁচ অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধগীতির নাম আনন্দিনী।

দীপনী—চার অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধগীতির নাম দীপনী।

ভাবনী বা পাবনী—তিন অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধগীতির নাম ভাবনী বা পাবনী।

তারাবলী—দুই অঙ্গের প্রবন্ধের নাম তারাবলী।

নিম্নোক্ত উদাহরণটি নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত গীত চন্দ্রোদয়ে উল্লিখিত প্রবন্ধগীতি এটি মেদিনী জাতি অর্থাৎ ষড়ঙ্গ যুক্ত-

জয় জয় গোবর্দ্ধন ধর মাধব
গোকুল গোপসুতা ধৃতি মোচন।
কালিয়া বিষধর দর্প বিমর্দক
কেশব কৃষ্ণ কমলদল লোচন।।
লোলালক দলিতাঞ্জন নিভ
জনরঞ্জন ঘন চন্দন পরিমণ্ডিত।

১। সংগীত কোষ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃঃ ৪৪৮-৪৫০

২। গীতচন্দ্রোদয়, শ্রী নরহরি চক্রবর্ত্তী, মণিপুর ষ্টেট কলা একাডেমী, অনুবাদ—সুরচন্দ্র শর্মা, পৃঃ ২৪।

পীতাংশুক - ধৃত ললিত কৃশোদর
মধুরানন নব তাণ্ডব পণ্ডিত।।
শ্রীবৃষভানুতনয়ী - মুখ - চন্দ্র - চকোর
সুন্দর মুক সাগর।
পীনবক্ষ শিখিপঙ্খ বিভূষণ
গোচারণরত রসিক সুনাগর
ঝিকি ঝিকি ঝিকি ঝিকি
ঝাঙ্কৃণ কৃণতক থোঙ্গ থোঙ্গ
তক থই থই থই থই।
করুণাঙ্কুরু নরহরি পতিতে
স্ স্ স্ রিগিরি তেন্নাতি
অই অ অই অই ।।

কৃষ্ণ বিষয়—**পদ**। জয় জয় গোবর্দ্ধন ধর মাধব ইত্যাদি

কালিয় বিষধর দর্প বিমর্দক—**বিরুদ**। এছাড়া কবি নরহরির নামও আছে, তাই এটি **বিরুদ** তেন্নাতি....তি — এটি **তেনক** অঙ্গ।

স স স রি অংশ **স্বর** অঙ্গের উদাহরণ। ঝিকি ঝিকি অংশটি **পাট** অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। গানটি পঞ্চতাল গুচ্ছে গাওয়া হয়, কাজেই এটি **তাল** অঙ্গ।[১]

তাল

তালতত্ত্ব সংগীত শাস্ত্রের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। অতি প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রকার থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত তালের প্রাথমিক পরিচয় হল যে —"তাল সংগীতে নিয়োজিত সময়ের পরিমাপক একক স্বরূপ।"[২]
হরি নায়কে পাই—

"সময়স্য সমত্বেন ব্যঞ্জক ত্বেন চাধিকম্।
তালয়ত্যেষ সঙ্গীতং যত্তালো নিগদ্যতে।[৩]

১। গীতচন্দ্রোদয়, শ্রী নরহরি চক্রবর্ত্তী, মণিপুর ষ্টেট কলা একাডেমী, অনুবাদ—সুরচন্দ্র শর্মা, পৃঃ ৩৩।
২। তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, ডঃ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৬, পৃঃ ১১৮।
৩। গীতচন্দ্রোদয়—নরহরি চক্রবর্ত্তী, সুরচন্দ্র শর্মা সম্পাদিত, মণিপুর ষ্টেট কলা একাডেমী, তালার্ণব অধ্যায়।

গৌড়ীয় নৃত্যে তাল বর্ণকাল দ্বারা পরিমেয়। কর্ণাটকী সংগীতে একে অক্ষরকাল এবং হিন্দুস্থানী সংগীতে একে মাত্রা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণকালসমূহে বিশেষ বিশেষ সংখ্যাবদ্ধতায় ভিন্ন তাল হয়, গৌড়ীয় নৃত্যে চার বর্ণ কাল থেকে শুরু করে আটষট্টি বর্ণকাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন তাল আছে। যেমন চার বর্ণ কালে আদি তাল বা রাস তাল, ছয় বর্ণকালে বা বারো বর্ণকালে লোফা যার অপর প্রচলিত নাম জপতাল। আট বর্ণকালের তাল চঞ্চুপুট বা কার্ফা ইত্যাদি। গৌড়ীয় নৃত্যে আদিতাল বা রাসতালকে মূল হিসেবে ধরা হয়েছে।

অঙ্গ—তালের অবয়বকে অঙ্গ বলে। এটি আট প্রকার।

ক) অঙ্গপ্রাণ—

নাম	বর্ণকাল	চিহ্ন
অনুদ্রুত	১	∪
দ্রুত	২	O
দ্রুতবিরাম	৩	Ò
লঘু	৪	।
লঘুবিরাম	৫	Y
গুরু	৮	S
প্লুত	১২	S
কাকপদ	১৬	X

খ) জাতিপ্রাণ —

একাকী	—	১ বর্ণকাল
পক্ষিণী	—	২ বর্ণকাল
ত্র্যশ্র	—	৩ বর্ণকাল
চতুরশ্র	—	৪ বর্ণকাল
খণ্ড	—	৫ বর্ণকাল
ঋতু	—	৬ বর্ণকাল
মিশ্র	—	৭ বর্ণকাল
সংকীর্ণ	—	৯ বর্ণকাল

গ) তালের গতিকে **লয়** বলে। লয় তিন প্রকার দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত।

ঘ) লয় প্রবর্তনের নিয়মে **যতি** পাঁচ প্রকার—
সমা, স্রোতগতা, মৃদঙ্গা, পিপীলিকা, গোপুচ্ছা।[১]

ঙ) প্রাচীনকাল থেকেই তালের বর্ণনাকালে গতি সম্পর্কে অবহিত করবার জন্য হস্ত এবং অঙ্গুলি সঞ্চালনের দ্বারা কখনও সশব্দ কখনও নিঃশব্দ যে সব ক্রিয়া ব্যবহৃত হত সেই পদ্ধতির বেশ কিছু ব্যবহার কীর্তনাঙ্গীয় তাল পদ্ধতিতে দেখা যায়, যা গৌড়ীয় নৃত্যের মূল আধার। কীর্তনাঙ্গ পদ্ধতিতে সশব্দ ক্রিয়া একটি এবং তাকে বলা হয় তাল। তালির মাধ্যমে তালের রীতি বোঝাবার রীতি সুপ্রাচীন। দ্বাদশ শতকের কবি গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতীতে পাই "কৃত হসিত হস্ততালং"। শ্রী চৈতন্যদেব নিজেও কীর্তনবিধি প্রচার নিমিত্তে হাতে তাল দিতেন। চৈতন্য ভাগবতে উক্ত আছে-"দিশা দেখান প্রভু হাতে তালি দিয়া"—। নিঃশব্দ ক্রিয়াগুলির মধ্যে ফাঁক একপ্রকারের ক্রিয়া, হিন্দুস্থানী পদ্ধতির 'খালির' এবং কর্ণাটকী পদ্ধতির 'বিসর্জিতম'এর মত। নিঃশব্দ ক্রিয়ার অনেকগুলি পদ বা Term আছে। যেমন—'ফাঁক', 'কাল', 'কোশী' বা 'কুশী'।

কাল —হস্ত যে অবস্থাতেই থাকুক তার থেকে ঠিক উল্লম্বভাবে নয়-দশ ইঞ্চি পরিমাণ উপরের দিকে উঠিয়ে যে ক্রিয়া দেখানো হয় তাকেই বলে কাল।

কোশী বা কুশী—'কোশ' শব্দটির গ্রামীণ প্রয়োগে দেহের 'কোল' অংশ বোঝায় এবং কোশী শব্দটিও তাই কোলের দিকে হাতটিকে সরিয়ে নেওয়া উভয়কেই বোঝায়। 'কোশী' পরিভাষাটি এতই পরিচিত যে এর ভিত্তিতে তালের নামকরণ করা হয়েছে, যেমন—'দশকোশী'। 'কোশী' ক্রিয়াটি প্রাচীন দেশী ক্রিয়া 'বিসর্জিতা' ও 'বিক্ষিপ্তা'-রই প্রয়োগ বিশেষ। এ ক্রিয়াটির প্রদর্শনরীতি অন্য কোনও তাল পদ্ধতিতে দেখা যায় না।[২]

চ) তালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

শুদ্ধ—একতালের এক আবর্তন।

১। গীতচন্দ্রোদয়— শ্রী নরহরি চক্রবর্ত্তী, সুরচান্দ শর্মা সম্পাদিত, মণিপুর ষ্টেট কলা একাডেমী, তালার্ণব অধ্যায়।

২। তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, ডঃ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৬, পৃঃ ১২২-১২৩।

সালগ—দুই তালের সংযোগে এক আবর্তন।

সংকীর্ণ—দুই-এর অধিক তালের সংযোগে এক আবর্তন।

সালগ এবং সংকীর্ণকে 'তাল ফেরতা' বলা হয়।

ছ) কোনও তালের মূল বর্ণকালকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ইত্যাদি নানা গুণাকারে আবর্তিত করে নানা ছন্দে বোল রচনা করা হয়। একে **অলংকার** বলা হয়।

জ) গৌড়ীয় নৃত্যের তালে সাধারণত লঘু গুরু ভেদ আছে। যেমন—জপতাল (এক তালি) ১২ বর্ণকাল।

জা গে জা জা ঘি না। তা খে তা তা খি না

এখানে 'জা'—শব্দটি গুরুর দ্যোতক এবং 'তা' —শব্দটি লঘুর দ্যোতক।

ঝ) **প্রবন্ধমালা বা নামমালা**—বিভিন্ন কবিতা বা গানের কথাকে মৃদঙ্গের বোলে ছন্দবদ্ধ করে ফুটিয়ে তোলা, যা প্রাচীনকাল থেকে বাংলার সংগীত ও নৃত্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য নৃত্যধারাতেও এটি গৃহীত হয়েছে যেমন—মণিপুরী ও কত্থক।

ঞ) **তালপ্রবন্ধ**—দুই বা ততোধিক তালের সংযোজনে রচিত বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ রচনা যা বহু আবর্তনে অলঙ্কৃত হয়।

ট) গৌড়ীয় নৃত্যের সংগীতে **গ্রহপ্রাণ** (অর্থাৎ তাল কোথা থেকে গ্রহণ করছি) তিনরকম।

সম—গানের, নৃত্যের ও বাদ্যযন্ত্রের তাল এক সঙ্গে প্রথম থেকে শুরু। সংস্কৃতে একে বলে সমপাণি বা তাল।

অতীত—গান বা নৃত্য আগে শুরু হবে তারপর তাল পড়বে। সংস্কৃতে একে বলে অবপাণি বা বিতাল।

অনাগত—তাল আগে পড়বে ও গান বা নৃত্য পরে শুরু হবে। সংস্কৃতে একে বলে অনুগত। অতীত এবং অনাগত উভয়েই বিষম।[১]

১। শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকর, নরহরি চক্রবর্ত্তী, গৌড়ীয় মিশন, ১৯৮৭,পৃঃ ২৬৭-২৬৮।

ঠ) গৌড়ীয় নৃত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সমাপ্তি বৈচিত্র্য।

এটি তিনপ্রকার—মান, বর্দ্ধমান, হীয়মান। সংগীত শাস্ত্রে বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়াকে মান বলে। তালের ক্ষেত্রে **'মান'** তালের সমাপ্তিজ্ঞাপক। যখন মান ধ্রুবপদে দ্বিতীয় কলায় পড়ে তখন সেই তালের তালজ্ঞ সম্মত **'বর্ধমান আবর্ত'** সংজ্ঞা হয়। যখন মান ধ্রুবপদের শেষ কলায় পড়ে তখন মণীষিগণ একে **'হীয়মান'** আবর্ত বলেন।

ড) হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে মূল যে বোলটি বাজে তাকে বলে 'ঠেকা'। এটিকে গৌড়ীয় নৃত্যের পরিভাষায় বলে **'লওয়া'**।

গৌড়বঙ্গে প্রচলিত ১০১টি তাল ঃ—

নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত 'গীতচন্দ্রোদয়' অনুসারে—

১। চচ্চৎপুট	২। চাচপুট	৩। ষট্‌পিতাপুত্র
৪। সম্পক্কেষ্টক	৫। উদঘট্ট	৬। আদিতাল
৭। দর্পণ	৮। চর্চ্চরী	৯। সিংহলীল
১০। কন্দর্প	১১। সিংহবিক্রম	১২। শ্রীরঙ্গ
১৩। রঙ্গলীল	১৪। রঙ্গতাল	১৫। পরিক্রম
১৬। প্রত্যঙ্গ	১৭। গজলীল	১৮। ত্রিভিন্ন
১৯। বীরবিক্রম	২০। হংসলীল	২১। বর্ণনীল
২২। রাজচূড়ামণি	২৩। রঙ্গদ্যোতক	২৪। রাজতাল
২৫। সিংহবিক্রীড়িত	২৬। বনমালা	২৭। বর্ণতাল
২৮। মিশ্রতাল	২৯। রঙ্গদীপক	৩০। হংসনাদ
৩১। সিংহনাদ	৩২। মল্লিকামোদ	৩৩। শরভলীল
৩৪। রঙ্গাভরণ	৩৫। তুরগলীল	৩৬। সিংহনন্দন
৩৭। জয়শ্রী	৩৮। বিজয়ানন্দ	৩৯। প্রতিতাল
৪০। দ্বিতীয়ক	৪১। মকরন্দ	৪২। কীর্তিতাল
৪৩। বিজয়	৪৪। জয়মঙ্গল	৪৫। রাজবিদ্যাধর
৪৬। মণ্ঠ	৪৭। জয়তাল	৪৮। সুদুর্বল
৪৯। নিঃসারুক	৫০। ক্রীড়া	৫১। ত্রিভঙ্গী
৫২। কোকিলপ্রিয়	৫৩। শ্রীকান্ত	৫৪। বিন্দুমালী
৫৫। সমতাল	৫৬। নন্দন	৫৭। উদীক্ষণ

৫৮। মণ্ঠিকা	৫৯। ঢেঙ্কিকা	৬০। বর্ণমণ্ঠিকা
৬১। অভিনন্দ	৬২। অন্তরক্রীড়া	৬৩। লঘুতাল
৬৪। দীপক	৬৫। অনঙ্গতাল	৬৬। বিষম
৬৭। নান্দী	৬৮। কুন্দ	৬৯। মুকুন্দ
৭০। একতালী	৭১। কঙ্কাল	৭২। চতুস্তাল
৭৩। খংখুড়ী	৭৪। অভঙ্গ	৭৫। রাজঝঙ্কার
৭৬। লঘুশেখর	৭৭। প্রতাপশেখর	৭৬। গজঝম্প
৭৯। চতুর্মুখ	৮০। ঝঙ্কার	৮১। প্রতিমণ্ঠ
৮২। তৃতীয়ক	৮৩। বসন্ত	৮৪। ললিত
৮৫। শিবতাল	৮৬। করশাখা	৮৭। ষট্‌তাল
৮৮। বর্দ্ধন	৮৯। বর্দ্ধক	৯০। রাজনারায়ণ
৯১। মদন	৯২। পার্বতীলোচন	৯৩। সারঙ্গ
৯৪। শ্রীনন্দীবর্দ্ধন	৯৫। লীলা	৯৬। বিলোকিত
৯৭। ললিতপ্রিয়	৯৮। জনক	৯৯। লক্ষ্মীশো
১০০। রাগবর্দ্ধন	১০১। উৎসব।	

বর্তমানে প্রচলিত কিছু তালের নাম

১)	ছোট লোফা তাল	—	৬ বর্ণকাল।
২)	আদিতাল বা রাসতাল	—	৪ বর্ণকাল।
৩)	বৃহৎ লোফা তাল	—	৬ বর্ণকাল।
৪)	পঞ্চতাল	—	৬ বর্ণকাল।
৫)	ঝুবর্ঝটি তাল	—	৬ বর্ণকাল।
৬)	চঞ্চুপুট তাল	—	৮ বর্ণকাল।
৭)	ছোট ধমালি	—	৮ বর্ণকাল।
৮)	মধ্যম ধমালি	—	৮ বর্ণকাল।
৯)	বড় ধমালি	—	১৬ বর্ণকাল।
১০)	লোফা দাসপাহিরা	—	১৬ বর্ণকাল।
১১)	ছোট দাসপাহিরা	—	৮ বর্ণকাল।
১২)	মধ্যম দাসপাহিরা	—	১৬ বর্ণকাল।
১৩)	আড়া দাসপাহিরা ও দোজ	—	১২ বর্ণকাল।

১৪) একতাল	—	১৬ বর্ণকাল।
১৫) ছোট দোঠুকী	—	৭ বর্ণকাল।
১৬) ঝাঁপতাল	—	১০ বর্ণকাল।
১৭) ছোট তেওড়া	—	৭ বর্ণকাল।
১৮) বড় তিওট	—	২৮ বর্ণকাল।
১৯) বড় রূপক	—	৪৮ বর্ণকাল।
২০) ছোট দশকুসীতাল	—	১৪ বর্ণকাল।
২১) ছোট বীরবিক্রম তাল	—	১৮ বর্ণকাল।
২২) ছোট শশিশেখর তাল	—	২২ বর্ণকাল।
২৩) মধ্য বিষমপঞ্চ তাল	—	৩২ বর্ণকাল।
২৪) মধ্য ইন্দ্রভাষ তাল	—	৫২ বর্ণকাল।
২৫) মন্টক তাল	—	৪৮ বর্ণকাল।
২৬) মধ্যম মদনদোলা তাল	—	৪৪ বর্ণকাল।

এগুলি ছাড়াও আরও অনেক প্রাচীন তাল আছে।

গৌড়ীয় নৃত্যে অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি তাল ঃ

তাললিপিতে ব্যবহৃত চিহ্ন সমূহ

।	=	১টি মাত্রার চিহ্ন তাল লিপির উপরে
∪	=	অর্দ্ধ মাত্রার চিহ্ন তাল লিপির উপরে
¡	=	তালের বিভাগ তাল লিপির মধ্যে
+	=	সমের চিহ্ন তালের প্রথমে ব্যবহৃত
২, ৩, ৪,	=	তাল লিপির উপরে সংখ্যাগুলি আঘাতের চিহ্ন
o	=	ফাঁকের চিহ্ন, যেখানে কোনও আঘাত পড়বে না। দুটি তালের মাঝে একাধিক ফাঁক থাকলে তাকে কোষ বলে। এতে হাতকে সামনের দিকে পরে কোলের দিকে আবার সামনের দিকে চালনা করা হয়।
•	=	কালের চিহ্ন। তাল ও ফাঁকের মাঝে এই চিহ্নটি হাতটি উপরে তোলার নির্দেশ করে।

লোফাতাল

রূপ :- ১টি আঘাত ও একটি ফাঁক । ছন্দ = ৩ + ৩ = ৬ মাত্রা বা বর্ণকাল

লওয়া (গুরু)

+	।	.		০	।	.
ঝা	গে	দাঁ	।	দাঁ	ঘি	নি

লওয়া (লঘু)

+	।	.		০	।	.
তা	খি	তা	।	তা	খেটা	তিনি

ঝুর্ঝাটি তাল

এই তালটি লোফা সদৃশ তবে বোলের গুরু লঘুভেদে এর দুটি আঘাত ও দুটি ফাঁক ছন্দ = ৩ । ৩ । ৩ । ৩ । = ১২ মাত্রা বা বর্ণকাল

লওয়া (গুরু)

+	।	.		০	।	.		২	।	.		০	।	.
জা	জা	ঝি	।	না	ঝি	নি	।	জা	ঝি	নি	।	ঝে	না	ঙ

লওয়া (লঘু)

+	।	.		০	।	.		২	।	.		০	।	.
তা	আক্	থি	।	না	থি	নি	।	তা	থি	নি	।	থেই	গুর	গুর

এই তালটির গতি চঞ্চল।

তেওড়া তাল

রূপ :- ৩টি আঘাত ও ১টি ফাঁক। ছন্দ = ৩ । ২ । ২ = ৭ মাত্রা বা বর্ণকাল

লওয়া (গুরু)

+	০	.		২	.		৩	.
ঝা	ঝিন্	না	।	গুরুগুরু	ঝিনি	।	ঝিন্	না

লওয়া (লঘু)

+	০	.		২	.		৩	.	
তা	থিন্	না	।	তেটে	তেটে	।	খেটে	তাক	।।

ছোট দাসপাহিরা তাল

রূপ :- ৮ মাত্রা ২টি আঘাত ও ৬টি কোশ। ছন্দ – ৪।৪ = ৮ মাত্রা

লওয়া

০ ০ ০ ২ ০ ০ ০
\+ । । । । । । ।
থেনা তাধে নেদা গেদা । ধেন তা তেটে তা ।।

চঞ্চুপুট তাল

রূপ :- ২টি আঘাত ও দুটি ফাঁক। ছন্দ = ২।২।২।২ = ৮ মাত্রা

লওয়া

০
\+ । । ∪ ∪
জা জা আঘ্‌বি । নিদা ঘি গুরগুর ।।
২ ০
। । । ∪ ∪
জা জা আঘবি । নিতা খি গুরগুর ।।

ললিত প্যারী

রূপ :- ৩টি আঘাত ও একটি ফাঁক। ছন্দ = ৪।২।২ = ৮ মাত্রা

লওয়া (গুরু)

. ০ . . .
\+ । । । ২ । ৩ ।
ঝা দাঘি নেদা গেদা । ঝা তেরে খেটা । ঝিন্‌ না ।।

লওয়া (লঘু)

. ০ . . .
\+ । । । ২ । ৩ ।
তা গুরু গুরু তেতা খেটা । তাৎ তাখি । তা খি খি

বিষম সঙ্কট

রূপ :- ৩টি আঘাত ও দুটি ফাঁক। ছন্দ = ৩।৪।২ = ৯ মাত্রা

লওয়া (গুরু)

o . o . .
+ । । ২ ∪ ∪ । । ৩ ।
ঝা দাঘি তেটে । ঝা - ঝি নাক ঝিনি । ঝা তেরেখেটা

লওয়া (লঘু)

o . o . .
+ । । ২ ∪ ∪ । । ৩ ।
তাৎ তাখি তেটে । তা - থি নাক থিনি । তা তেরেখেটা

ঝাঁপতাল

রূপ :- ৩টি আঘাত ও একটি ফাঁক। ছন্দ = ২।৩।২।৩ = ১০ মাত্রা

লওয়া (গুরু)

. . o . .
+ । ২ । । । । ৩ । ।
ঝা গুরুগুরু । ঝা দাঘি তেটে । ঝা ঝা । দিগি দাঘি তেটে

লওয়া (লঘু)

. o .
+ । ২ । । । । ৩ । ।
তা গুরুগুরু । তাৎ তাখি তেটে । তা খেটা । তাৎ তা খেটা

দোজ তাল

রূপ :- ৩টি আঘাত ৯টি কোষ। ছন্দ = ৪।৪।৪ = ১২ মাত্রা

লওয়া

o o o o o o
+ । । । ২ । । ।
ঝিনি জাঝি নিতা খেটা । তা খুরখুরখুরখুর তিনি তাখি ।
o o o
৩ । । ।
তা তা খিখি গুরগুরগুরগুর ।।

দোঠুকী তাল

রূপ :- ২টি আঘাত ও দুটি ফাঁক। ছন্দ = ৩। ৪। ৩। ৪ = ১৪ মাত্রা

লওয়া

```
        .           .      o
+   |   |  ২   |   |   |      |      |      |
ধি  — ইন্। ধি  ইন্  তা  —   ।  তা    খুরখুর  খুরখুর ।

|   |   |   |
তি  ইন্  তা  —   ।।
```

ছোটবীর বিক্রম

রূপ :- ৫টি আঘাত ৪টি ফাঁক। ছন্দ = ৪। ৪। ৪। ২। ৪ = ১৮ মাত্রা

লওয়া (গুরু)

```
+        o                  o                 o
| ∪  ∪   |   |     ২  ∪  ∪   |   |     ৩ ∪ ∪   |   |
ঝা -  ঘি  নাক ধিনি ।  ঝা  -  ঘি  নাক ধিনি ।  ঝা  -  ঘ  নাক ধিনি

                    o
৪    |       ৫   |    |    |
ঝাগুরগুর ।  ঝা  তেই  তিনি  তিনি  ।
```

লওয়া (লঘু)

```
+        o                  o                 o
| ∪  ∪   |   |     ২  ∪  ∪   |   |     ৩ ∪ ∪   |   |
তা -  খি  নাক থিনি ।  তা  -  খি  নাক থিনি ।  তা  -  খি  নাক থিনি

                       o
৪    |         ৫    |     |     |
ঝা গুরগুর  ।   তা   ত্বা   খি   গুরগুর
```

ব্রহ্মতাল

রূপ - আঘাত ১০টি, ফাঁক ৪টি। ছন্দ = ২। ২। ৪। ২। ৬। ২ । ৮। ২ = ২৮ মাত্রা

লওয়া

							৩				০	
+	।	০	।		২	।	।	।			।	।
ধা	গে	দিন	তা	।	তেটে	ধা	তেটে	ধা	।	দেন্	তা	।

৪	।	৫	।	৬	।		০	।	
ধা	ধেৎ	ধাগে	তেটে	গদি	ঘেনে	।	তা	ধেৎ	।

৭	।	৮	।	৯	।	১০	।		।	।	
ঘেঘে	তেটে	গদি	ঘেনে	তাগে	তেটে	গদি	ঘেনে	।	তা	ধেৎ	।।

বাদ্যযন্ত্র

প্রথানুসারে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় চারপ্রকার আতোদ্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বাংলা সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থে, বাংলার নৃত্যশাস্ত্র গ্রন্থে, ভাস্কর্যে, চিত্র শিল্পে এবং বর্তমানের বিবিধ প্রচলিত নৃত্যে এই যন্ত্রগুলির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়—

ক) আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ঃ—চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র

১) পদ্মাপুরাণের পাখোয়াজ (পাকাজ) বা ধবল—মৃত্তিকা নির্মিত বর্তমানে কাষ্ঠ নির্মিত হচ্ছে। মধ্য স্ফীত এবং ফাঁকা, এর দুটি মুখই চর্মাচ্ছাদিত। এটি 'পাকাজ' নামেও পরিচিত।

২) শ্রীখোল বা মৃদঙ্গ—মৃত্তিকা নির্মিত। আজকাল কাষ্ঠ বা ধাতু নির্মিতও দেখা যায়। ব্যবহারিক প্রয়োগের সুবিধার্থে বাঁয়ার মুখটি ডাইনা অপেক্ষা বড়। কঙ্কর তুষার রহিত নির্দোষ মাটি দ্বারা নির্মিত মৃদঙ্গকে 'নির্দোষ মৃদঙ্গম' বলা হয়।


গৌড়ীয় নৃত্যে ব্যবহৃত কিছু বাদ্যযন্ত্র

৩) বাংলা ঢোল—বৃহৎ আকারের কাঠের তৈরী উভয় মুখ চর্মাচ্ছাদিত। একদিকে হাত দিয়ে ও অন্যদিকে বিশেষ এক ধরনের ছোট কাঠির সাহায্যে বাজান হয়।

৪) ঢাক— এটি বৃহদাকারের বাংলা ঢোলের ন্যায়, দুইটি কাঠি দ্বারা বাজানো হয়। মঙ্গলাচরণ, পালানৃত্য ও যুদ্ধনৃত্যে ব্যবহৃত হয়।

৫) দুন্দুভি বা ধামসা—এটিকে ভূমি দুন্দুভি বা আনকদুন্দুভি নামেও অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের রস সৃষ্টিতে এটি ব্যবহৃত হয়, বিশেষত রৌদ্র, বীর, ভয়ানক রস।

গৌড়ীয় নৃত্যে মূল আনদ্ধযন্ত্র পদ্মাপুরাণের পাখোয়াজ (পাকাজ) বা ধবল ও শ্রীখোল। এছাড়া অন্য আনদ্ধযন্ত্রগুলি বিশেষ বিশেষ সময়, বিশেষ বিশেষ চরিত্রে, পরিবেশ ও রসসৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।

খ) **ঘন বাদ্যযন্ত্র**—ধাতব নির্মিত, বিশেষত কাংস্য নির্মিত।

১) মন্দিরা বা মঞ্জিরা—ছোট গোলাকার বা বর্তুলাকার। এটি ধরবার জন্য লাল সরু দড়ির গুচ্ছ গ্রথিত থাকে।

২) করতাল বা ঝাঁঝ—মন্দিরার মতই বড় আকৃতির।

গ) **সুষির বাদ্যযন্ত্র**—ছিদ্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, বাতাসের সাহায্যে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়।

১) বাঁশী—এটি বাঁশ দিয়ে তৈরী। অনেক ধরনের বাঁশী আছে, তার মধ্যে আড় বাঁশীই অধিক ব্যবহৃত হয়।

২) শঙ্খ।

৩) শিঙা বা রামাশিঙা—প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হত। বিশেষত বীর রস ও রৌদ্ররসের সময়।

৪) হারমোনিয়াম—বর্তমানের সহজলভ্য যন্ত্র।

৫) সানাই—সানাই বাদ্যযন্ত্রটি সুষির শ্রেণীভুক্ত। আকারে অনেকটা ধুতুরা ফুলের মত এবং দৈর্ঘ্য প্রায় একহস্ত পরিমিত। এই যন্ত্রের উপরিভাগ কাষ্ঠ এবং নিম্নদেশ পিতলাদি ধাতব দ্বারা নির্মিত এবং ভিতরের দিক ফাঁপা, স্বরক্ষেপণের জন্য ছিদ্র থাকে।

ঘ) **ততবাদ্য যন্ত্র**—তারের বাদ্যযন্ত্র।

১) বীণা—প্রাচীনকালে বিভিন্ন ধরনের বীণা ব্যবহৃত হত—সরস্বতী বীণা, নারদীয়, রুদ্র, কচ্ছপিকা, পিণাকী, কাত্যায়ণী, ব্রহ্ম ইত্যাদি। বর্তমানে বীণার ব্যবহার প্রায় অবলুপ্ত। উত্তরবঙ্গে এক ধরনের ছোট বীণা দেখা যায়। যার নাম 'বেণা'।

২) তানপুরা—সর্বভারতে প্রচলিত। এই যন্ত্রটি তুম্বুরী বীণা।

৩) বর্তমানে তারের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সেতার এবং ব্রজ্রাজ ব্যবহৃত হয় যা বীণারই এক বিবর্তিত রূপ।

৪) বেহালা ও সরোদ (দোতারা ও রবাবের বিবর্তিত রূপ)

ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প

বাংলার শাস্ত্রগ্রন্থ ও সাহিত্যের পাশাপাশি স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলার গৌরবময় নৃত্য ঐতিহ্যের সন্ধান পাই বাংলার ভাস্কর্যে, চিত্রশিল্পে ও লেখমালায়। এই শিল্পকলা অতীত বাংলার নৃত্যগীত ও বাদ্যের সুবর্ণযুগের সাক্ষী। নীরবভাস্কর্যগুলি অতীতের গতিশীল সঙ্গীতকলার সরব সাক্ষী। বর্তমানের নৃত্যশিল্পী গবেষকদের কাছে এই নীরবমাধ্যম বয়ে এনেছে বাংলার গৌরবময় নৃত্যের স্থানক, হস্তমুদ্রা, নৃত্যের দৃপ্তময় লাস্যাঙ্গের আবেদন, আবার তাণ্ডবযুক্ত বিভিন্ন সৌষ্ঠবপূর্ণ ভঙ্গিমা। এনে দিয়েছে তৎকালীন নৃত্যশিল্পীদের আহার্য অভিনয় অর্থাৎ বেশভূষা, অলঙ্করণ, কেশবিন্যাস; এছাড়া পাই একক, দ্বৈত ও সমবেত নৃত্যের ভাস্কর্য। অর্থাৎ ইতিহাসের বুকে বিধৃত এই স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্পগুলি গৌড়ীয় নৃত্যেরই গৌরবময় দৃষ্টান্তের উদাহরণ। যা চিরায়ত, সুন্দর। তাই গৌড়ীয় নৃত্যের গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তরের উপাদান হিসেবে, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের অবদান অপরিসীম। তুর্কী আক্রমণের পূর্বের বা সেই সময়কার যুগের প্রাসাদ, স্তূপ, মন্দির, বিহার প্রভৃতির কোনও চিহ্ন আজ একপ্রকার নেই বললেই চলে। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবরণ এবং প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনগুলি থেকে আলোচনা করলে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে তুর্কী আক্রমণের পূর্বে বাংলায় বিচিত্র কারুকার্যখচিত বহু হর্ম্য ও মন্দির এবং স্তূপ ও বিহার ছিল। কিন্তু এসবই প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রভূমিতে (আজকের উত্তরবঙ্গ) যেসব 'প্রাংশুপ্রাসাদ' মহাবিহার এবং কাঞ্চনখচিত হর্ম্য ও মন্দির দেখে বর্ণনা দিয়ে গেছেন তা আজ কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

এদেশে প্রস্তর সুলভ নয়, তাই গুপ্তযুগ, পালযুগ ও সেনযুগ ছাড়া অধিকাংশ মূর্তিই পোড়ামাটির এবং প্রাসাদ বা অট্টালিকা নির্মাণ কার্যে ইঁটের ব্যবহার ছিল। তবে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে মাকড়া পাথর (Laterite) ও বেলেপাথর (Sandstone) পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুই প্রকারের পাথরের মন্দির আছে।[১] আর্দ্রলোনা

১। বাংলা দেশের ইতিহাস, (মধ্যযুগ, ২য় খণ্ড), রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল, ১৩৮০ (বাংলা সন), পৃঃ ৪৪৫।

জলবায়ু, অতিরিক্ত বৃষ্টি, বর্ষা ও নদী প্লাবনের ফলে ইঁট পোড়ামাটির ক্ষয় খুব শীঘ্রই ঘটে। এছাড়া বৈদেশিক আক্রমণে এবং আমাদের উদাসীনতায় অনেক নষ্ট হয়েছে। প্রকৃতি ও মানুষ উভয় মিলেই বাংলার প্রাচীন শিল্প সম্পদ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। সামান্য কিছু কিছু ভগ্নপ্রায় মন্দির অতীত বাংলার ধ্রুপদী শিল্পের সাক্ষী হিসেবে বাংলার গ্রামে নগরে, মাঠে প্রান্তরে এবং ঝোপে ঝাড়ে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় এই ধ্বংসের হাত থেকে কোনওরকমে আত্মরক্ষা করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। পুরাতত্ত্ববিদ্ এবং অনুসন্ধিৎসুগণ দ্বারা আবিষ্কৃত—মন্দির, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, মূর্তি ও চিত্রকলা বাংলার অতীত শিল্প সম্পদের শেষ নিদর্শন। অথচ এই মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করেই অতীত বাংলার সংস্কৃতি সজীব ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণে অথবা নাটমন্দিরে নৃত্য-গীত-কথকতা-যাত্রা-ধর্মীয় আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতির ধারা বয়ে চলতো। কীর্তনের মাধ্যমে আপৎকালীন অস্পৃশ্যতা দূর হতো। প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এগুলির ভূমিকাই মুখ্য।

সঙ্গীত শিল্পচর্চা হত বলে বাংলার মন্দিরগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাধরনের নাটমন্দিরগুলি পাওয়া যায়। এই নাটমন্দিরগুলিতে নিয়মিত নৃত্য গীত অনুষ্ঠিত হত। যার ফলস্বরূপ আজও বাংলার মন্দিরে মন্দিরে বা মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় কীর্তন, মনসামঙ্গলপালা, গাজননৃত্য, গম্ভীরা, কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি হয়ে থাকে। যেমন, রাসের আগে মন্দিরে মন্দিরে বিশেষত বৈষ্ণব মন্দিরে কীর্তন নৃত্যসহ উপস্থাপনা, খোল নৃত্যের উপস্থাপনা, সোনাখালির পঞ্চানন শিব ঠাকুরের (মেদিনীপুর জেলা) চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজননৃত্যের অনুষ্ঠান, মালদহে মন্দিরে মন্দিরে গম্ভীরা ইত্যাদি এখনও হয়ে থাকে। অর্থাৎ নগরায়ন আধুনিকতার ফলে অতীতের মত শিল্পচর্চা মন্দিরে নেই ঠিকই, কিন্তু একদম হারিয়েও যায়নি। ছোট নাটমন্দিরের কক্ষযুক্ত অনেক মন্দির পাই, যেমন—দেওলিয়ার (বর্ধমান) মন্দির, বহুলাড়ার (বাঁকুড়া) সিদ্ধেশ্বর মন্দির, সুন্দরবনের জটার দেউলমন্দির (৯৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়ন্ত কর্তৃক নির্মিত), দেহারের (বাঁকুড়া) সরেশ্বর ও সল্লেশ্বর, গোকুলচাঁদের মন্দির (অতীতে জৈনমন্দির বলে অভিহিত হত)। মেদিনীপুর জেলার আজুড়িয়া গ্রামে চারণদের মন্দিরের রাসমঞ্চ, দাসপুরে একরত্ন গোপীনাথের মন্দিরের রাসমঞ্চ, পালদের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের রাসমঞ্চ, সোনাখালি পঞ্চানন শিবঠাকুরের মন্দিরের নাটমন্দির ইত্যাদি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত পাহাড়পুরের মন্দিরের উর্দ্ধভাগ প্রায় বিলুপ্ত। কিন্তু নিচের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা ভারতবর্ষের অন্যান্য মন্দির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং

মন্দিরটিতে নাটমন্দির ও মণ্ডপ আছে—যা অতীতকালের মন্দিরের সাক্ষ্য বয়ে চলেছে।[১] পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত স্থাপত্য। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এর অংশবিশেষ হিন্দু স্থাপত্যের অংশ নিয়ে নির্মিত হয়েছে।[২] একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে এখানে আদিনাথের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে তার নাম অনুসারে এর নাম 'আদিনা' হয়েছে। কথিত এখানে আদ্যানাথ শিবের বিশাল নাটমন্দির ছিল—(বর্তমানে একটি প্রকাণ্ড সভাগৃহ সেটিই অতীতে নাটমন্দির ছিল)। যদিও সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তবুও মসজিদের গায়ে নৃত্যগণেশ, এছাড়া নর্তকীর সুন্দর সুন্দর নৃত্যভঙ্গিমার অনেক ভাস্কর্য আছে। এই মসজিদটি পাথরের। এরকম পাথরের আরও একটি মসজিদ আছে যেটি ত্রিবেণীতে অবস্থিত জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ (ত্রয়োদশ শতক)। কথিত যে এটি সপ্তম শতকের বিষ্ণু-মন্দির ছিল। মসজিদটি বিরাট অঞ্চল জুড়ে। মসজিদের নিচের দিকে দশাবতার মূর্তি, নর্তকী মূর্তি, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি আছে।[৩] আরেকটি পাথরের মন্দির বর্ধমানের বরাকরের বেগুনীয়া মন্দির। সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নবম শতক থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত পাথরের মন্দিরগুলি তৈরী হয়েছিল। বর্তমানে তার চারটিই অক্ষত অবস্থায় টিঁকে আছে। আর আছে প্রচুর ধ্বংসপ্রাপ্ত নর্তক নর্তকীর মূর্তি। মন্দিরের আকৃতি-গঠন-অবস্থান দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় কতখানি অঞ্চল জুড়ে এই মন্দিরগুলি ছিল। অর্থাৎ বাংলায় পাথরের মন্দির ও হর্ম্যও যে অপ্রতুল ছিল না তার সাক্ষ্য মেলে।

দেবমন্দির দু'রকম ছিল—দেউল ও দেহারা। 'দেউল' অর্থাৎ 'দেবকুল'। দেবকুলে প্রধান মন্দির অর্থাৎ দেবস্থান ছাড়া ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির ইত্যাদি রাজকুলে বা রাজবাড়িতে যেমন থাকে তেমনি থাকত। গ্রামবাসীদের বার্ষিকপূজায় নৃত্যগীত অভিনয়ের আয়োজন থাকত। দেউলের নাটমন্দিরে অথবা দেহারার সামনে দেবতার মাহাত্ম্যসংগীত করা হত।[৪]

বাংলার এই মন্দিরগুলির গঠন প্রকৃতি অনুসারে প্রধানত তিনভাগে ভাগ

১। বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল, ১৩৬৪ (বাংলা সন), পৃঃ ২০৭-২০৮।

২। *Memories of Gaur & Pandua* by Khan Sahib M. Abid Ali Khan, Govt. of W.B., 1986, Pg. 117-119.

৩। শিল্প ও শিল্পী (২য় খণ্ড), কৃষ্ণলাল দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২, পৃঃ ৪৫।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীসুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, ইষ্টার্ণ পাব্লিশার্স, ১৯৭৮, পৃঃ ১৭-১৮।

করা যায়— রত্ন, চালা ও দালান। যে সমস্ত মন্দির সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে সেগুলির ভাস্কর্য অতীব সুন্দর। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত মন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্যে যুগসন্ধিক্ষণের ছাপ স্পষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই টেরাকোটা অলঙ্করণের পরিমাণ ও নান্দনিক সৌন্দর্যের অবনমন ঘটেছে। অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পরিবর্তে চুনাবালি বা পঙ্খের কাজ স্থান পেয়েছে।[১]

ভারতবর্ষে চিরকালই দেবমন্দিরগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায় প্রাচীনবাংলায় প্রচুর মন্দির ছিল এবং শাস্ত্রীয় নৃত্য চর্চাও ছিল। সেইজন্য যুগে যুগে নৃত্য ভাস্কর্যেরও প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে এর অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে গেছে। বহু ধরনের নৃত্যভাস্কর্য বাংলায় দেখা যায়, যেমন—

ক) প্রস্তর বা পাথর নির্মিত।

খ) কাঠ বা দারুশিল্প।

গ) পোড়ামাটি।

ঘ) ধাতব।

উপরোক্ত ভাস্কর্যের তুলনায় নবীন মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার ভাস্করদের হাতির দাঁতের এবং শোলার কারুশিল্প। গত কয়েকশত বৎসরের মধ্যে বাঙালী শিল্পীরা এই হাতির দাঁতের কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে (পৃথিবীর মধ্যে বাংলাতেই প্রথম হস্তীর চিকিৎসা শাস্ত্র রচিত হয়, আনুঃ ষষ্ঠ শতকে পালকাপ্য রচিত গজায়ুর্বেদ)। এখন এই শিল্পীদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে গেছে।[২]

এইসব মূর্তিগুলি থেকে প্রাচীনবাংলার নৃত্যশৈলীর গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের শিল্পশাস্ত্রে চার ধরনের ভঙ্গিমার প্রয়োগ আছে—সমভঙ্গ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ। গৌড়ীয় নৃত্যে এই চার ধরনের ভঙ্গিমারই প্রয়োগ আছে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার মূর্তি তথা ভাস্কর্যেও এই চার প্রকার ভঙ্গিমাই দেখা যায়।

১। ইতিহাস-অনুসন্ধান—২, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, সম্পাদক—শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়, কে. পি. বাগ্‌চি এণ্ড কোং. ১৯৮৭, পৃঃ ১১৭-১১৮।

২। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, ১৯৯৬, পৃঃ ১৯।



চন্দ্রকেতুগড়, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ-৩য় শতক (আনুঃ) টেরাকোটা ফলক ভগ্নদশা, অর্ধমণ্ডল স্থানকে, পায়ে ঘুঙুর সহ নৃত্যরত, সঙ্গে বীণাবাদক আসনে উপবিষ্ট।
(আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত)



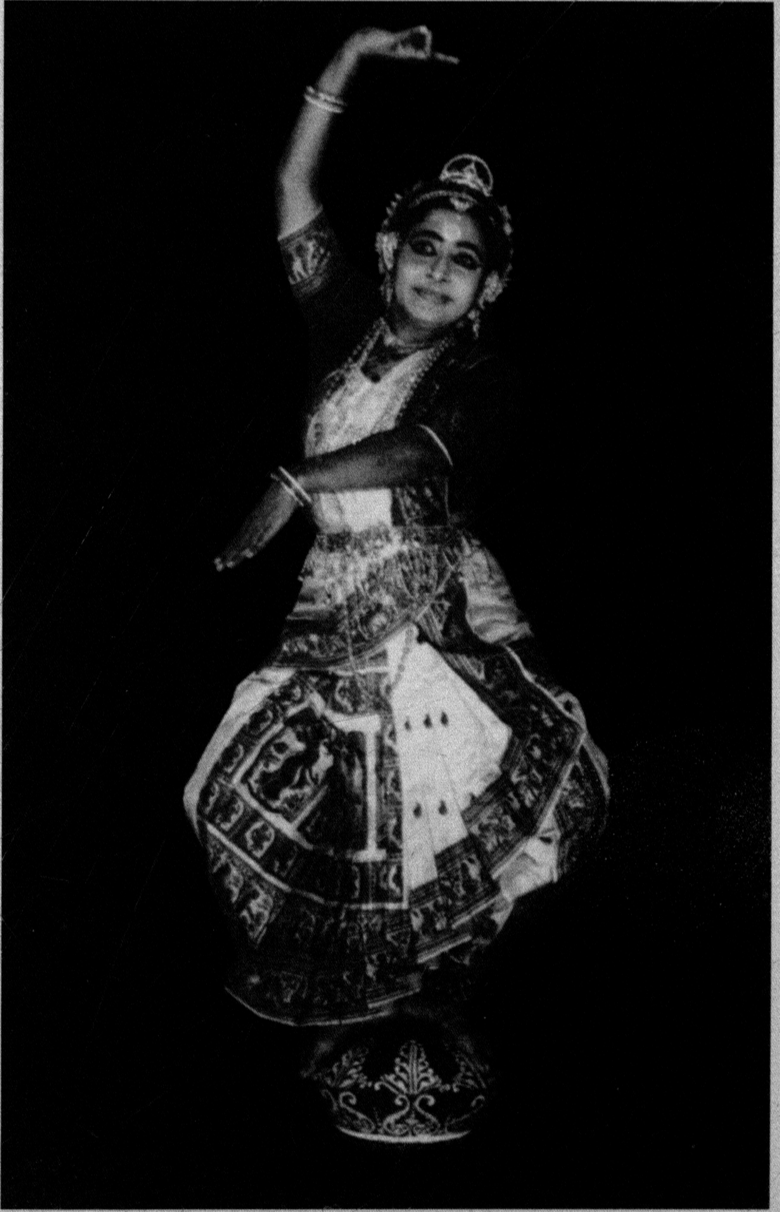
তাম্রলিপ্ত, আনুঃ প্রথম শতাব্দী, টেরাকোটা ফলক, নর্তকী ও সহযোগী, নর্তকী কাপ্তী পোশাক পরিহিতা, কানড়খোঁপা সহ এবং নর্তক-নর্তকী উভয়েই অলংকারমণ্ডিত।



মঙ্গলকোট নতুনহাট থানা, কাটোয়া সাব-ডিভিশন, আনুঃ ৩য় শতক, টেরাকোটা ফলক, নর্তকদ্বয় কটিতে হস্তধৃত অর্ধমণ্ডল স্থানক, বাদকশিল্পী আনদ্ধবাদ্যযন্ত্র বাদনরত



আনু: অষ্টম শতকের মন্দির প্রস্তর দ্বারা নির্মিত মালদহ জেলার আদিনা মসজিদ (ত্রয়োদশ শতক), অষ্টম শতকের সুরসুন্দরী কাঞ্চী পোশাক পরিহিতা, খোপ্যাক কবরীযুক্তা সালংকারা, করীহস্তধৃত।



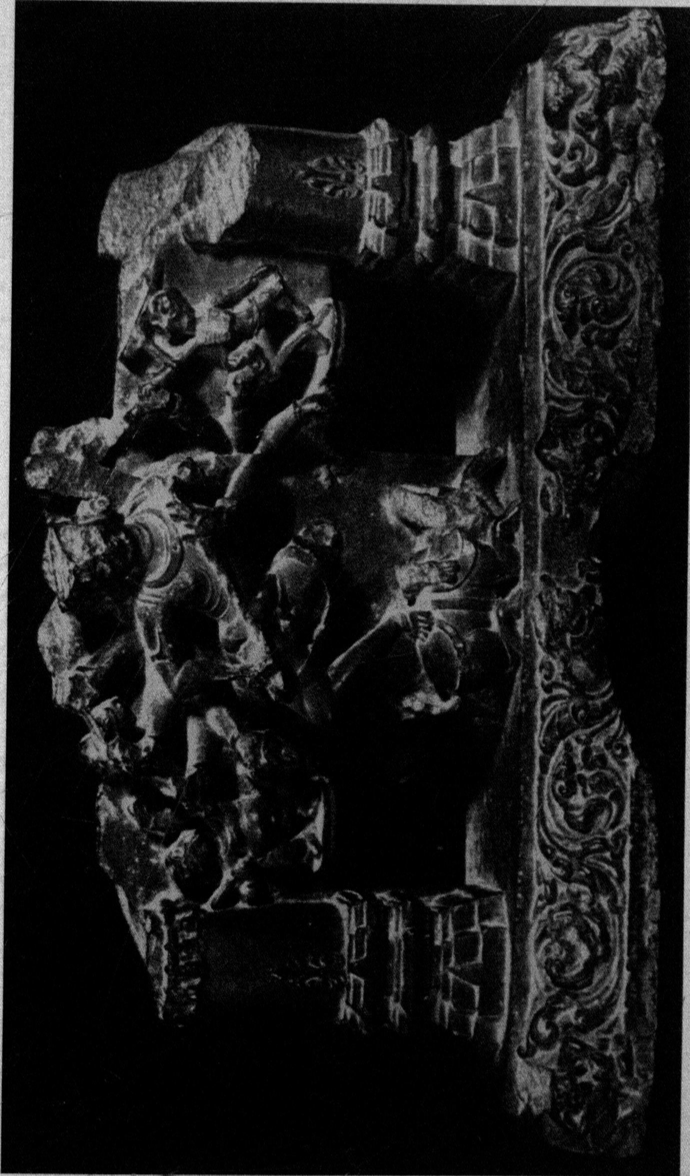
সরার উপর গৌড়ীয় নৃত্যের একটি ভঙ্গিমা



চক্রে নৃত্যরত বিষ্ণু, আনু: দশম শতক,
বিশাখ স্থানক, মাথার ওপর
অঞ্জলিহস্তধৃত, নিচে
গরুড়—গরুড়স্থানকযুক্ত, প্রস্তরনির্মিত।
(আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত।



নর্তক, বাঁহাতে পতাক হস্ত ও
ডান হাত দোল, অর্ধমণ্ডল
স্থানকে কুঞ্চিত পাদে নৃত্যরত,
কাঞ্চী বেশ পরিহিত, অলংকার
মণ্ডিত।
পাল শৈলী — দশম শতক
সুন্দরবন থেকে প্রাপ্ত
(দিল্লী ন্যাশনাল মিউজিয়ামের
সৌজন্যে প্রাপ্ত)।



নৃত্যপরা নটরাজ তথা নর্তেশ্বর, আনুঃ একাদশ শতক, বীণাধর নটরাজ, অতিভঙ্গ ও দশহাতযুক্ত সহযোগী নন্দী ভৃঙ্গী নৃত্যভঙ্গিমা সহ। প্রস্তর নির্মিত, রাজশাহী থেকে প্রাপ্ত (আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত)



মাতৃদেবী ও সদ্যজাত শিশু, কাঞ্চী পোশাক পরিহিতা অলংকারমণ্ডিতা, প্রস্তর নির্মিত, পালশৈলী, কটকামুখ ও পতাকহস্ত, উভয়পার্শ্বে পার্শ্বচারিণীদ্বয় নৃত্যভঙ্গিমাযুক্ত, বাঁদিকের জন বর্ধমানক স্থানক, আভঙ্গ-ভঙ্গিমা চামর ধৃতা, ডানদিকের জন স্বস্তিক স্থানক, উভয়েরই বামহস্ত সূচাস্য হস্তযুক্ত সালংকারা, নিচে নর্তক-নর্তকী বিশাখ স্থানকে মৃদঙ্গ সহযোগে নৃত্যরত। (ন্যাশনাল মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত)



নৃত্য ভৈরব—প্রত্যালীঢ় স্থানকে অতিভঙ্গি যুক্ত, রৌদ্ররসযুক্ত।
পালশৈলী—আনু: একাদশ শতক, প্রস্তর নির্মিত।
(আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত)



নৃত্যগণেশ—কুঞ্চিত পাদে, ত্রিভঙ্গিমাযুক্ত, ছয়হাতে বিভিন্নমুদ্রা ধৃত,
সহযোগী নর্তকদ্বয় আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র বাদ্যরত।
প্রস্তরনির্মিত, আনুঃ একাদশ শতক, দিনাজপুর। (আশুতোষ মিউজিয়াম)



অতিভঙ্গিমা স্বস্তিক স্থানকে



উচ্ছ্রিতবাহু, সূচ্য পাদ

আঁটপুর, অষ্টাদশ শতক, নর্তক কাঞ্চীপোষাক পরিহিত উত্তরীয় সহ অলংকারে যুক্ত, সূচ্যপাদে, একপার্শ্বগত স্থানকে ডানহাতে সূচীহস্ত ও বামহাতে পতাক, টেরাকোটা ফলক।





আঁটপুর, অষ্টাদশ শতক, নর্তক কুঞ্চিতপাদে, অর্ধমণ্ডল স্থানকে অলংকৃত সরার ওপর নৃত্যরত, টেরাকোটা ফলক।



ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ (ত্রয়োদশ শতক)। প্রস্তর নির্মিত, সপ্তম শতকের বিষ্ণুমন্দিরের অংশ, দেবদাসী বা সুরসুন্দরীর মূর্তি, নর্তকী সালংকারা ও কাঞ্চীপোষাক পরিহিতা, অতিভঙ্গি যুক্ত, বিশাখস্থানক, করীহস্ত।



বাংলার নটরাজ, পাল শৈলী, ত্রিভঙ্গি যুক্ত, নন্দী ষাঁড়ের ওপর নৃত্যরত কুঞ্চিতপাদ, দশ হাতযুক্ত উভয়পাশে গঙ্গা-গৌরীও নৃত্যভঙ্গিসহ, একপার্শ্বগত স্থানকে আভঙ্গিযুক্ত। নিচে সহযোগীগণরা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বিশাখ-মাণ্ডূক ইত্যাদি স্থানক সহ নৃত্যরত। (ঢাকা মিউজিয়ামের সৌজন্যে, প্রস্তর নির্মিত)



নর্তকী সুরসুন্দরী, কাঞ্চী পোশাক, খোপ্যাক কবরীযুক্ত, অতিভঙ্গিমাযুক্ত স্বস্তিক স্থানকে, ত্রয়োদশ শতক, বর্ধমান জেলার—কামারপাড়া। প্রস্তরনির্মিত।
(বর্ধমান মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত)



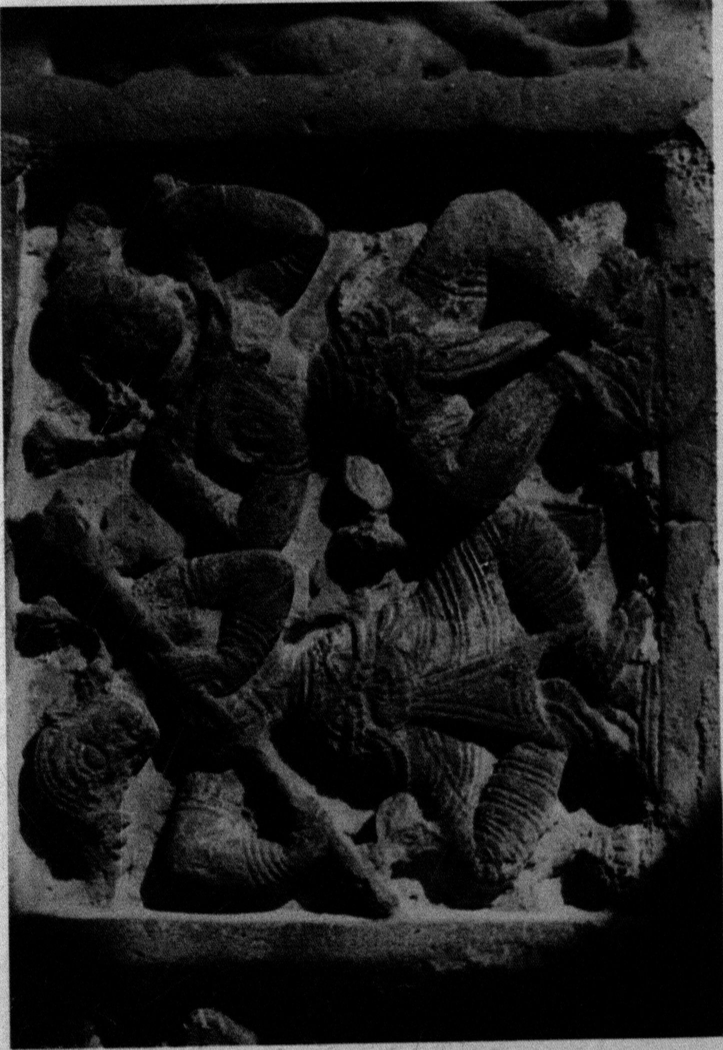
বিষ্ণুপুর, শ্যামরায়ের মন্দির, সুরসুন্দরী মৃদঙ্গসহযোগে নৃত্যশীলা, খোপ্যাক কবরীযুক্ত অলংকার মণ্ডিত। আনুঃ সপ্তদশশতক, টেরাকোটা।



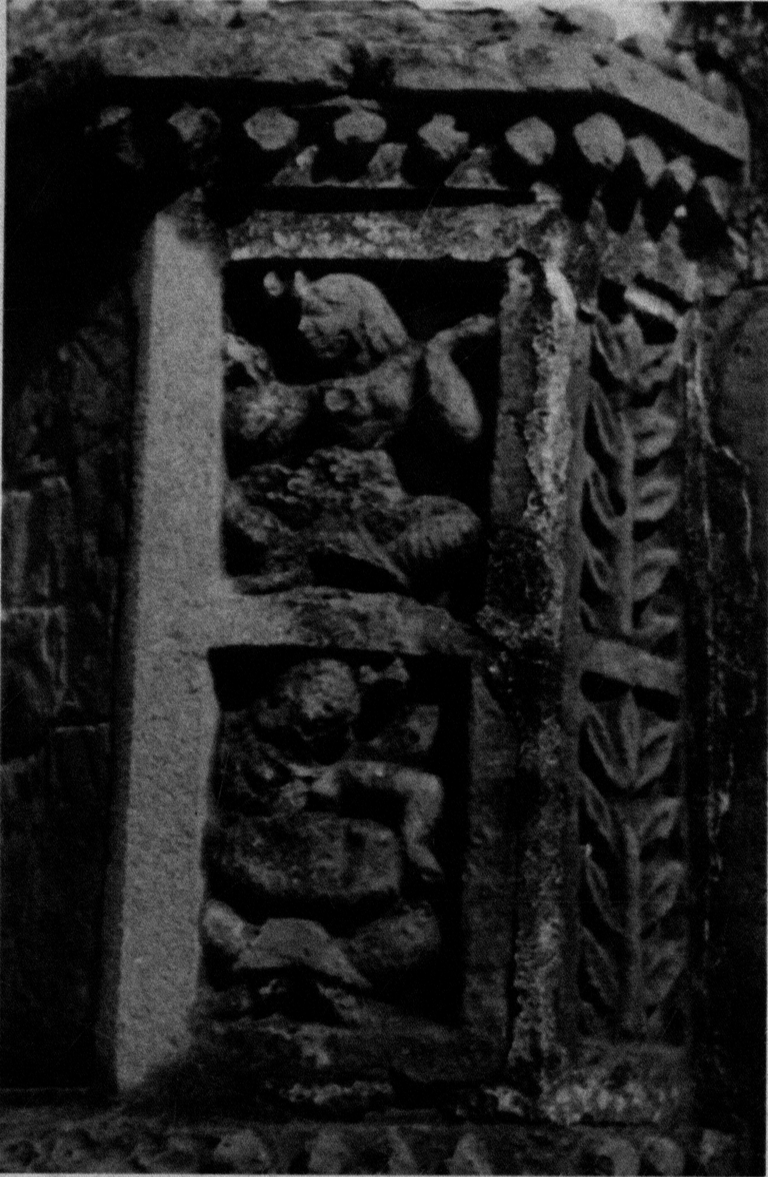
বিষ্ণুপুর, জোড়বাংলা মন্দির। আনুঃ সপ্তদশ শতক, কাঞ্চীপোষাকপরিহিতা, ডানদিকের নর্তকী মৃদঙ্গসহ সরার ওপর নৃত্যরতা,
বাম দিকের নর্তক উচ্ছ্রিত বাহুসহ কুঞ্চিতপাদে নৃত্যরত।



বিষ্ণুপুর, জোড়বাংলা মন্দির। নর্তকীদ্বয় সরার ওপর নৃত্যরতা। বামদিকের নর্তকী মৃদঙ্গসহ, ডানদিকের নর্তকী অঞ্জলি হস্তধৃত। হস্তধৃত।



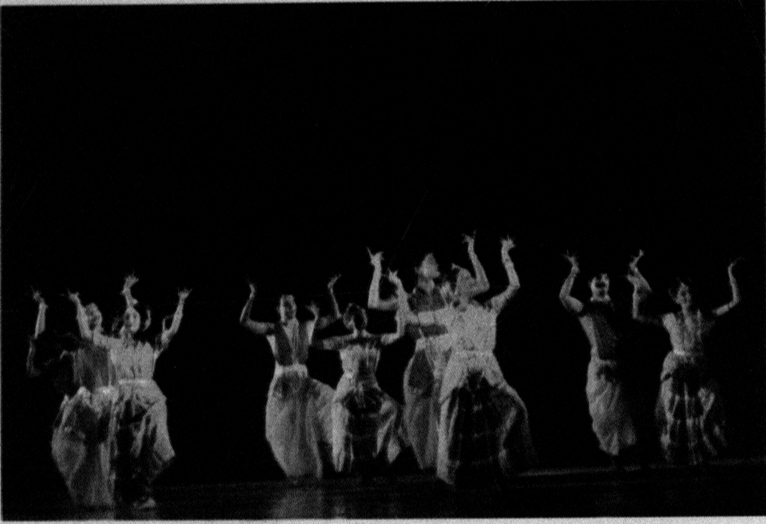
বিষ্ণুপুর শ্যামরায় মন্দির, নর্তকীদ্বয় সরার ওপর নৃত্যরতা। উভয়েই বীণাবাদনরতা। টেরাকোটা। সপ্তদশ শতাব্দী।



জোড়বাংলা মন্দির (বিষ্ণুপুর)। সপ্তদশ শতক। বিভিন্ন নৃত্য ভঙ্গিমাযুক্ত। উপরে উচ্ছ্রিত বাহু (বাংলার নৃত্যের মুখ্য একটি ভঙ্গি) সহ নর্তকী, নীচে নর্তকী মৃদঙ্গবাদন সহ নৃত্যযুক্তা।



জোড়বাংলা মন্দির (বিষ্ণুপুর)। সপ্তদশ শতক, গৌড়ীয় নৃত্যের অতিপরিচিত ভঙ্গিমায়।



'গৌড়ীয় নৃত্য ভারতী'র শিল্পীরা ৯ই জানুয়ারী ২০০২, রবীন্দ্রসদনে। আলাপচারী নৃত্যের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় উচ্ছ্রিতবাহু সহ।



আঁটপুরের মন্দির (অষ্টাদশ শতক)



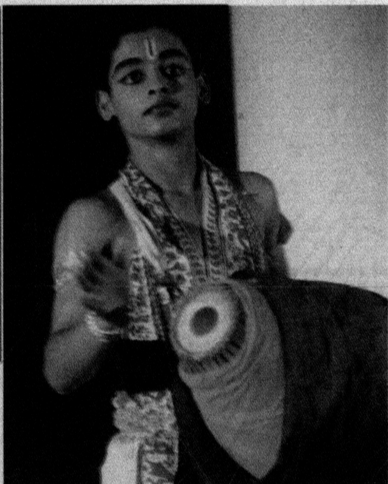
চামরধারিণী, গৌড়ীয় নৃত্যের বন্দনা ভঙ্গিমায় সরার ওপর নৃত্যশিল্পী।
বাঁশবেড়িয়া অনন্ত বাসুদেব মন্দির, সপ্তদশ শতক



অন্ধ্রপ্রদেশের কুচিপুড়ি গ্রামে—কুচিপুড়ি মহোৎসবে—'মহিষাসুরমর্দিনী' পালা নৃত্যে মহিষাসুরের ভূমিকায় নৃত্যশিল্পী।



দিল্লী ত্রিবেণী মঞ্চে গৌড়ীয় নৃত্যে সংগীত পরিবেশনরত—গৌড়ীয় সংগীত গবেষক। ৯ই অক্টোবর ১৯৯৫।



গৌড়ীয় নৃত্যে—মৃদঙ্গ নৃত্যের ভূমিকায় শিল্পী। —দি এশিয়াটিক সোসাইটি কোলকাতা, ন্যাশনাল সেমিনার ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০২। বিদ্যাসাগর সভাগৃহ।

পরবর্তীকালে গুপ্তযুগে খুব কমই নৃত্যমূর্তি পাওয়া যায়। গুপ্ত ও পালযুগের সন্ধিক্ষণে যেসব ভাস্কর্য পাই তার মধ্যে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দের জাফর খাঁ গাজীর মসজিদটি উল্লেখ্য। কারণ মসজিদটি ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সন্ধিক্ষণ যুগের বৈষ্ণব মন্দির ছিল, দরগার পূর্বদিকের অংশটি ছিল মন্দিরের গর্ভগৃহ এবং পশ্চিমের অংশটি ছিল মণ্ডপ। ভাস্কর্যের মধ্যে দশাবতার, নর্তকীমূর্তি, চামরধারিণী দেবদাসী মূর্তি আছে, যদিও সেগুলি নানাভাবে ঘর্ষণের ফলে বহুলাংশে বিনষ্ট। প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরে মুরারীমোহনের প্রস্তর দেউল ছিল। মুরারীমোহন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপকরণ দিয়ে দরগাহ্‌টি নির্মিত হয়েছে। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে একে প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করা হয়।[১,২]

গুপ্তযুগের পর পাল-সেন যুগ, বাংলার গৌরবময় যুগ। এই যুগে (৭৫০-১২০০ শতক) বাংলায় লালিত আচরিত শিল্পকলার এক অদ্ভুত সুন্দর ছাপ বহির্বঙ্গে পড়েছিল যা আসাম-বাংলা-বিহার অর্থাৎ প্রাচ্য ভারতের ভাস্কর শিল্পের এক গৌরবময় অধ্যায়।[৩] পালযুগের তক্ষণ শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে রয়েছে বার্মায়, তিব্বতে, নেপালে, কম্বোডিয়ায় ও ইন্দোনেশিয়ায়।[৪] সেই গৌরবময় পাল এবং সেন যুগের প্রস্তর নির্মিত প্রচুর নৃত্যমূর্তি পাওয়া যায়। নবম শতকের বাঙালি স্থপতি ধীমান ও বীতপাল—পিতা ও পুত্র জাভার বিখ্যাত বরবুদুরের মন্দিরে তাদের কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।[৪] পাহাড়পুর-জগজীবনপুরের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন যদিও নষ্ট হয়ে গেছে বা যাচ্ছে, তবুও যেটুকু আছে, তা অমূল্য সম্পদ। পাহাড়পুরের স্থাপত্য-শৈলী, সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতক — অর্থাৎ পাল যুগের গৌরবময় সাক্ষী। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যে তিন দেবতাকে নৃত্য শিল্পী হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়— বিষ্ণু, গণেশ, নটরাজ বা নর্তেশ্বর শিব। এই তিন দেবতার নৃত্যমূর্তিই পালযুগে পাওয়া যায়।

১। হুগলী জেলার পুরাকীর্তি, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সম্পাদনা দেবলা মিত্র, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, ১৯৯৩, পৃঃ ৭৮-৮০।

২। শিল্প ও শিল্পী, ২য় খণ্ড, কৃষ্ণলাল দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২, পৃঃ ৪১।

৩। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, দেজ পাব্লিকেশন, ১৯৩৩, পৃঃ ৬৬৬-৬৬৯।

৪। বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০ খ্রীঃ)—সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ২১-২২।

পাল-সেন যুগের পর তুর্কী আক্রমণ, গোটা বাংলায় তখন ভয়াবহ ধ্বংসলীলার যুগ। অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষ উভয় মিলেই ধ্বংসলীলা চালিয়েছে ভয়ানকভাবে প্রায় ত্রয়োদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত। ষষ্ঠদশ শতক থেকে আবার স্থাপত্য শিল্পের প্রাচুর্য দেখা যায়। মন্দিরের অলঙ্করণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেসব মন্দির সপ্তদশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছে সেসব মন্দিরের নৃত্যভাস্কর্যগুলি অতীব সুন্দর। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত মন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্যে যুগসন্ধিক্ষণের ছাপ সুস্পষ্ট। অষ্টাদশ শতকের পর থেকে টেরাকোটা অলংকরণের পরিমাণ কমে গেছে। অবশেষে অলংকরণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[১]

সপ্তদশ শতকের হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরে, বীরভূমের কেন্দুলির মন্দিরে, বর্ধমানের মন্দিরগুলিতে নর্তক-নর্তকী মূর্তিগুলি বিভিন্ন স্থানকে, বিভিন্ন হস্তমুদ্রায়, বিভিন্ন লীলায় বিধৃত। অষ্টাদশ শতকের বর্ধমানের কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দির, হুগলীর আঁটপুরের মন্দির, মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে রাণীভবানী নির্মিত ভবানীশ্বর মন্দিরে বিভিন্ন স্থানক, হস্তমুদ্রা, বিভিন্ন লীলা বিধৃত। যেমন— মহিষাসুরমর্দিনী, পুতনা বধ, কালীয় দমন, বস্ত্রহরণ, সীতাস্বয়ম্বর ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরে পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন মন্দিরে উপরোক্তলীলা, স্থানক, হস্তমুদ্রা বিধৃত নর্তক-নর্তকী মূর্তি, বাদ্যযন্ত্রসহ বাদকবাদিকামূর্তি দেখা যায়।

এতো গেল অতি সংক্ষেপে প্রস্তর ও পোড়ামাটির নৃত্যভাস্কর্যের কথা। এবার আসা যাক চিত্রশিল্পের আলোচনায়। প্রাচীন বাংলার কোন স্থানেই এ যাবৎ প্রাক্-পালযুগের চিত্রকলার কোনও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু ফা-হিয়েনের বিবরণীতে একটি ইঙ্গিত আছে যাতে মনে হয় খৃস্টীয় চতুর্থ-শতকে তাম্রলিপ্তিতে এবং বোধ হয় বাংলার অন্যত্রও চিত্রশিল্প রচনার অভ্যাস প্রচলিত ছিল। তা ছাড়া ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও লোকায়ত সংস্কৃতিতে পটচিত্র, ধূলিচিত্র প্রভৃতি অজ্ঞাত ছিল না। তারই প্রবহমান ধারা দেখতে পাওয়া যায় সপ্তদশ-ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন পাটাচিত্রে, বাংলার জড়ানো পটের ছবিতে, আলপনায়, বিশেষত ফরিদপুর, যশোর, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও কালিঘাটের বিচ্ছিন্ন পটের নানা চিত্রে, বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসে। যাই হোক, প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র এবং সাহিত্য গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় বিহার-মন্দিরের প্রাচীর গাত্র চিত্রশোভিত করার শাস্ত্রীয় নির্দেশ একটা ছিলই। কাজেই বোঝা যায় প্রাচীন বাংলার অনেক বিহার-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রই চিত্রদ্বারা শোভিত থাকত। বাংলার চিত্রকলার প্রাচীনতম

১। ইতিহাস অনুসন্ধান-২, ...পৃ: ১১৭-১১৮।

যেসব নিদর্শন এপর্যন্ত পাওয়া গেছে তা প্রায় সমস্তই একাদশ-দ্বাদশ শতকের এবং প্রত্যেকটিই পাণ্ডুলিপি চিত্র অর্থাৎ তালপাতায় বা কাগজে হাতে লেখা পুঁথি-অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে আঁকা ছবি। পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই পাওয়া গেছে নেপালে, কয়েকটি বাংলায় এবং কয়েকটি বাংলার বাইরে। তবে প্রায় প্রত্যেকটিই বাংলায় লিখিত ও চিত্রিত হয়েছিল। চিত্রশৈলী এবং তারিখ সম্বলিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপিই তার প্রমাণ।[১] ছবিগুলিতে যেসব রঙ ব্যবহার হত তার মধ্যে হরিতালের হলুদ, খড়িমাটির সাদা, গাঢ় নীল, প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুর লাল এবং সবুজ।[২] নৃত্যের চিত্রগুলিতে নৃত্য ভঙ্গিমা, স্থানক, বাদ্যযন্ত্র, বেশভূষা প্রভৃতি সুস্পষ্ট ও সুন্দর। গুপ্তযুগে বাঙালীর তুলিতে যে চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল, কারও কারও মতে তার নিদর্শন রয়েছে অজন্তা গুহায়। তাঁদের মতে এতে বাঙালীর তুলির ছাপ সুস্পষ্ট। এমতের সমর্থনে প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীঅসিত হালদার যে নয়টি কারণের উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলিই প্রণিধানযোগ্য। তার কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করলাম—(ক) অজন্তার ছবিতে অবিকল বাঙলার খড়ে ছাওয়া আটচালা, যার সন্ধান আর কোথাও পাওয়া যায় না। (খ) যশোর ও মেদিনীপুরে কাঠের পাটার ওপর অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে অজন্তার চিত্রের অপরিসীম সাদৃশ্য। (গ) অজন্তার চিত্রে পুরুষ ও নারীর ধুতি ও শাড়ি ঠিক বাঙালির মত। (ঘ) কালীঘাটের পটের ও অজন্তার ছবির রেখাকৌশলের মধ্যে রয়েছে অপরূপ সামঞ্জস্য। পালযুগের যে বাঙালীর চিত্রকৌশল অব্যাহত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই তার মনোরম নিদর্শন আজও রয়েছে বাঙালীর চিরন্তন আলপনায়, পিঁড়িচিত্রে, নক্‌শি কাঁথার সূচীশিল্পে ও কালীঘাটের পট অঙ্কণে।[২]

শিলালেখমালা ও ভাস্কর্য থেকেও আমরা প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারা তথা দেবদাসীদের বর্ণনা পাই। (পূর্বে অধ্যায়গুলিতে তার উদাহরণ আছে)। অতীতের নির্বাক অথচ বাঙ্‌ময় ঐতিহাসিক সাক্ষ্যগুলি থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের জনপ্রিয়তা তথা ব্যাপ্তির। নৃত্যগীতের প্রেক্ষাপটে প্রাচীনবাংলার এই শিল্পসম্ভারগুলিকে নতুন করে দেখা শুরু হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতের নৃত্যশিল্পীদের স্পর্শে, পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণায় এই ঐতিহাসিক নির্বাক দলিলগুলি আরও প্রাণ পাবে, বাঙ্‌ময় হয়ে উঠবে এবং উজাড় করে দেবে গৌড়ীয় নৃত্যের সুচারু ডালিকে দিনে দিনে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য।

১। বাঙালীর ইতিহাস...............পৃঃ ৬৬৬-৬৬৯।
২। বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা.........পৃঃ ২১-২২।

বাংলার গুরুশিষ্যপরম্পরা নৃত্যধারা

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় গুরুশিষ্যপরম্পরা নৃত্যধারা প্রচলিত আছে এবং এই ধারায় কখনও ছেদ পড়েনি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতে নগর-চর্চিত এই শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হলেও কখনওই স্থায়ী হয়নি ওই স্তব্ধতা। এই নৃত্যের উপকরণগুলি গুরুশিষ্যপরম্পরা ঐতিহ্যবাহী নৃত্যধারাগুলির মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় সজীবই থেকে গেছে। এর মধ্যে আছে দু ধরনের নৃত্যধারা — একক ও নাট্যধর্মীয় সমবেত। একক নৃত্যের মধ্যে মহিলা পরিবেশিত, ক্ষয়িষ্ণু নৃত্যধারা— নাচনী, মহিলা বা পুরুষ পরিবেশিত কীর্তন, বাউল এবং সমবেত নাট্যগুলির মধ্যে বিষহরা, কুশান ও ছৌ হল প্রধান। এছাড়াও আছে বেশ কিছু লৌকিক নৃত্যধারা। সাংস্কৃতিক জগতের পণ্ডিতবর্গ একমত যে, সমস্ত শাস্ত্রীয় নৃত্যই লোকনৃত্য থেকে পরিমার্জনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নীত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। গৌড়ীয় নৃত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। রাষ্ট্র যখন শান্তিতে স্থিতাবস্থায় থাকে ও সংস্কৃতিচর্চার অনুকূল পরিবেশ থাকে, তখনই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের (গীত-বাদ্য-নৃত্য) সমৃদ্ধি ঘটে। যেমন শ্রীগোপাল হালদার বলেছেন "খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দ শেষ হতে না হতেই বাংলার ওপর তুর্কী আক্রমণের ঝড় বয়ে গেল। তুর্কী বিজয়ের প্রথম পর্বটা ছিল ধ্বংসের। মোটামুটি খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৩৫০ — এই দেড়শো বছরের বাংলাদেশের কোন সাংস্কৃতিক বা সামাজিক চিত্র আমরা পাইনা। সার্ধ শতাব্দী জোড়া এই নিস্তব্ধতাই তুর্ক-বিজয়ের ভয়াবহতার একটা প্রমাণ।"[১] তুর্ক বিজয়ের পূর্ববর্তী যুগে আমরা বাংলায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের তথা সঙ্গীতের অনেক প্রমাণ পাই সাহিত্য ভাস্কর্য ও নাট্যগীতাদিতে। নাট্যশাস্ত্র, মতঙ্গের বৃহদ্দেশী, শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকর, কল্হনের রাজতরঙ্গিণী ইত্যাদির বর্ণনা এবং ভাস্কর্য-চিত্রকলার নিদর্শন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় খৃষ্টপূর্বকাল থেকেই বাংলা ভারতীয় অভিজাত সংগীতে ও অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলো। বাংলার সংগীত ও নৃত্যনাট্য যে তখন যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় গীতগোবিন্দে এবং সে. কশুভোদয়া, পবনদূতম, আর্যাসপ্তশতী ইত্যাদি গ্রন্থে। তুর্ক বিজয়ের কাল যদিও নিস্তব্ধ কিন্তু তাই বলে কি সমস্ত রকম সংস্কৃতি চর্চাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল? তা নয়, অন্তঃসলিলা

১) বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার, ১ম খণ্ড, মুক্তধারা, পৃঃ ৩৩।

ফল্গুধারার মত লোকসংস্কৃতি বয়ে চলেছিল বাংলার গ্রামের জনমানসে, কারণ তারপরই তৈরী হয়েছিল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। যদি সমস্ত সংস্কৃতিচর্চা স্তব্ধ হয়ে যেত তা হলে এই পালাগুলি আর পরবর্তীকালে তৈরী হত না। এগুলি নৃত্যগীত সহযোগে পরিবেশিত হত। এ জাতীয় শিল্পকে অনেকে লীলানাট্য জাতীয় বলেও অভিহিত করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি মোট ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত— জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়াদমন, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ। কারও কারও মতে "কবির মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে আদিরস ও লোককথাকে পুরাণের কাঠামোয় ফেলে নতুন স্বাদে উপস্থিতি করার মধ্যে।"[১]

"জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে রাধাকৃষ্ণের কোন পারিবারিক পরিবেশ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা এবং কৃষ্ণের পারিবারিক পরিচয় পাওয়া যায়। রাধার স্বামী, শাশুড়ি ও ননদ নিয়ে সংসার মধ্যযুগেরই সাধারণ বাঙ্গালীর সংসার।"[২] এর থেকেই বোঝা যায় যে অনুকূল পরিবেশ যেই এল আবার শুরু হল সাংস্কৃতিক জগতের নিত্যনতুন রচনা পরিবেশনা। অর্থাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল যে চর্চার অনুকূল পরিবেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং প্রতিকূল পরিবেশে তা হারিয়ে যায় না, তা লোকসমাজে সযত্নে লালিত-পালিত হতে থাকে যা শিকড় স্বরূপ এবং সেই শিকড় থেকেই পরবর্তীকালে আবার পল্লবিত হয়ে ওঠে শাস্ত্রীয় সংগীত তথা শিল্পকলা। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময়সীমায় লীলানাট্য, বিদ্যাপতী, চণ্ডীদাসের গান, নটদের নৃত্যগীত পাওয়া যায়।[৩] সেই সময় লোকে রাত জেগে মনসার গান শুনত; চণ্ডী-বাশুলীর পালা অভিনয় দেখত; শিবের গান, যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত হত। 'পাঁচালী' ছিল একধরনের গান ও আবৃত্তির নাম — কখনও তা মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও চামর সহযোগে গীত হত। একজনমাত্র 'গায়েন' কখনও গাইত, কখনও দ্রুত আবৃত্তি করতো, মাঝে মাঝে নাচত। নৃত্য-গীতসম্বলিত উত্তর-প্রত্যুৎত্তরে কৃষ্ণলীলা অভিনীত হত—তার নাম নাট্য গীত।[১] এগুলি সবই প্রাক্‌চৈতন্য যুগের নিদর্শন। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতকে অর্থাৎ চৈতন্য ও চৈতন্য পরবর্তী যুগে আবার সংগীত শাস্ত্রের বিবিধ গ্রন্থ রচিত হয়। এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে বিশ্বসংসারের মত সাংস্কৃতিক জগতেও চক্রাকৃতি আবর্তন চলছে। অর্থাৎ অনুকূল অবস্থায় লোক নৃত্য থেকে শাস্ত্রীয় আবার

১। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, সত্যবতী গিরি, রত্নাবলী, ১৯৮৮, পৃঃ ৬৫।

২। ঐ, পৃঃ ৮৫।

৩। নারদকৃত পঞ্চমসার সংহিতা ও দামোদর সেন কৃত সংগীত দামোদর, গুরু বিপন সিং, মণিপুরী নর্তনালয়, ১৯৮৫, পৃঃ ১১ (গৌরচন্দ্রিকা)।

প্রতিকূল পরিবেশে বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী শাস্ত্রীয় থেকে লোক নৃত্যের দিকেই ঝোঁকটা যায়, জীবন চক্রের মতো সংস্কৃতিরও চক্রাকৃতি আবর্তন। অর্থাৎ এ এক অনন্ত চক্র।



প্রাচীনকাল থেকেই নাট্য অত্যন্ত জনপ্রিয়, যার ফলে প্রথম যে সংগীত সম্বন্ধীয় শাস্ত্রগ্রন্থ (এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত) রচিত হয় তার নাম 'নাট্যশাস্ত্র' ভরতমুনি প্রণীত। নাট্যগুলি সাধারণত পৌরাণিক পালানির্ভর হয়ে থাকে। এই নাট্যগুলি নৃত্যগীত ও নাটকের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। অভিনয় দর্পণে (রচনাকাল ত্রয়োদশ শতক) পাই— 'নাট্যংতন্নাটকং চৈব পূজ্যং পূর্বকথাযুতম্'[২] — নাট্য অর্থাৎ পুরাণ কথার প্রয়োগ। মনসাকীর্তন (ওঝা, বিষহরা ইত্যাদি) ও মঙ্গলকাব্যগুলি, কীর্তনের লীলানাট্য বা পালা নাট্যগুলি, গম্ভীরা, ছৌ, কুশান, প্রভৃতি বাংলার গুরুপরম্পরা এই লোকনাট্যগুলি সবই পুরাণনির্ভর।

নাট্যশাস্ত্রে নাট্যপ্রয়োগের ভেদ দুই প্রকার উল্লেখ আছে — সুকুমার ও আবিদ্ধ।

'অনুদ্ধমৈসংভ্রান্তমনা বিদ্ধাঙ্গ চেষ্টিতম্।
লয় তালকলোপেতং প্রমাণ নিয়তাক্ষরম্।।৫১।।
বিভক্ত পদালাপভীষ্টরস (বহু) লম্।
যদীদৃশং ভবেন্নাট্যং নারীনাংতু প্রযোজয়েৎ।।৫২।।

যদি কোনও নাট্যে সাধারণ ঘটনা থাকে এবং অঙ্গসমূহের ব্যস্ত বা ভয়ঙ্কর গতি না থাকে এবং উপযুক্ত লয় তাল কলাসমূহের নিয়ন্ত্রিত উচ্চারণ, স্পষ্ট, বিভক্তি, শব্দ এবং প্রচুর বাঞ্ছিত রস থাকে তাহলে নারী কর্তৃক প্রযোজ্য ঃ

'যত্ত্বাবিদ্ধাঙ্গ হারান্তং ছেদ্য ভেদাহহবাত্মকম।
মায়েন্দ্রজালবহুলং পুস্তনেপথ্য সংযুতম্।।৫৩।।

১। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার, ১ম খণ্ড, মুক্তধারা, পৃঃ ৪২-৪৩,

২। *Abhinayadarpaṇam*-Edited and translated by Dr. Manomohan Ghosh, Manisha, 1989, Pg. 78.

পুরুষৈর্বহুভির্যুক্তম্ অল্প স্ত্রীকমথোদ্ধতম্,।
সাত্ত্বত্যারভটীযুক্তং নাট্যামাবিদ্ধ সংজ্ঞিতম্।।৫৪।।

যে নাট্যে ছেদন, ভেদন, শুদ্ধ প্রভৃতির অভিনয়ের জন্য অঙ্গহার আবশ্যক, যাতে ইন্দ্রজাল, যাদুবিদ্যা, কৃত্রিম পদার্থ ও পরিচ্ছদাদির অভিনয় থাকে, পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে থাকে বহু পুরুষ এবং শান্তশীলা অল্প সংখ্যক নারী এবং যার প্রয়োগে অধিকাংশ সাত্ত্বতী ও আরভটী বৃত্তি প্রযুক্ত হয়, তা আবিদ্ধ নাট্য।[১] যেমন — পুরুলিয়ার ছৌ। বাংলা কীর্তনের রাসলীলার নাট্যগীতগুলি পুরুষ বা মহিলা শিল্পীদের দ্বারা নৃত্য-গীত সহযোগে পরিবেশিত হয়ে থাকে। যেমন — নৌকা বিলাস, বসন্ত রাস, অষ্টনায়িকা। কুশান নাট্যে, ছৌ-এর বলরামের রাস, কৃষ্ণের রাস ইত্যাদি পালায় পুরুষেরাও মহিলাবেশ ধরে নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন।

নাট্যশাস্ত্রে যে বৃন্দগানের উল্লেখ পাওয়া যায় সাংগঠনিক বিশ্লেষণে আমাদের এই লোকনাট্যের দলগুলিও ঠিক তাই। বৃন্দগানে মুখ্যগায়েন, সমগায়েন, মার্দ্দঙ্গিক ইত্যাদি যে ভাষা আছে ঠিক তার বাংলা পরিভাষা — মূলগায়েন, দোহার, বায়ান বা বাজনদার ইত্যাদি। কীর্তন, কুশান ইত্যাদিতে প্রচলিত অধমবৃন্দে একজন মুখ্য গায়েন, চারজন সমগায়েন এবং দুজন মার্দ্দঙ্গিক থাকে।[২] কুশান, বিষহরা, ওঝা, কীর্তন, মনসাকীর্তনেও ঠিক তাই।

এই গুরুপরম্পরা নাট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এগুলিতে নৃত্যের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার উল্লেখ শাস্ত্রেও পাই। নাট্যে অংশগ্রহণকারী নৃত্যশিল্পী একক, যুগ্ম ও সমবেত সর্বপ্রকারই হয়ে থাকে। নাট্যগুলিতে বিশেষত কুশান, বিষহরা ইত্যাদিতে হাস্যরসপূর্ণ চরিত্রের অবতারণা থাকে যাকে কথ্যভাষায় বলে 'দোয়াড়ী'। এই হাস্যরসের চরিত্রটি প্রাচীনকাল থেকেই নাট্যশাস্ত্র তথা সংস্কৃত নাট্যের ভাষায় 'বিদূষক' হিসেবে পরিচিত। কোনও কোনও নাট্যে মূল বা গুরু নিজে নাচেন, কোনও কোনও লোকনাট্যে নৃত্যশিল্পী আলাদাই থাকে যিনি কেবল নৃত্যেই অংশ গ্রহণ করেন, যেমন—কুশান, বিষহরায় ছোকরাদের নৃত্য, আবার কোথাও শিল্পী নৃত্য এবং নাটক উভয় ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ করেন। বাদক শিল্পীরা অর্থাৎ মৃদঙ্গবাদক শিল্পীরা, মন্দিরাবাদক শিল্পীরা নৃত্যরত অবস্থায় বাজিয়ে অংশগ্রহণ করেন। বিষহরা, রয়ানী, ওঝা, মনসামঙ্গল পালায় মূল গায়েন চামর হস্তে বিশেষত

১। নাট্যশাস্ত্র (৪র্থ খণ্ড), সম্পাদনা সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্ত্তী, নবপত্র প্রকাশন ১৯৯৫, পৃঃ ২২৮-২২৯।

২। তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৬, পৃঃ ১১৮।

বন্দনা-মঙ্গলাচরণে নৃত্য করে থাকেন। নিম্নোক্ত গুরু পরম্পরা ধারাগুলি গৌড়ীয় নৃত্যের নাট্য ধারা।

বিষহরা, ওঝা, মনসাকীর্তন

বাংলার এক অঞ্চলে এক এক নামে এক এক রচয়িতার রচনা নির্ভর করে মনসামঙ্গল পরিবেশিত হয়। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার - জলপাইগুড়ি জেলায় বিষহরা, মালদহ জেলায় মনসাকীর্তন, শ্রীহট্ট জেলায় ওঝা নাট্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আগে এই নাট্যপালাগুলি এগারো দিন ধরে হত। আধুনিক কালে সময়ের দাবিতে একদিন অতি সম্প্রতি কোথাও কোথাও দুই বা তিন ঘন্টাতেও, কোনও পালার অংশ বিশেষের অনুষ্ঠান হয়। এখানে 'মূল' বা গুরু' যিনি নৃত্য-গীত-বাদ্য সংগীতে দক্ষ তিনি চামর দুলিয়ে দুলিয়ে অল্প নৃত্যে, ভঙ্গিতে গণেশ, মনসা, বিষ্ণু, কালীর বন্দনা করেন। বিষহরা পালা দ্বাদশ শতকের ময়মনসিংহের গীতিকার নারায়ণদেবের মনসা মঙ্গলের সাহিত্য, ওঝা ষোড়শ শতকের ষষ্ঠীবর দত্তের সাহিত্য, মনসাকীর্তন সপ্তদশ শতকের জগজ্জীবন ঘোষালের সাহিত্য অবলম্বন করে পরিবেশিত হয়। তার মধ্যে পরবর্তীকালের শিল্পীদেরও অঞ্চলগত ভাবে বহু সংযোজনা থাকে। চামর সহযোগে বন্দনার পর সমবেত ভাবে 'হাতুটী' করা হয় অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ শ্রীখোল বা মৃদঙ্গ বা পদ্মাপুরাণ পাকাজ নৃত্য সহযোগে বাজানো হয়। এরপর চামর নৃত্য, সমবেত সংগীত ও নৃত্যের বিবিধ চারী-গতি শুরু হয়। মধ্যে মধ্যে বিদূষক বা দোয়াড়ী হাস্যরসের অবতারণা করেন। বাদকেরা নৃত্যের ছন্দে নর্তকের পদসঞ্চারকে অনুসরণ করে নৃত্য করতে করতে বাজাতে থাকে। নৃত্য চলে সমগ্র আসরটিকে গোল করে প্রদক্ষিণ করে। বাংলা নৃত্যের বিশেষত্ব ভ্রমরী অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে নৃত্য করা। অন্তর্ভ্রমরী-বহির্ভ্রমরী—শিল্পী নিজে পাক খাবেন আবার পুরো অঞ্চল প্রদক্ষিণ করবেন। পঞ্চদশ শতকে বাংলার সংগীত শাস্ত্রকার পণ্ডিত শুভঙ্করের সংগীত দামোদরে নানা ধরনের ভ্রমরী বিশেষত চক্র, ছত্র, কুঞ্চিত ইত্যাদি বিশেষতঃ অন্তঃভ্রমরী-বাহ্যভ্রমরীর কথা পাই—

"কূর্মালগং লোহলী স্যাদন্তভ্রমরীকা তথা
বাহ্যভ্রমরীকা তির্যগলগভ্রমরী তথা।"[১]

হাত বা হস্তেরই কত রকমের প্রকারভেদ—অসংযুত, সংযুত ইত্যাদি দেখা যায়। অসংযুত —পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অলপদ্ম, সর্পশির, মৃগশির,

১। পণ্ডিত শুভঙ্কর রচিত সংগীত দামোদর, গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬০, পৃঃ ৬৯।

পদ্মকোশ ইত্যাদি এবং অঞ্জলি, কপোত, স্বস্তিক, গজদন্ত, মরাল ইত্যাদি সংযুত হস্ত। এছাড়া কটি ভ্রমরীও উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রযুক্ত হয়। পণ্ডিত শুভঙ্করের 'সংগীত দামোদর'-এ পাই—

"কটিকর ভুজবল্লী চালনোদ্দদ্বিলাসং
ঘনমতিমৃদুশীঘ্রং তালমাদিপ্রযুক্তম"[১]

বিষহরা, মনসাকীর্তনে ছোট ছোট ছেলেরা বালিকা বেশে নৃত্য করে। এই ছেলেদের কথ্য ভাষায় চ্যাংড়া বা ছোকরা বলা হয়। এই মনসামঙ্গলের নৃত্যগুলিতে অপূর্ব ভাবে নবরসের অবতারণা থাকে যার বর্ণনা পাই ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রে। আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল, পদ্মাপুরাণ পাকাজ, ঘন- মন্দিরা, করতাল; সাহিত্য অনুযায়ী পাই প্রাচীনকালে 'তত' জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত বীণা, এস্রাজ ইত্যাদি; বাঁশী, মুখাবাঁশী, জামপাতার বাঁশী, সানাই ইত্যাদি সুষির বাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর নৃত্যগুলিতে কঠিন কঠিন তালের প্রয়োগ দেখা যায়। ওঝা নৃত্য গুরুমুখী নৃত্য। বাংলায় গুরুমুখী নৃত্যধারা এত কঠোর ছিল যে— যাঁরা ওঝা নৃত্য শিখতে আসতেন তাঁরা যাতে শিল্প কর্মটি ধরে রাখেন, বিবাহ করে চলে না যান, তার জন্য সেই শিক্ষার্থী শিল্পীদের বন্ধ্যা করে দেওয়া হত।

কুশান

কুশান উত্তরবঙ্গের বিশেষত জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার অতি প্রাচীন জনপ্রিয় নাট্যপালা। এতেও নৃত্যের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি যিনি পরিচালনা করেন তাকে 'মূল' বা 'গীদাল' বলে। এই 'মূল' বা 'গীদাল' গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাটক সমস্ত বিষয়েই পারদর্শী। মূলের হাতে থাকে বাদ্যযন্ত্র 'বেনা'। মূলই 'বেনা' বাজিয়ে গান গেয়ে নৃত্য করে আসর পরিচালনা করেন। দক্ষিণ ভারতের লোকনাট্য এবং লোকনাট্য থেকে উদ্ভূত বর্তমানের শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলিতে মূল পরিচালককে বলে নাট্টুবান। সংস্কৃত নাট্যে যিনি আসর শুরু করে পরিচালনা করেন তাকে বলে 'সূত্রধর'। এখানে বলে 'মূল' বা 'গীদাল'। কুশানে যিনি হাস্যরসের অবতারণা করেন তাঁকে বলে 'দোয়াড়ী', নাট্যশাস্ত্র বা সংস্কৃত নাট্যে এই চরিত্র বিদূষক হিসেবে চিহ্নিত। নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত বৃন্দগান পদ্ধতিতেই কুশানের গায়ক-বাদক-নর্তকী দল সজ্জিত থাকে। অধমবৃন্দের ন্যায় একজন মুখ্য, চারজন সমগায়েন ও দুজন মার্দঙ্গিক থাকে। আগে ছোট ছোট ছেলেরা মেয়ে সেজে নাচত, তাদের ছোকরা-ছোকরী বলত। এখন মেয়েরাই

১। সংগীত দামোদার........... পৃঃ ৭৪।

অংশ গ্রহণ করে। কুশানে বিভিন্ন প্রকার ভ্রমরী দেখা যায়। এছাড়া 'কটি'র ব্যবহার বিশেষ ভাবে থাকে। সংগীত দামোদর অনুযায়ী 'কটি' ছয়প্রকার তার মধ্যে 'রেচিত কটি' বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন প্রকার অসংযুত, সংযুত এবং বিভিন্ন প্রকার নৃত্তহস্তের প্রয়োগ দেখা যায়।

অসংযুত—পতাক, ত্রিপতাক, অলপদ্ম, মুষ্টি, শিখর, সূচী, মৃগশীর্ষ, সন্দংশ, পদ্মকোশ, তাম্রচূড়, কৃষ্ণসারমুখ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার হস্তকের ব্যবহার দেখা যায়।

সংযুত—স্বস্তিক, গজদন্ত, কপোত, অঞ্জলি পুষ্পপুট, কর্কট ইত্যাদি।

নৃত্তহস্ত—অলপদ্মোন্নত হস্ত, করিহস্ত, উর্দ্ধমণ্ডলী, বক্ষমণ্ডলী ইত্যাদি নৃত্তহস্তের বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। উচ্ছ্রিত বাহু বা উদ্বাহু এবং অলপদ্মোন্নত হস্ত কুশান নৃত্যের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমা। এই ভঙ্গিমাটি দ্রুতলয়ে ভ্রমরীসহ পরিবেশিত হয়। এই নৃত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট দেখা যায়—ঢিমালয় থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে লয় বাড়তে থাকে ও নৃত্যের গতি বাড়তে থাকে এবং ঘুরে ঘুরে বারংবার ওঠাবসা চলে এবং নৃত্যটি বৃত্তাকারে চলতে থাকে। বাংলার সংগীত শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে এবং সাহিত্যে এর বর্ণনা আছে। যেমন—মনসামঙ্গল কাব্যেও সে বর্ণনা পাই—

"আগুতে পাছুতে গিয়া নাচে ঘন পাক দিয়া
চরণেতে বাজিছে ঘুঙুর।
নবীন কোকিল যেন অহরহ ঘনঘন
মুখে গায় বচন মধুর।।
একপাশে থাকি নেত দেখে নৃত্য অবিরত
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।
মুখে মৃদুমৃদু হাসি ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি
যেন দেখি ইন্দ্রের নটিনী।।"[১]

যেমন—কবি কর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবন চম্পূতে পাই—

"কদাচিদপি তথাবিধ গোমূত্রকাবন্ধং বিহায়
স্বচ্ছ ভূমাবেব চক্রাকার চিত্রকাব্যমিব নর্ত্তনমাবর্ত্তয়তি।"

—কখনও আবার তথাবিধ "গোমূত্রিকাবন্ধ ত্যাগ করে চক্রাকারে চিত্র কাব্যের

১। মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, শ্রী বিজন বিহারী ভট্টাচার্য সংকলিত, সাহিত্য একাডেমী, নিউ দিল্লী, পদসংখ্যা ৪৯, পৃঃ ২৪।

মতো নৃত্যে ঘুরপাক খেতে লাগলেন।"[১] শ্রীশ্রী গোবিন্দ লীলামৃতমেও চক্রগতি নৃত্যের লয়ের বর্ণনা পাই— যথাঃ-

"লঘুভ্রমচ্চক্রগতের সমা তাসাংগতিঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিন্মন্দা ক্বচিচ্ছীঘ্রা বিবিধাসীৎ প্রিয়া হরেঃ।।"

কখনও চক্রগতি লঘু হইলে তাহাদেরও গতি লঘু এবং কখনও চক্রগতি মন্দ বা শীঘ্র হইলে তাহাদিগেরও গতি মন্দ বা শীঘ্র হইতে লাগিল। এই রূপে কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজাঙ্গনা সকলে রাসমণ্ডলে নানা প্রকার গতিপ্রাপ্তা হইলেন।[২]

কুশান নাট্যে পালা অনুযায়ী বিভিন্ন রসের অবতারণা করা হয়। শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য অধিক। এছাড়া হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত সবকটিই দেখা যায়। প্রথমে বন্দনা, বন্দনার পর গুরু প্রণাম করে বাদ্যযন্ত্রাদি প্রণাম করে আসরে প্রবেশ করেন শিল্পীরা। এরপর হয় মঙ্গলাচরণ, তারপর অবতারণা হয় মূল পালার, মাঝে চলে খোসাগান ও তৎসহযোগে 'নৃত্ত' (খোসাগান-পালার একঘেয়েমী কাটানোর জন্য অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে যে গান), সবশেষে পালার অন্তর্দশা বা শেষ। কুশানের অত্যন্ত জনপ্রিয় পালাগুলি হল—সীতার বনবাস, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রাবণ বধ ইত্যাদি।

গম্ভীরা

'গম্ভীরা' নাট্যে নৃত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গম্ভীরা উৎসবের দ্বিতীয় দিনে ছোট তামাশায় 'ভক্তগড়া' এবং 'শিবগড়া' অনুষ্ঠানাদির পর রাত্রিকালে বিবিধ নৃত্যগীতাদি ও মুখা নৃত্য হয়। গম্ভীরার মুখানৃত্য অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। গম্ভীরা উৎসবে বড় তামাশায় বাদ্যসহ ভক্তগণ নাচতে নাচতে অংশগ্রহণ করেন ও রাত্রে হনুমান মুখা নামক বিশেষ আকর্ষণীয় নৃত্যে লঙ্কাদহন ও সমুদ্রপারের অভিনয় প্রদর্শিত হয়। এছাড়া কাঁটা নাচ, আশীর্বাদী ফুল বুকের ওপর নিয়ে নাচের ধারা প্রচলিত ছিল। ওই একই দিনে প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে 'মশান নাচা' হয়ে থাকে। এখনও পুরাতন মালদহে কোনও কোনও গম্ভীরায় এই নাচের প্রচলন আছে। মশান-কালীর মুখা সালংকারা এবং বিকটবদনা। এই নৃত্যের সময় ঢাকী যখন

১। শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পু, কবি কর্ণপুর বিরচিত বঙ্গানুবাদসহ (২য় খণ্ড) মনীন্দ্র গুহ, প্রকাশক সাবিত্রী গুহ, পৃঃ ৮৫৪, শ্লোক সংখ্যা ১৬।

২। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ (৩য় খণ্ড), কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সৎ-সেবক আশ্রম, ১৩৯৫ (বাংলা), পৃঃ ১৩২, শ্লোক সংখ্যা ৬২।

'মাতান' বাজায় তখন নৃত্য ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। মালদার মুখা নৃত্য সুপ্রাচীন, ঐতিহ্যপুষ্ট, আচারনিষ্ঠ নৃত্যধারা। এই নৃত্যের প্রধান বাদ্যযন্ত্র 'ঢাক'। ঢাকের সঙ্গে একটি বা দুটি কাঁসি ঢাকের বোলে বাজানো হয়। ঢাকের এই বোলগুলি অলিখিত কিন্তু অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দলগত এবং একক এই নৃত্যে নারীরা সাধারণত অংশগ্রহণ করে না। নৃত্যের সঙ্গে গান নেই, তাল প্রধান 'নৃত্তাংশ'। পরিবেশিত বিষয়ের বিচারে মুখা নৃত্যের প্রধানত দুইটি ধারা ঃ

১) পুরাণ নির্ভর ২) লৌকিক নির্ভর।

পুরাণ নির্ভর নাচগুলির মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়—(১) হনুমান মুখা, (২) রামলক্ষ্মণ, (৩) শিবদুর্গা, (৪) কার্তিক, (৫) কালিকা, (৬) চামুণ্ডা, (৭) নারসিংহী, (৮) বাশুলী, (৯) রাক্ষস, (১০) বাণ-নৃত্য, (১১) কার্তিক-ময়ূর প্রভৃতি। গম্ভীরার ব্যাপক অর্থ হল দেবালয়, শিবের মন্দির বা মণ্ডপ সংলগ্ন অঙ্গন। বিশেষভাবে পূজার্চনার মণ্ডপ ছাড়াও, নৃত্যগীতাদির জন্য যে অঙ্গন বা আসর প্রস্তুত করা হয় তার সামগ্রিক নাম 'গম্ভীরা'। গম্ভীরার বাণনাচে দেখা যায় ভক্তবৃন্দ দলবদ্ধভাবে বাণের অগ্রভাগে আগুন জ্বালিয়ে 'নৃত্ত' করে। গম্ভীরার আসরে সূচনা পর্বটির নাম 'বন্দনা'।

বন্দনা পর্যায়ের গান

জলবন্দ স্থলবন্দ বুড়া শিবের গম্ভীরা গান
আর বন্দ সরস্বতীর গান
বাসুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম।

গম্ভীরা অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিজড়িত অবশ্যপালনীয় আচরণগুলির (ritual) কিছু বিধিনিয়মের মধ্যে শস্যোৎপাদনের (fertility) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গম্ভীরা পূজা উৎসবের সূচনায় ঘট স্থাপন বা ঘট ভরাই রীতি। মাটির ঘটটি মণ্ডপের নির্দিষ্ট জায়গায় বসানো হয়। সেই জায়গাটি নরম করে খুঁড়ে তার ওপর নানারকম শস্য (ধান, গম, যব, সরিষা, তিসি, ধুতুরা, মুগ, মুসুর, কলাই প্রভৃতি) বপন করা হয়। তার ওপর ঘটটি বসানো হয়। পুজোর শেষ পর্যায়ে সাতদিন পরে গম্ভীরামণ্ডল বা প্রধান সবাইকে জানান কোন কোন শস্যগুলি অঙ্কুরিত হয়েছে, শুধুমাত্র সেই শস্যগুলিই নতুন বৎসরে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে চাষাবাদ করা হয়। শিব হচ্ছেন কৃষির দেবতা, শিবের বন্দনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত কৃষিকর্মের কথা উচ্চারিত হয়। কার্পাস, সুতো, তাঁতবোনা প্রভৃতির উল্লেখ হয়। একজন 'বুড়োশিব' সেজে এসে দাঁড়ান। শিব হয়ে যান 'নানা'। ঐ "শিবোহে" কিংবা "নানা হে" ধুয়া ধরে গান এবং সংলাপের সূত্রে অন্যায়ের সুবিচারের জন্য শিবের কাছে নালিশ জানায়

শিল্পী। অর্থাৎ কৃষিনির্ভর মানুষ স্বভাবতই শিবের পূজার্চনা ও যাবতীয় প্রার্থনা জ্ঞাপন করে এই গম্ভীরার মাধ্যমে।

ছৌ

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল বিশেষত পুরুলিয়া, এছাড়া বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী নৃত্য 'ছৌ', 'ছ' বা 'ছো'। কারও কারও মতে এটি শুধুই নৃত্য। এতে বিভিন্ন ধরনের কাহিনীর অবতারণা হয়ে থাকে। নৃত্যের পালাগুলি দেখলে বোঝা যায় মূলত কাহিনী নির্ভর এবং যুদ্ধনৃত্যভিত্তিক এর উপস্থাপনা। লোক জীবন থেকে উদ্ভূত অশুভ শক্তির দমন ও শুভশক্তির জয়—এই হল এর মূল উপজীব্য। আমরা জানি নাট্যশাস্ত্রে নাট্য প্রয়োগের দু'রকম ভেদ—তার মধ্যে যে নাট্যে ভীষণ যুদ্ধ, অতিশয় গতিবেগ ও অত্যন্ত উত্তেজনা তা স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনেয় নয়। পুরুষ দ্বারা অভিনেয় নাট্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল—ছৌ নৃত্য পালাগুলি এবং একমাত্র এই নাট্যটিই দেখি সম্পূর্ণ রূপে নৃত্যনির্ভর। নাট্যশাস্ত্রে অভিনয় চার প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য। ছৌ নৃত্যে আঙ্গিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে প্রযুক্ত হয়। শাস্ত্রে বর্ণিত—বীরা, মানবী, সিংহী, মাণ্ডুকী সবগুলি গতিভেদই ছৌ নৃত্যে দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের নৃত্যের স্থানক অর্থাৎ দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা দেখা যায়। যেমন — বিশাখক, চতরস্র, বর্ধমান, মাণ্ডুক, দার্দুর প্রভৃতি। বিভিন্ন ধরনের পাক বা ভ্রমরী দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের আকাশচারী ও ভূমিচারী এবং বিভিন্ন অসংযুত ও সংযুত হস্ত দেখা যায়।

ছৌ-এ বাচিক অভিনয়ের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলা যায় ছৌ নৃত্য মূলত তালবাদ্য প্রধান যুদ্ধ নৃত্য। তবে নৃত্যের আগে চরিত্র অনুযায়ী গান সুরে গাওয়া হয়, তারপর নৃত্য শুরু হয়। সেই নৃত্য বিশেষত 'নৃত্ত' প্রধান অংশ এবং সঙ্গে বাজতে থাকে সানাই। তা পূর্বে গেয় গানের সুরে বাজে। যেমন, গানের কথা ঃ—

"ওরে ষড়ানন
কেন-রণ কেন রণ কর অকারণ"

পরে সানাইয়ে কার্তিকের নৃত্যের সঙ্গে উপরোক্ত গানের সুর বাজতে থাকে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় ভূমি দুন্দুভি, যাকে কথ্যভাষায় বলে ধাম্‌সা। নাট্যশাস্ত্র এবং বাংলার নৃত্যশাস্ত্রগ্রন্থ সংগীত দামোদর (১৩শ), পঞ্চদশ শতকের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ এবং ষোড়শ শতকের গোবিন্দলীলামৃতমে বাংলায় ভূমি দুন্দুভি ব্যবহারের সুন্দর বর্ণনা পাই। যা সম্পূর্ণভাবে টিকে আছে ছৌ নৃত্যে। এছাড়া

থাকে বাংলা ঢোল, শিঙা, সানাই। বাংলা ঢোলে অত্যন্ত কঠিন তাল বাজানো হয় নানা ছন্দে নাচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। নৃত্যের সঙ্গে যে তাল বাজে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চরিত্র অনুযায়ী সানাইয়ে তোলা হয় সুর। নৃত্য শুরু হবার আগে যে কথা বা বাণীতে গান হয় তারই স্বরমালিকায় সুরগুলি বাজে সানাইয়ে। সুরগুলি রাগভিত্তিক এবং সুরের আভাসে পরিলক্ষিত হয়, ঝুমুর কীর্ত্তনের প্রভাব।

ছৌ-য়ের আহার্য অভিনয় অর্থাৎ বেশভূষা বিশেষত পোশাক বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। আজকাল চরিত্র অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা হয়। অলঙ্কৃত বড় বড় মুখোশ পৌরাণিক চরিত্র অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। চরিত্রের মূল ভাবটি নিপুণ দক্ষতায় যিনি সম্পূর্ণ রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তিনি ছৌ নৃত্যের যশস্বী শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কালক্রমে তাঁকে 'গুরুজী' বা 'ওস্তাদ' বলা হয়। এই নৃত্যের সব চাল, তাল, ছন্দ, ছক ও কাহিনী, বাজনা, সুর যিনি আয়ত্ত করেন তিনি ওস্তাদ হন। এই শিল্পের তত্ত্ব ও প্রয়োগকৌশল বিষয়ক দক্ষতা যথেষ্ট মাত্রায় না থাকলে কেউ ওস্তাদ বা গুরু হতে পারেন না। তাত্ত্বিক জ্ঞান সমৃদ্ধশালী হলে এঁরা নতুন পালা অর্থাৎ কাহিনীকে নৃতায়িত করে রূপ দিতে সমর্থ হন। আসরে প্রবেশ থেকে প্রস্থানের মধ্যে অনেকগুলি নৃত্য বিভাগ থাকে। সাধারণ ভাবে ভাগগুলি হল—বন্দনা, গান সহযোগে কাহিনীর উপস্থাপনা, সূচনা, বিস্তার ও পরিণতি। নৃত্যে এক অংশ থেকে আর এক অংশে দ্রুত সঞ্চরণ ঘটে।

ছৌনৃত্য সমবেত নৃত্য। এই সমবেত নৃত্যের নৃত্যাভিনয়ে একক বা দ্বৈত নাচের প্রয়োজন থাকলেও তা সমবেত নৃত্যের অংশ হিসেবেই হয়ে থাকে। যেমন মহিষাসুরমর্দিনী পালায় গণেশ, কার্তিক চরিত্রসমূহ। ছৌনৃত্য বীররস প্রধান, এছাড়া শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রসেরও প্রয়োগ দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের ছৌ নৃত্যধারাটি, বিশেষত রাসনৃত্যটি শৃঙ্গার রসাত্মক, খুবই সুন্দর এবং লালিত্য মণ্ডিত। ছৌ নৃত্য ধারায় বাংলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকার ভ্রমরী পরিলক্ষিত হয়। পুরুলিয়ার ছৌতে আকাশ ভ্রমরী, চৌক ভ্রমরী, বেষ্টিত ভ্রমরী, উৎপ্লুত ভ্রমরী বিশেষ ভাবে দেখা যায়। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থে (পঞ্চদশ শতক) আকাশ ভ্রমরীর ব্যাখ্যা আছে—

"উর্ধ্বোর্ধ্ব ভ্রমিভিরুপর্যুপর্যু দীর্ণে—
গৌরিমৃণাং পরিধিভিরুল্লসলায় গৌরা।"[১]

১। শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূঃ, কবিকর্ণপুর গোস্বামী, বঙ্গানুবাদ, ২য় খণ্ড, মণীন্দ্র নাথ গুহ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক সাবিত্রী গুহ, পৃঃ ৮৭৫, শ্লোক সংখ্যা ৬৮।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতমেও আকাশ ভ্রমরীর ব্যাখ্যা আছে—

"স্পৃষ্টা করৈকেন ভুবং কচিৎ পরা দেহং পরাবৃত্ত মহুর্মুহুর্দিবি
পত্যন্তনৃত্যদ্ভুবি সা কদাপ্যসৌবিনা তদাবলম্বনম্বরেপরম।"[১]

মনসামঙ্গল কাব্যেও এর নজির রয়েছে—

"শূন্যেতে ধরে পাক যেন কুম্ভোরের চাক
সমুখে সঞ্চরে আকাশে।"[২]

'আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ'তে একজন নতর্কীর বর্ণনা পাই—

"পৃষ্ঠে ভুগ্না ব্যজয়েত করৌ ধুন্বতী তালমোক্ষে
স্মারংসজ্জীকৃতমিব ধনুশ্চাম্পকং বুৎক্রমেণ।।"

তাল সমাপ্তি কালে হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে কামদেবের সাজানো চম্পক ধনুকে জয় করলেন, চিৎ-উপুড় উভয় ভাবে।[৩] এই ভঙ্গীটি ছৌ নৃত্যে বিশেষ ভাবে দেখা যায়।

উপরোক্ত দলগত নাট্যধারাগুলি শিল্পীরা করে চলেছেন। বিষহরা বংশানুক্রমে এখনও করে যাচ্ছেন শ্রীভবেন্দ্রনাথ গীদাল, শ্রীসতীশ গীদাল, মনসা কীর্তনে শ্রী হরনাথ ত্রিবেদী, কুশান নাট্যে ললিত কুশানী। গম্ভীরা মটরবাবু খুব বিখ্যাত ছিলেন এবং মালদায় অনেক দল আছে যারা এখনও বংশপরম্পরায় করে চলেছে। ছৌ নৃত্যে কিংবদন্তী পুরুষ প্রয়াত শ্রী গম্ভীরসিং মুড়া (পদ্মশ্রী প্রাপ্ত)। এ ছাড়াও অনেকে আছেন, যেমন—জাগারু মাহাতো, দধিকান্ত কুমার, ধনঞ্জয় মাহাতো, প্রমুখ। এবার আসি একক মহিলা বা পুরুষ পরিবেশিত নৃত্যের ধারা সর্ম্পকে আলোচনায়।

নাচনী

'নাচনী' একক মহিলা পরিবেশিত, মূলত শৃঙ্গার রসাত্মক নৃত্য। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে—যথার্থ সঙ্গীত শিল্পী তিনিই যিনি গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনটেতেই পারদর্শী। নাচনী শিল্পীরা ঝুমুরগান (শৃঙ্গার রসাত্মক) নিজেরাই পরিবেশন করেন ও নাচেন। শিল্পী হন তালে লয়ে গীতে পারদর্শী। নাচনীরা

১। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতম্, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, তৃতীয় খণ্ড, সৎ-সেবক সংঘ, ২৩ সর্গ, পৃঃ ১৬১, শ্লোক সংখ্যা ৩৩।

২। কবি জগজ্জীবন রচিত মনসামঙ্গল কাব্য, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃঃ ২৯৫।

৩। শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূ, কবিকর্ণপুর গোস্বামী, বঙ্গানুবাদ, ২য় খণ্ড, মণীন্দ্র নাথ গুহ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক সাবিত্রী গুহ, পৃঃ ৮৭৩, শ্লোক সংখ্যা ৬২।

প্রাচীনকালের দেবদাসীর একটি ক্ষয়িষ্ণু ধারা। এরা স্ব-দাসী বা অলংকারদাসী পর্যায়ভুক্ত। এদের গুরুকে বলা হয় রসিক। 'রসিক' কে গীত-বাদ্য-নৃত্য তিনটি বিষয়েই অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে। ষোড়শ শতকের নারদ রচিত 'পঞ্চমসার সংহিতা'য় পাই—

"রাঢ়ায়াং সংস্থিতা যে চতে নটাঃ পুনরুত্তমাঃ।
যে গায়ন্তি সুগীতানি নৃত্যন্তিচ বিচক্ষণাঃ।।"[১]

অর্থাৎ রাঢ়দেশস্থিত সেই সকল নটগণ উত্তম হন যাঁহারা সুন্দর গীতাদি গাইতেন ও নৃত্য করতেন এবং বিচক্ষণ ছিলেন।[১] অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকেই নৃত্য-গীত-বাদ্যপটু রাঢ়বঙ্গের নটদের কথা জানতে পারছি যারা বর্তমানে রসিক বলে অভিহিত। মঙ্গলকাব্যে দেবতার সভায় নাচনী বেহুলার নৃত্যের বর্ণনা আছে—

দেবতার সভায় গিয়া মৃদঙ্গমন্দিরা লইয়া
নৃত্যকরে বেহুলা নাচনী।
যতেক দেবতা দেখি যেন মত্ত হয়ে শিখী
গায়ে যেন কোকিলের ধ্বনি।
ঘন ঘন তাল রাখে অঞ্চলে বয়ান ঢাকে
হাসি হাসি বদন দেখায়
মুখে গায় মিষ্ট বোল খদির কাষ্ঠের খোল
তাথই তাথই ঘন বায়।।[২]

অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যেও বলা হয়েছে নাচনীকে নৃত্য-গীতে পারঙ্গম হতে হবে, তালে সমৃদ্ধ হতে হবে, শৃঙ্গার রসে নাচতে হবে। প্রাচীনকালে এই নাচনীরা একসময়ে সমাজে সম্মানিতা ছিলেন, আজ সামাজিক শোষণের শিকার, সমাজে স্বীকৃতি নেই। অথচ মনসামঙ্গলে পাই স্বামী খোল বাজাচ্ছেন, বেহুলা নাচনী নাচছে।

"লখাই বাজায় খোল বেহুলা নাচনি
মনসার কাছে রঙ্গে নাচেন আপনি।"[৩]

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে নাচনীদের অতীতে গৌরবজনক সামাজিক অবস্থান ছিল, আজকের নাচনী শিল্পীরা কিন্তু সমাজে অপাংক্তেয় স্থানের,

---

১। নারদকৃত পঞ্চমসার সংহিতা, সম্পাদক গুরুবিপিন সিং, মণিপুরী নর্তনালয়, ১৯৮৫, পৃঃ ৭, শ্লোক সংখ্যা ১৭।

২। মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য একাডেমী, নিউ দিল্লী, পদসংখ্যা - ৪৯।

৩। ঐ, পদসংখ্যা - ৫৬, পৃষ্ঠা ২৪।

বৈষম্য প্রকট। বর্তমানের বিখ্যাত নাচনী গুরু বা রসিক — শ্রীনিবারণ গোস্বামী, শ্রী শশী মাহাতো, শ্রী নন্দকিশোর মাহাতো প্রমুখ।

শশী মাহাতো একটি নাচ করান যার বর্ণনা নাথ সাহিত্যে পাই—

"নাচন্তি যে গোর্খনাথ মাদলে করি ভর।
মাটিতে না লাগে পদ অলগ উপর।।"[১]

মাদলের ওপর দাঁড়িয়ে গোর্খনাথ নাচছেন। ঠিক এই নৃত্যধারাটিই রয়ে গেছে গুরু শশী মাহাতোর শেখানো নৃত্যের ছন্দে। প্রাচীনকালে যখন মন্দিরে নাচনীরা নৃত্য করতেন তখন বন্দনা, মঙ্গলাচরণ ইত্যাদির মত বিখ্যাত নৃত্য ছিল—একঢুলা নৃত্য। রসিক নিবারণ গোস্বামীর মতে ৫০ বছর আগেও অনুষ্ঠিত হত তেলেনা বা তেরেনা নৃত্য ইত্যাদি। এই নৃত্যটি রসিক নিবারণ গোস্বামী আদ্রা কাশীপুরের মহারাজা ভৈরবলাল সিংহ দেবের কাছে শিখেছেন। গানটি হল—

"দাধিনর তাক্ ধার ধা থুন্ না
তেলেনা তেরেনা তেলেনা......."ইত্যাদি।

পুরুলিয়ার বর্তমানের নাচনী — সিন্ধুবালা দেবী (রাজ্য আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্তা, মালাবতী দাসী, প্রমীলা বা পোস্তবালা দাসী, বিমলাবালা দাসী, সরস্বতী দাসী, ননীবালা দাসী, রাসমণি দাসী, রাজুবালা দাসী, অঞ্জনা দাসী, পূর্ণিমা দাসী, জয়ন্তীবালা দাসী প্রমুখরা নৃত্য গীতে বিখ্যাত।

বাউল

শাস্ত্রের বচন অনুসারে তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ যিনি গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনটেতেই সমান দক্ষ। বাউল মূলত একক পুরুষ শিল্পী তবে বর্তমানে একক মহিলা বাউলও দেখা যায়। বাউলেই দেখা যায় শিল্পী গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনটিতেই সমান দক্ষ। শিল্পী ততবাদ্য অর্থাৎ একতারা বা গুবগুবি বাজান, তাল ও সুর দুটির কাজ একসঙ্গে হয়। আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে একটি বাঁয়াতবলার মতো তাল-রক্ষক যন্ত্র কোমরের কাছে বাঁধা থাকে। তাতে শিল্পী সংগত করে-করে তাল বাজিয়ে গাইতে ও নাচতে থাকেন। পায়ে থাকে ঘনবাদ্য অর্থাৎ ঘুঙুর। সে একই সঙ্গে নিজে তত, ঘন, আনদ্ধবাদ্য বাজায় এবং নাচে ও গায়।

বাউল নৃত্যে নানা ধরনের ভ্রমরী দেখা যায়। যথা — চক্র ভ্রমরী, একপাদ ভ্রমরী, অঙ্গ ভ্রমরী, উৎপ্লুত ভ্রমরী ইত্যাদি। এছাড়া অন্তর্ভ্রমরী ও বহির্ভ্রমরী

১। বাংলা সাহিত্যের কথা — শ্রী নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালিকা, বিশ্বভারতী প্রকাশন, মাঘ ১৩৮৯, পৃঃ ৫১-৫৬।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাউলে বিভিন্ন রকম উৎপ্লবন আছে। গানের ঝোঁকে ঝোঁকে মেজাজের সঙ্গে বিভিন্ন রকম উৎপ্লবন দেখা যায়। যেমন— অলগ, কর্তরী, একপাদ, সমপাদ ইত্যাদি। চারী ভেদ দেখা যায়। যেমন — নূপুরবিদ্ধা, তির্যঙমুখী, স্ফুরিকা ইত্যাদি। সমভঙ্গ, আভঙ্গ, অতিভঙ্গ এই তিন ধরনের ভঙ্গিই বাউলে পাওয়া যায়। সমপাদ, একপার্শ্বগত, একজানুগত, চতরস্র, একপাদ, কমলাসন, বৈতান, বিশাখক ইত্যাদি স্থানক দেখা যায়। বিভিন্ন রকম শিরকর্ম, গ্রীবাকর্ম, গতিভেদ—হংসী, ময়ূরী ইত্যাদি বিভিন্ন নৃত্ত ক্রিয়া আছে। অর্থাৎ বাংলার সংগীতশাস্ত্রগ্রন্থ সংগীত দামোদরে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার সবটাই উপস্থিত বাউলের নৃত্য-গীতে। পূর্ণদাস বাউল, পবনদাস বাউল, বিশ্বনাথ দাস বাউল, ষষ্ঠী খ্যাপা প্রমুখ বর্তমানের জনপ্রিয় বাউল শিল্পী।

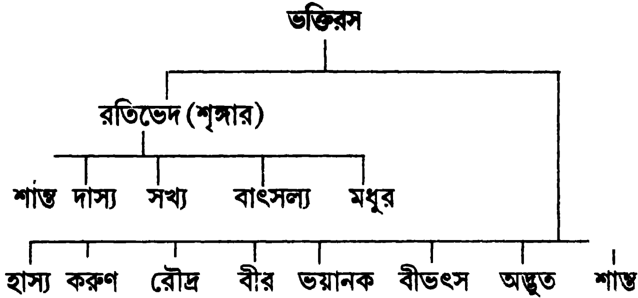
কীর্তন নৃত্য

সমগ্র বাংলা জুড়ে এই নৃত্য ও গীতের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত প্রবাদ—"কানু বিনা গীত নাই।" এই নৃত্যেও নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত বৃন্দগান পদ্ধতিতে দল সাজানো হয়। আগে উত্তমবৃন্দে ২২ জন নিয়ে দল সংগঠিত হত। আজকাল অধমবৃন্দে ন্যূনপক্ষে ৭-৮ জন থাকে। কীর্তন-নৃত্যের 'শ্রীখোল' বাদকের অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমা আজ প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে অথচ মণিপুরের মৃদঙ্গনৃত্যের খ্যাতি (পুংচোলম্) আজ সর্বজনসমাদৃত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে গৃহীত হবার পরেই পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে মণিপুরে এই নৃত্য-গীত নীত হয়েছিল। মণিপুরের মৃদঙ্গ নৃত্যের পাদকর্ম, চারী, ভ্রমরী ইত্যাদি নৃত্যকর্ম নবদ্বীপের কীর্তনগানের 'শ্রীখোলবাদকের' পাদকর্মের অনুরূপ।[১] এই শ্রীখোল বাদকের নৃত্যভাস্কর্য আমরা প্রাচীনকাল থেকে অর্থাৎ পাল-সেন যুগের ভাস্কর্যে, ময়নামতী, পাহাড়পুর, জগজ্জীবনপুরের ভাস্কর্যে, বিষ্ণুপুর, বাসুদেব মন্দির, অম্বিকা-কালনার প্রতাপেশ্বর, লালজী, কৃষ্ণচাঁদজীর মন্দির গাত্রে এবং চিত্রকলায়ও দেখতে পাই।

কীর্তন-নৃত্য-গীত শুরু হয় বন্দনা, মঙ্গলাচরণ, গৌরচন্দ্রিকা, প্রবন্ধ বাদ্য ইত্যাদি দিয়ে, শেষ হয় আরতি বা অন্তর্দশা নৃত্য দিয়ে। কীর্তন-নৃত্যেও বিবিধপ্রকার শাস্ত্রবর্ণিত হস্তকের ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষত উচ্ছ্রিত হস্তে বা উর্দ্ধবাহু পতাক বা অলপদ্ম এবং উর্দ্ধমণ্ডলী হস্ত। এরও ভাস্কর্যে নিদর্শন পাই। কীর্তন-নৃত্যে পূর্বে আলোচিত

১। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, মণিবর্দ্ধন, প্রকাশক প্রচারবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১, পৃঃ ৭।

শাস্ত্র সম্মত বিবিধ প্রকার চারী, ভ্রমরী, গতি, গ্রীবা, মস্তক দেখা যায়। এতে ভক্তিরসই প্রধান।



শৃঙ্গার রসের ৬৪ ভেদের কীর্তন অর্থাৎ ৩২টি সম্ভোগ ও ৩২টি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার ভেদ দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রকাররা ৬৪ রসের কীর্তন তৈরী করে গেছেন। নৃত্য সহযোগে পালা অনুযায়ী নায়ক-নায়িকা ভেদও খুব সুন্দর ভাবে পরিবেশিত হয়। অষ্ট নায়িকাকে আরও ৮টি করে উপবিভাগে মোট ৬৪ টি উপ-বিভাগে বিভক্ত করে গেছেন। রূপগোস্বামী প্রণীত 'উজ্জ্বল নীলমণি' তে খুব সুন্দর ভাবে এর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। এর গান ও বাদ্য অত্যন্ত শাস্ত্রসম্মত। এতে বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্র সম্বন্ধিত রাগ রাগিণী তাল প্রযুক্ত হয়। কীর্তন হল 'প্রবন্ধগীতি' এবং এর পদকর্তাদের রচনা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। কীর্তনেরও বহু ঘরানা আছে। যেমন—মনোহরশাহী, গরাণহাটী, রেণেটী, মান্দারিণী, ঝাড়খণ্ডী ইত্যাদি। এর মধ্যে মনোহরশাহী এবং গরাণহাটী সর্বপেক্ষা উৎকৃষ্ট হিসেবে জনপ্রিয়। মনোহরশাহী ঘরাণার প্রসিদ্ধ 'কীর্তন শিল্পী' জঙ্গীপুরের শ্রী নরোত্তম সান্ন্যাল। নৃত্যগীত সমৃদ্ধ 'আসর কীর্তন' অত্যন্ত জনপ্রিয়। যদিও নৃত্য আজ প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। গৌরলীলার বিখ্যাত শিল্পী ব্রজেন পাঠক। তিনি গৌরলীলা নৃত্যসংকীর্তনে সুবিখ্যাত ছিলেন। বর্তমানে ওঁর শিষ্য গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ধারা বহন করে চলেছেন। মৃদঙ্গ নৃত্যের প্রসিদ্ধ গুরু শ্রীব্রজরাখাল দাস।

নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, গৌড়বঙ্গে ঔড্রমাগধী নৃত্য প্রচলিত ছিল। যে পদ্ধতিতে ঔড্রমাগধী নাট্য বা নৃত্য পরিবেশিত হত তার বৃত্তি ছিল ভারতী ও কৈশিকী। ভারতী অর্থাৎ কথোপকথন সহযোগে উচ্চণ্ড নৃত্য এবং কৈশিকী অর্থাৎ লাবণ্যমণ্ডিত নৃত্য। এই ভারতী-কৈশিকী বৃত্তি বাংলার সমস্ত গুরুপরম্পরা নৃত্যধারার মধ্যে সজীব ভাবে থেকে গেছে। বিশেষত কীর্তন, কুশান, বিষহরা, মনসাকীর্তন প্রভৃতি নৃত্যে।

নাট্যশাস্ত্রের পূর্বরঙ্গ বিধানে আছে ততবাদ্য ও ঢাকবাদ্য বা ভাণ্ডবাদ্য এবং আবৃত্তি সহকারে সেটি অনুষ্ঠেয়। প্রথমে আরম্ভ ও আশ্রাবণা অর্থাৎ গান ক্রিয়ার সূত্রপাত যা 'আরম্ভ' নামে অভিহিত। তারপর বাদ্য সুন্দর করার জন্য 'আশ্রাবনা' বিধি হয়। তারপর একে একে হয় বক্তু পাণি, পরিঘট্টনা, সংঘোটনা, মার্গাসারিত। আসারিত ক্রিয়ার দেবতার মহিমা কীর্তন গীতিবিধি বলে জ্ঞাতব্য। এরপর একে একে উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা, রঙ্গদ্বার (এখানে বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয় থাকে), চারী (শৃঙ্গাররসদ্যোতকগতি), মহাচারী ইত্যাদি নাট্যশাস্ত্রের পূর্বরঙ্গ লক্ষণীয়।[১] এই সমস্ত ক্রিয়াগুলি কীর্তন, মনসা-কীর্তন, নাচনী বাংলার সমস্ত গুরুমুখী নৃত্যধারায় দেখা যায়।

বর্তমানে এই গুরুমুখী নৃত্যধারা যে-যে অঞ্চলে আছে নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত ঔড্রমাগধী নৃত্যও সেই সেই অঞ্চলে ছিল। যেমন—মল্লবর্তক অর্থাৎ মল্লভূম—যেখানে বর্তমানের নাচনী ও ছৌ দেখতে পাই, পুণ্ড্র, যেখানে বর্তমানের কুশান, বিষহরা দেখা যায়, মলদ অর্থাৎ মালদা যেখানে গম্ভীরা-মনসাকীর্তন ইত্যাদি আজও টিঁকে আছে। ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ; এখানকার বাউল, কীর্তন প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৃত্যধারা কত প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী।

উপরোক্ত নৃত্যগুলি ছাড়াও আছে পরম্পরাগত ভাবে প্রচলিত গুরুমুখী যুদ্ধ নৃত্যধারা-সমূহ। যার সাক্ষ্য—প্রাচীন সাহিত্য, শাস্ত্র, ভাস্কর্য এবং সজীব ধারাগুলি। এগুলির মধ্যে রায়বেঁশে, ঢালি, নাটুয়া, ঢাক উল্লেখযোগ্য। এগুলিও শাস্ত্রীয় নৃত্যের এক মৌলিক উপাদান। এই নৃত্যগুলি পুনরভ্যুত্থানের জন্য স্যার গুরুসদয় দত্তের নাম চিরস্মরণীয়।

১। নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড), ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০, পৃঃ ১০১-১০৩।

গ্রন্থপঞ্জী (ইংরাজী)

1. *Brihaddesi of Matanga Muni,* ed, Prem Lata Sharma, IGNCA and Motilal Banarsidass Pub. 1994.
2. *Kalhana's Rajatarangini,* M.A.Stain, Motilal Banarsidass.
3. *History of Bengal,* R.C.Majumdar, G.Bharadwaj and Co. 1971.
4. *Geeta Govinda with Abhinaya* — Thanjaur Maharaja Sarfoji's Saraswati Mahal Library Society, Thanjaur, ed. by K. Vasudeva Sastri, 1989.
5. *Kathakali,* K.P.Padamanavam Thampy, Indian Publication.
6. Bulletin of Rama Varma Research Institute, Vol. V, Part II, Reprinted by Kerala Sahitya Akademi, 1980.
7. *Bharata Natyam,* Spl. Issue, Marg Publication, 1957
8. *Bharatanatyam : An Indepth Study,* Saroja Vaidyanathan, Ganesha Natyalaya, 1996¼
9. *Shekh Subhadaya of Halayudha Misra,* ed. by Sukumar Sen, Asiatic Society, Cal, 1963.
10. *Devadasi in Indian Ancient Poems, Literatures, Purans, Music and the Temples*—Dr. Debabrata Singha Thakur, Gopeswar Dhrupad Research Centre, 1990.
11. *Bishnupur,* S.S.Biswas, Archaeological Survey of India, 1992.
12. *Memories of Gaur and Pandua,* by Khan Sahib Mr. Abid Ali Khan ed. H.E.Stapleton, Dept. of Information and Culture, Govt. of W.B.
13. *Mohiniyattom,* Prof. C.K.Moosad, Dept. of Public Relations, Govt. of Kerala, 1986.
14. *Early Sculpture of Bengal,* S.K.Saraswati, Sambodhi Publication, 1962.
15. *The Life of Krishna In Indian Art,* P.Banerjee, Publication Division (Govt. of India) 1994.
16. *Temples and Legends of Bengal,* P.C.Roy Chowdhury, Bharatiya Vidya Bhavan, 1998.
17. *Saivism in Bengal-An Icono-Historical Survey,* Kalyan Kr. Dasgupta, Culture Indica—Editor-in-Chief, Prof. Dr. Biswanath Banerjee, 1994.
18. *Development of Hindu Iconography,* Jitendra Nath Banerjee, Munshiram Manoharlal Publishers, Pvt. Ltd., 1985.
19. *Nataraja in Art Thought and Literature,* C. Sivaramamurthy, Publication Division, Govt. of India, 1974.
20. *The Natyashastra,* Bharata Muni, Vol. I, Translated and edited by Dr. Manomohan Ghosh, Manisha, 1995.

21. *The Folk Dance of Bengal,* Gurusaday Dutta, Ed. by Ashok Mitra 1954,
22. *History of Saivism,* Pranabananda Jash, Roy and Chowdhuri, 1974.
23. *Music of Eastern India*—Sukumar Ray, K.L.Mukherjee, 1973.
24. *Abhinayadarpanam*—ed. and translated by Dr. Manomohan Ghosh, Manisha, 1989.
25. *Hindu Music,* Sourindra Mohun Tagore, Low Price Publications, 1994.
26. *Ganesha Image from India and Indonesia,* I, Wayam Redig, Sundeep Prakashan, 1996.
27. *Traditions of Indian Folk Dance,* Kapila Vatsayan, Indian Book Company, 1976.
28. *Speaking of Dance the Indian Critique,* Mandakranta Bose, D.K.Printworld (P) Ltd., 2001.
29. *Hindustani Sangeet and a Philosopher of Art,* S.K.Saxena, D.K.Printworld (P) Ltd., 2001.
30. *The Oxford Dictionary of Dance*—Debra Craine and Judith Mackrell, Oxford, 2000.

গ্রন্থপঞ্জী (বাংলা)

১। নাট্যশাস্ত্র, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

২। বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স প্রা.লি., ১৩৬৪।

৩। বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি—ডঃ আশা দাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৯।

৪। চর্যাপদ, মণীন্দ্রমোহন বসু, কমলা বুক ডিপো।

৫। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার, মুক্তধারা. পৃঃ ১৯৮৬।

৬। বাংলা সাহিত্যের কথা—শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯ (বঙ্গাব্দ)।

৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।

৮। চর্যাগীতি—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৩৭২।

৯। চর্যাগীতির ছন্দপরিচয়—নীলরতন সেন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪।

১০। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ—শ্রীসুকুমার সেন, রূপা, ১৯৭০।

১১। গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত- -ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৫৩।

১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—শ্রীসুকুমার সেন, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩ (বঙ্গাব্দ)।

১৩। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৬২ (বঙ্গাব্দ)।

১৪। আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্রীজাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, সান্যাল এণ্ড কোং, ১৩৭৮ (বঙ্গাব্দ)।

১৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, সম্পাদনা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬।

১৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., ১৩৯৫ (বঙ্গাব্দ)।

১৭। বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক, ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮। মধ্যযুগের বাংলাকাব্যের লোক-উপাদান, মুহম্মদ আবদুল খালেক, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

১৯। কৃত্তিবাস রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ, শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা গেজেট, ১৯৬১।

২০। বাংলা সাহিত্য, ডঃ মনমোহন ঘোষ, ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, ১৯৫৫।

২১। বাংলার লোকনৃত্য : বিবিধ, ২য় খণ্ড, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ.মুখার্জী এণ্ড কোং প্রা. লি. ১৯৮২।

২১। পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস, শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, ১৩১৮ (বঙ্গাব্দ)।
২৩। পদ্মাপুরাণ-মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত, শ্রী প্যারীমোহন দাস কর্তৃক সংগৃহীত ও সুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত, ১৩৩৭ (বঙ্গাব্দ)।
২৪। বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খণ্ড), মধ্যযুগ, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, জেনারেল, ১৩৮০ (বঙ্গাব্দ)।
২৫। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, সত্যবতী গিরি, রত্নাবলী, ১৯৮৮।
২৬। শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন স্বরলিপি, সম্পাদনা অধ্যাপক বুদ্ধদেব রায়, নাথ ব্রাদার্স।
২৭। তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, ডঃ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, ফার্মা কে.এল.এম. প্রা. লি., ১৯৮৬।
২৮। মণিপুরী নর্তকের গীতমালিকা—গুরু বিপিন সিং, মণিপুরী নর্তনালয়, ১৯৯৩।
২৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), কাজী দীন মুহম্মদ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
৩০। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, চৈতন্যসারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ, ১৩৯৬ (বঙ্গাব্দ)।
৩১। শ্রী রূপ গোস্বামী রচিত, রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, শ্রী শ্যামসুন্দর মিশ্র প্রকাশিত, ১৩৫৬ (বঙ্গাব্দ)।
৩২। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমী, ১৯৯৬, পৃঃ ১৯।
৩৩। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০ পৃঃ), শ্রীসতীশ মোহন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৮।
৩৪। শ্রী শুভঙ্কর বিরচিত সংগীত দামোদর, গৌরীনাথ শাস্ত্রী এবং গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ ১৯৬০।
৩৫। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য, নির্মল নারায়ণ গুপ্ত, রত্নাবলী, ১৯৮৬।
৩৬। কৃষ্ণগীতি (সংস্কৃত)—শ্রীমানবেদ কবি, সপ্তদশ শতক, গুরুবায়ুর দেবস্বম, কেরালা।
৩৭। অভিনয়দর্পণ, অশোকনাথ শাস্ত্রী, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯১।
৩৮। কথাকলি বিজ্ঞান কোশম্—অধ্যাপক আইমানম কৃষ্ণ কাইমল, সাহিত্য প্রবর্তক সহকরণ সংঘ, ১৯৮৬। (মালয়ালী)
৩৯। গোবিন্দদাসের কড়চা, সম্পাদনা শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬।
৪০। ভারতের নৃত্যকলা, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, নবপত্র প্রকাশন।
৪১। শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্তন, দর্শনকাবেরী ও কলাবতী দেবী, মণিপুরী নর্তনালয়, ১৯৯৩।
৪২। মেটিয়াবুরুজের নবাব, শ্রীপান্থ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০।
৪৩। নারদকৃত পঞ্চমসার সংহিতা ও দামোদর সেন কৃত সংগীত দামোদর, সম্পাদনা গুরু বিপিন সিং, মণিপুরী নর্তনালয়।
৪৪। ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, রমলাদেবী ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯২ (বঙ্গাব্দ)।
৪৫। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—Vol. I. রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, ২/২৩, জেনারেল প্রিন্টার্স পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৯৬৪।

৪৬। প্রসঙ্গ দেবদাসী, আরতি গঙ্গোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ১৯৮২।
৪৭। সংগীতকোষ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।
৪৮। শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পু, কবি কর্ণপুর বিরচিত, শ্রীমণীন্দ্র গুহ সম্পাদিত, প্রকাশিকা— রাধারমণ মন্দির, বৃন্দাবন।
৪৯। হাওড়া ও হুগলী জেলার ইতিহাস—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও বাণীকুমার ভট্টাচার্য, অশোক পুস্তকালয়।
৫০। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, অতুল সুর, সাহিত্যলোক, ১৯৮৫।
৫১। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৬৭।
৫২। বৃহৎবঙ্গ, দীনেশচন্দ্র সেন (১ম খণ্ড), দে'জ পাব্লিকেশন, ১৯৯৯।
৫৩। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র, নৃত্যবিদ্ শ্রীমণিবর্ধন, স্বরাষ্ট্র (প্রচার) প.ব.সরকার, ১৯৬১।
৫৪। ছৌ: ইন্দ্রাণী দত্ত শতপথী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯।
৫৫। বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়, সনাতন গোস্বামী, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫।
৫৬। গীতচন্দ্রোদয়, শ্রী নরহরি চক্রবর্ত্তী, মণিপুর ষ্টেট কলা একাডেমী।
৫৭। শ্রী ভক্তিরত্নাকর, নরহরি চক্রবর্ত্তী, গৌড়ীয় মিশন।
৫৮। শিল্প ও শিল্পী (২য় খণ্ড) কৃষ্ণলাল দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২।
৫৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীসুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, ইষ্টার্ণ পাব্লিশার্স, ১৯৭৮।
৬০। ইতিহাস অনুসন্ধান—২, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ৩য় বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, সম্পাদক—শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়, কে.পি.বাগ্‌চি এণ্ড কোং, ১৯৮৭।
৬১। হুগলী জেলার পুরাকীর্তি, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সম্পাদনা দেবলা মিত্র, প্রত্নতত্ত্ব অধিকারী, ১৯৯৩।
৬২। শ্রী গোবিন্দলীলামৃতম্ (৩য় খণ্ড), কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সৎ-সেবক আশ্রম, ১৩৯৫ (বঙ্গাব্দ)।
৬৩। কবি জগজ্জীবন ঘোষাল রচিত মনসামঙ্গল কাব্য, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাস, কলি. বিশ্ব. ১৯৬০।
৬৪। মনসামঙ্গল, কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ, শ্রী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য একাডেমী, নিউ দিল্লী।
৬৫। তাল প্রসঙ্গ, দুলাল ভট্টাচার্য, সীমান্ত প্রকাশন, ২০০০।
৬৬। বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য গ্রামীণ নৃত্যকলা, মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য, ১৯৯৫।
৬৭। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, সম্পাদনা, ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫।
৬৮। যুদ্ধনৃত্য ও বাংলা, মহুয়া মুখোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, ২০০২।
৬৯। গৌড়ীয় নৃত্য, মহুয়া মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ২০০০।
৭০। বাংলার লৌকিক নৃত্য, মহুয়া মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক বিধুভূষণ, ২০০১।
৭১। সংগীততত্ত্ব, দেবব্রত দত্ত, প্রকাশক দেবী দত্ত, ১৯৯৫।

শব্দসূচী